হে অরণ্য কথা কও

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আরতি এজেন্সী
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩৬৬

—তিন টাকা—

এই লেখকের—

পথের পাঁচালী

অপরাজিত

দৃষ্টি প্রদীপ

আরণ্যক

আদর্শ হিন্দু হোটেল

বিপিনের সংসার

মেঘমল্লার

যাত্রাবদল

নবাগত

উপলখণ্ড

তৃণাঙ্কুর

উর্ম্মিমুখর

উৎকর্ণ

কেদার রাজা

ক্ষণভঙ্গুর

অসাধারণ

মুখোশ ও মুখশ্রী

অনুবর্ত্তন

অভিযাত্রিক

বিধু মাষ্টার

মৌরীফুল

আরতি এজেন্সি, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅনাথনাথ দে ও শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও পরিচয় প্রেস, ৮বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

বন্ধুবর শ্রীবিজয়রত্ন কবিরাজ-কে

বড় রচনার ফাঁকে ফাঁকে—দৈনন্দিন কাজের মধ্যে এমন কিছু লিখতে ইচ্ছে করে যার কাছে প্রতিদিনকার ইতিহাসের কিছু যোগ থাকে, অথচ যা খুশী তাই লেখা যায়, মনের মধ্যে যখন যে ভাব ফেনিয়ে ওঠে—ভাল সাহিত্যের দরবারে যে সব কথার জবাবদীহি করতে হয় না। তাই থেকেই ডায়েরী লেখার শুরু—এগুলো যে কোন দিন ছাপার মুখ দেখবে তা মনে ছিল না। প্রকাশকের চাপে হঠাৎ এক খণ্ড ছাপা হ'ল—তারপর আরও, তৃণাঙ্কুর, উর্ম্মিমুখর, উৎকর্ণ। পাঠকরা আগ্রহ করে পড়েন এর স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েই ডায়েরীর এই ক-টা পাতা ছাপতে সাহস পাওয়া গেল। অরণ্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যেখানটায় বেশী, বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই সব অংশগুলোই প্রকাশ করা হয়েছে। ইতি—

কাল বারাকপুরে ফিরে এসেচি সুদীর্ঘ ন' মাস পরে। আগের ডায়েরী লেখার পর দশ-এগারো মাস কেটে গিয়েচে। গত আষাঢ় মাসেই কল্যাণী অসুখে পড়ে, ভাদ্র মাসে একটি কন্যাসন্তান হয়ে মারা যায়—তারপর কল্যাণী একটু সেরে উঠলে গত ১৫ই ভাদ্র ওকে নিয়ে যাই কোলাঘাটে শ্বশুর বাড়ীতে। শ্বশুর মশায় তখন ছিলেন কোলাঘাটে, গত ৺পূজার সময় যে ভীষণ ঝড় হয় সে সময় আমি তখন ওখানেই। তারপর ওঁরা চলে গেলেন ঝাড়গ্রামে, কল্যাণীও সঙ্গে গেল, সেখান থেকে আমরা গেলুম ঘাটশিলা গত কার্ত্তিক মাসে। এতদিন ওই অঞ্চলেই ছিলুম, কাল এসেচি এখানে।

মঙ্গলবার দিন যখন গাড়ী এসেচে খড়গপুর, তখন বাংলা দেশের সবুজ ঘাসভরা মাঠ ও টলটলে জলে ভর্ত্তি মেদিনীপুর জেলার খাল বিল দেখে আমাদের ইছামতীর কথা মনে পড়লো। খড়গপুর থেকে তখন সবে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ছেড়েচে, কল্যাণী বলে উঠলো—"আজই চলো বারাকপুর যাই, ইছামতী টানচে।"

আমারও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে তখন যশোর জেলার এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামটির জন্যে। যত দেশ-বিদেশেই বেড়াই, যত পাহাড়-জঙ্গলের

অপূর্ব্ব দৃশ্যই দেখি না কেন, বাল্যের লীলাভূমি সেই ইছামতী তীর যেমন মনকে দোলা দেয়—এমন কোথাও পেলাম না আর। কিন্তু সেদিন আসা হোলো না, এই ক'দিন কাটলো কলকাতা ও ভাটপাড়ায়। তারপর কাল বনগাঁ হয়ে বাড়ী এসেচি কতকাল পরে।

চোখ জুড়িয়ে গেল বাংলার এই বন-ঝোপের কোমল শ্যামলতায়, তৃণভূমির সবুজত্বে, পাখীর অজস্র কলরোলে। সিংভূমের রুক্ষ, অনুর্ব্বর, বৃক্ষ-বিরল মরুদেশে এতকাল কাটিয়ে যেখানে একটা সবুজ গাছের জন্যে মনটা খাঁ খাঁ করে উঠতো, মনে আছে কাশিদার সেই বাঁধের ধারে খানিকটা সবুজ ঘাস দেখে ও সেদিন রাজবাড়ী যাবার পথে একজনদের বাড়ী একটা ঝাঁকড়া পত্রবহুল বৃক্ষ দেখে অবাক হয়ে চেয়েছিলাম—সেই সব প্রস্তরময় ধূসর অঞ্চল থেকে এসে এই পাখীর ডাক, এই গাছপালার প্রাচুর্য্য কি সুন্দর লাগচে! যেন নতুন কোন দেশে এসে পড়েচি হঠাৎ, বাল্যের সেই মায়াময় বনভূমি আমার চোখের সামনে আবার নতুন হয়ে ফিরে এসেচে, সব হয়ে উঠেচে আজ আনন্দ-তীর্থের পুণ্য বাতাস-স্পর্শে আনন্দময়, নতুন চোখে সব আবার দেখচি নতুন করে। আজ ওবেলা ইছামতীতে নাইতে নেমে সে কি আনন্দ! ও পারের সেই সাঁইবাবলা গাছটা, আর বছর আমি আর কল্যাণী নাইতে নেমে যে গাছটার ডালপালার মধ্যে আটকে-পড়া অস্ত-সূর্য্যের রাঙারোদের অপূর্ব্ব শ্রী মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখতাম—সে গাছটা তেমনি আছে। তারপর বিকেলে নগেন খুড়োর ছেলে ফচুর সঙ্গে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে সেই নাবাল জমিটার ধারে নরম সবুজ ঘাসের ওপর বসে ভাবছিলাম গত মার্চ মাসে দেখা মানভূমের সেই নাকটি-টাঁড় বনের কথা, মানভূমের বৃক্ষলতা... পথের কাঁকর ছড়ানো টাঁড়ের কথা, বামিয়াবুরু ফরেষ্টে উনিশ শো উঁচু পাহাড়ে সেই রাত্রিযাপনের কথা, চাইবাসাতে ভবানী সিং

হে অরণ্য কথা কও

অফিসারের বাড়ীর বিস্তৃত কম্পাউণ্ডে বসে গত চৈত্র সংক্রান্তির দিন অপরাহ্নে চা খেতে খেতে দূরবর্ত্তী বরকেলা শিলামালার আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সে দৃশ্যের কথা—মাঠাবুরু পাহাড়ে শালবনের মধ্যের উঁচু পথ দিয়ে কাঠ-কয়লা মাথায় করে বয়ে নামাচ্ছে যে হো মেয়েরা, যাদের মজুরী চার বার সেই দুর্গম পথে ওঠানামা করলে মাত্র সতেরো পয়সা, তাদের কথা—গত পূর্ণিমার আগের পূর্ণিমায় বহরাগড়া থেকে কেশুর-দা রিজার্ভ (বাঁশের) ফরেষ্ট দেখতে যাওয়া ও বগরাচোড়া গ্রামের সেই উড়িয়া ব্রাহ্মণ ও গ্রাম্য স্বর্গী বাউড়ি দেবীর মন্দিরের পাশে স্তূপীকৃত প্রাচীন পাথরের দেব-দেবীর হাত-পা ভাঙা মূর্ত্তিগুলির কথা। বাঘমুণ্ডী পাহাড়ের মাথায় সেদিন দুপুরে আমি, সুবোধ ও সিন্‌হা সাহেব বসে ছিলাম, শৈলসানুতে বসন্তের পুষ্পিত লতা পলাশ ও গোলগোলি, নীচের উপত্যকায় অজস্র ঘেঁটু ফুল। সুবোধ ঘোষ 'আরণ্যক' পড়ে শোনাচ্ছে সিন্‌হা সাহেবকে, আমি বসে বসে একদৃষ্টে বাঘমুণ্ডী শৈলারণ্যের সে সুন্দর রূপ দর্শন করচি, সেই শঙ্খ ও শোভা নদীর কথা (কি চমৎকার নাম দুটি! শঙ্খ ও শোভা!)—এই সব কত কি ছবি গত ক'মাসের স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে হাতড়ে বার করে দেখচি মনের চোখে আর চোখ চেয়ে দেখচি বাংলা দেশের যশোর জেলার এক ক্ষুদ্র পল্লীর মাঠে সম্পূর্ণ অন্য এক দৃশ্যের সামনে বসে, সামনে আমার শৈলমালার amphi-theatre-এ ঘেরা ভালকী ফরেষ্ট নয়, (হঠাৎ মনে পড়লো ভালকী ফরেষ্টের মধ্যে আমার আবিষ্কৃত সেই অপূর্ব্ব বন্য সরোবর "লিপুদারা"র কথা, সেই উত্তুঙ্গী চুনা পাথরের শৈল-গাত্র, সেই নটরাজ শিবের মত ...তে শাদা গাছটা যার নাম আমি রেখেছিলুম শিববৃক্ষ, সেই লিপুকোচা ...দা লোকদের সন্ধ্যার অন্ধকারে বন্য হস্তীর ভয়ে মশাল জ্বালিয়ে ...কে ও ফরেষ্ট অফিসার মিঃ সিন্‌হাকে আমাদের বনমধ্যস্থ তাঁবুতে

পৌঁছে দেওয়া) এ হোল শ্যাসসেওড়া, ষাঁড়া, শিমুল, কেঁয়োঝাঁকা গাছের বন, চারিদিকে ছায়াভরা অপরাহ্লে কোকিল-কূজনে চমক ভেঙে যায় যেন, ভাবি এ বাংলা দেশ, বাংলা, চিরকালের বাংলা মা। নতুবা এত বিল্বপুষ্পের সুগন্ধ কোথায়? এত পাখীর ডাক কোথায়? যারা চিরদিন গ্রামে পড়ে থাকে, তারা কি বুঝবে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মহনীয় রূপ, তাদের মন তো আকুল হয়ে ওঠেনি বাংলার বাঁশবনের ছায়ায় ঘাটের ধারের মাটির পথে বেড়াবার জন্যে, চোখ পিপাসিত হয়ে ওঠেনি একটু সবুজ বনশ্রী দেখবার জন্যে?

রাত অনেক হয়েচে। আমি ডায়েরী লিখচি, কল্যাণী পাশে শুয়ে বই পড়চে। অনেকদিন পরে দেশে এসে ও খুব খুশি। আজ বলচে ওবেলা, "আমাদের এ বাড়ীটা কেমন ভালো, কেমন ছাদ—না?" সত্যি, বাড়ীটা আমারও ভাল লাগচে। ঘন ছায়াভরা বাগান ও বনে ঘেরা, ঐ বড় বকুলগাছটায় বাল্যদিনের মত জোনাকীর ঝাঁক জ্বলচে জানালা দিয়ে দেখচি, বিলবিলের ডোবায় কট্‌কটে ব্যাঙ্‌ ডাকচে আর বনে ঝোপে কত কি কীটপতঙ্গ যে কুস্বর করচে তার ইয়ত্তা নেই।

আবার মনে পড়চে সেই কতদূরের শঙ্খ ও শোভা নদীর তীর, গভীর নাকটিটাঁড়ের বনমধ্যস্থ কৃষ্ণ প্রস্তরের সেই গণ্ডশৈল ও আদিম মানবের চিহ্নযুক্ত গুহা, ভাল্‌কী জঙ্গলে বন্য বরমকোচা গ্রামের সেই মুণ্ডা যুবতীটী, যে আমায় বলেছিল—"তুই কি করচিস এ বনে আমাদের? ভালো ভালো জায়গা দেখে বেড়াচ্ছিস্‌ বুঝি?" অবিশ্যি এত ভাল বাংলায় বলেনি।

আর মনে পড়চে নিমডির বনে সেই পলাশ ফুলের শোভা গত বসন্তে ও মাঠা গ্রামের সাঁওতালের মত চেহারা সেই ভুবনেশ্বর বাঁড়ুয্যের কথা। সুদূর নাকটিটাঁড়ের বন ও বন্য শঙ্খ নদীর তীরবর্ত্তী

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শিলাসন। সাঁওতালের মত দেখতে, মিশ কালো—নাম বল্লে, ভুবনেশ্বর বাঁড়ুয্যে। আমি ে াকে উঠেছিলাম।···বাইরে হঠাৎ গিয়ে দেখি কৃষ্ণা চতুর্থীর ভাঙা চাঁদ উঠেচে—বাইরে জ্যোৎস্না। কল্যাণীকে ডেকে নিয়ে বাইরে গিয়ে বসলুম। খুব বৌ-কথা-কও পাখী ডাকচে। বাঁশবনে রাতজাগা আর একটা কি পাখী ঠক্ ঠক্ শব্দ করচে। বাংলা পল্লীর জ্যোৎস্নারাত্রির রূপ প্রাণ ভরে দেখি কত রাত পর্য্যন্ত বসে বসে।

খুকু নেই বারাকপুরে, বিয়ে হয়ে এখান থেকে চলে গিয়েচে কোথায় তার শ্বশুর বাড়ী—সেখানে। বহুদিন দেখা হয়নি তার সঙ্গে।

জীবনই এ রকম, এক যায়, আর আসে।

মহাকালের বিরাট পটভূমি নিত্য শাশ্বত—তার সামনে জগতের রঙ্গমঞ্চে কত নরনারীর আসা যাওয়া!

ভালো কথা, গত মাঘমাসে কলকাতায় সুপ্রভার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার একটি খুকী হয়েচে, নাম তার রেখেচে রাখী, বেশ খুকীটি। সুপ্রভা আমার খুকীর কথা কত জিজ্ঞেস করলে।

রেণুর সঙ্গেও এবার কলকাতায় দেখা, সে বেথুনে পড়চে সেকেণ্ড ইয়ারে। বোমা পড়বার তৃতীয় দিনে তারা পালিয়ে গেল কলকাতা থেকে তাদের দেশে। এখনও ফেরেনি দেখে এলুম।

•

এখানে এসে জীবন আরম্ভ করেছি আট মাস পরে। আজ সকালে ইছামতীতে নাইতে নেমেছি, বেলা ৮॥ টা হবে, শান্ত নদীজল, ওপারে সবুজ ঘাসেভরা মাঠ ও ঝিঙে-পটলের ক্ষেত, এ পারে ফণি চক্কত্তির জমির বাগান, সাঁই বাবলা ও শিরিষ গাছের আঁকা-বাঁকা ডাল-পালার সৌন্দর্য্য। কোকিলের ছেদহীন কূজন সকালের আকাশ যেন ভরিয়ে

রেখেচে, প্রস্ফুট তুঁত ফুলের সুবাস বাতাসে। কালু মোড়লের ছেলে গনি ও নগেন খুড়োর ছেলে ফুচু ঘাটে নাইচে। গনি আমের চালান নিয়ে গিয়েছিল নফর কোলের বাজারে। একচল্লিশ দিন কলকাতায় ছিল, আজ এসেচে। দেশে এসেচি আজ চারদিন, এখনও এখানকার নতুনত্ব কাটেনি। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে যে কত সৌন্দর্য্য তা দেখবার সুযোগ ও সুবিধা কি সকলের ঘটে? চৈতন্যকে প্রসারিত করে দেওয়া চাই, নতুবা শুধু চোখ দিয়ে দেখলে কিছুই হয় না। মনকে তৈরি করে নিতে হয় এজন্যে, এর সাধনা চাই। বিনা সাধনায় কিছু হয় না। উচ্চতর অনুভূতির জন্যে মনের আকুতি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আকুতি থেকে ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি।

আজ হাওড়া সঙ্ঘ থেকে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে সভাপতিত্ব করবার তাগিদ এল।

কলকাতা থেকে ফিরেচি কাল বৈকালে। ইউনিভার্সিটির মিটিংএ সেখানে অনেকদিন পরে সুনীতি বাবু ও বহু পুরোণো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা। মায়াদি ও বেলুকে নিয়ে রাত ৯টার সময়ে থাণী রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কলকাতার অন্ধকার ভরা রূপের সঙ্গে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। গ্রামে ফিরলুম রবিবার বৈকালে, বেশ একটু মেঘবৃষ্টি দেখা দিলে, সামান্য একটু কাল-বৈশাখী বৈশাখের বিকেলে। তারপরেই আকাশে দেখা দিলে রাঙা মেঘস্তূপ, আমি বেড়াতে গেলুম নদীর ধারের মাঠে, গাছপালার কি চমৎকার সৌন্দর্য্য। মুগ্ধ করে দেয় আমাকে, চেয়ে দেখে সত্যিই বিস্ময় লাগে। কত কি গাছ, কত ধরণের পাতা। বিশ্বরূপের কত কি রূপ! যেদিকে চোখ পড়ে অবাক চোখে চেয়ে থাকি। বরোজপোতার বাঁশের বনে কচু ঝাড়, বেত গাছের

মত পাতা কি একটা গাছ, তারই পাশে বাঁশের ডগা নত হয়ে আছে—নিভৃত নিরালা বনভূমি, কোথায় সেই নাকটিটাড়ের শালবন, করন্ধা পুষ্প-সুবাসিত অপরাহ্নের বাতাস, মাঠাবুরু পাহাড়ের শিখররাজি। বিরাট হস্তীমুণ্ডের মত পরিদৃশ্যমান কাঁড়দাবুরুর শিখর—আর কোথায় বাংলার শ্যাম সৌন্দর্য্য। নদীজলে বিকেলে নাইতে নেমে ইছামতীর কালো জলে দেখি ভগবানের আর এক রূপসৃষ্টি।

যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে
যিনি শোভন এ ক্ষিতিতলেতে

উপনিষদের ঋষিরা শুধু দার্শনিক ছিলেন না, দ্রষ্টা ছিলেন, কবি ছিলেন।

পরশু এলুম উত্তরপাড়া রাজবাড়ীতে রবীন্দ্র জন্মোৎসব সম্পন্ন করে। মাষ্টার মশায় অতুল গুপ্ত, সজনী, বুদ্ধদেব, বাণী রায় সবাই এক সঙ্গে যাওয়া গেল। বেশ মজা করে মিটিং করা গেল—ভাটপাড়ার আশালতার সঙ্গে দেখা হল অনেকদিন পরে—প্রায় আঠারো বছর পরে। ঘটে গেল জিনিসটা আমার সেই গল্পটির মত। একটি ছোট ছেলে এসে বল্লে, আপনাকে আমার মা ডাকচেন—

গেলুম একটা পুরোণো দোতলা বাড়ী রাজা জ্যোৎস্নাকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রাসাদের সামনে।

একটি মেয়ে এসে ঝুপ্ করে নীচু হয়ে পায়ের জুতোর উপর দুহাত বুলিয়ে বল্লে—দাদা, কেমন আছেন? কি ভাগ্যি যে আপনি এলেন এখানে?

—ও আশা না?

—হ্যাঁ দাদা। এখন বড় মানুষ হয়ে গিয়েচেন—আপনি কি এখন গরীব বোনকে চিনতে পারবেন?

হে অরণ্য কথা কও

ঠিক একটি ছোট গল্প। কিছুদিন আগেই এ গল্প আমি লিখেচি কি একটা কাগজে।

পরদিন ফিরলুম বনগাঁয়ে। ষ্টেশনে নেমে অম্বরপুরের একখানা গরুর গাড়ী যাচ্ছে—তাতেই চড়ে বসলুম—প্রথম শেওড়া গাছ ভাট গাছ দেখে কি আমার আনন্দ!

এবার বিভূতিদের বাড়ী গিয়ে উঠেছিলাম।

. সিংভূমের ডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসার মিঃ সিন্‌হা হঠাৎ এসে হাজির। পচা রায় ও আমি ওঁকে নিয়ে বেলেডাঙার পুলে গেলাম। চাঁদ উঠেচে, আজ পূর্ণিমা। ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল মাঠে। কত ঝোপে ঝোপে পাকা বৈঁচি তুলে খেতে খেতে আমরা গেলুম। ক্লান্ত দেহে জ্যোৎস্না-লোকে ইছামতীর জলে এসে নামি আমাদের বনসিমতলার ঘাটে। মিঃ সিন্‌হা সাঁতার দিয়ে একেবারে ওপারে—তিনুও ছিল। উঠে মাধবপুরের সবুজ ঢেউ খেলানো ঘাসের মাঠ দেখে এল ওরা। পরদিন S.D.O. কে আনালুম, হাট থেকে ফিরে এসে দেখি S.D.O. ও সুরেন বসে। তাদের চা খাওয়ানো গেল—নিগ্রোর প্রতি আমেরিকানদের অত্যাচারের কত কাহিনী বর্ণনা করলেন মিঃ সিন্‌হা।

তার আগের দিন উষা চৌধুরী এসে হাজির। আমি নারাণ দা'র শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খেতে সবে বসেচি—এমন সময় কল্যাণী চিঠি লিখে পাঠালে—মিসেস্ চৌধুরী এসেচেন। উনি এখুনি চলে যাবেন। তখুনি এসে দেখি উষা সত্যিই খাটের ওপর বসে আছে। ওকে নিয়ে আমরা সবাই গেলুম নদীর ধারে। উষা নদী দেখে খুব খুশি—বালিকার মত খুশি।

অতএব বোঝা গেল বিদেশাগত দুটী লোকেরই ভাল লেগেচে আমাদের স্বচ্ছ সলিলা ইছামতী—পুলিনশালিনী ইছামতী।

আবার কাল কলকাতা গিয়ে সজনীর সঙ্গে উষাদের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে বহুকাল পরে অশ্বিনী—আমাদের ৬০, মৃর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের সেই বাল্যবন্ধু অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা।

অনেকে গল্প করচি—উষারা কাল চলে যাচ্ছে লাহোরে—অনেকে দেখা করতে এসেচে—হঠাৎ ওর মধ্যে একটি লোক বল্লে—বিভূতি না?

অবাক হয়ে বললুম—চিনতে পারচি নে তো?

—তা চিনতে পারবে কেন? আমি অশ্বিনী—তখুনি আমি তাঁর সার্ট ধরে টেনে আনতে আনতে বললুম—দাও দিকি আমায় প্রথম বিয়ের সেই ঘড়িটা—আজ ২৭ বছর পরে দেখা—সে আমার ঘড়িটা—ও আমার ঘড়িটা নিয়ে গিয়েছিল—গৌরীর বাপের দেওয়া সেই পকেট ঘড়িটা! কত বছর আগে।

মহাদেব রায়কে নিয়ে গেলুম শ্রীমতী বাণী রায়ের বাড়ী। চা খেয়ে কত গল্প। বেশ ভাল বেলফুল ফুটেছিল, তুলে দিলেন ওঁরা। ওঁর মা সুলেখিকা গিরিবালা দেবী দুখানা বই উপহার দিলেন।

মহাদেব বাবুর সঙ্গে পুরী যাওয়ার সব ঠিক ঠাক হয়ে গেল। ৬ই মে রওনা হবো হাওড়া থেকে।

রোজ নদীর কালো জলে গিয়ে সন্ধ্যায় নামি। কালও কুঠীর মাঠ বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যায় স্নান করতে নামলাম আমরা দুজনে। রাঙা মেঘ করেচে সারা আকাশময়, ওপারের সাঁইবাবলা গাছটার ফাঁকে ফাঁকে রাঙা আলো যেন আটকে আছে। কি কালো জল! ভগবান যেন অত্যন্ত শান্তরূপ ধরে আছেন—যেমন তাঁর অত্যন্ত অপরূপ মূর্ত্তি দেখেছিলাম

হে অরণ্য কথা কও

সেদিন নতিডাঙার মরাগাঙের ধারে বসে। পাশে নতিডাঙার প্রকাণ্ড বটগাছটা, ওপারে আরামডাঙার মাঠে আউশ ধানের কচি সবুজ জাওলা ও খেজুর গাছের সারি। সাদা সাদা বক চরচে ঘন সবুজ কচুরিপানার দামে। এ জগতে যেন যুদ্ধ নেই, অশান্তি নেই, চালের দোকানের দীর্ঘ শ্রেণী নেই, উড়ন্ত এরোপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণ নেই।

আম কুড়োনো এ সময় একটা আনন্দের ব্যাপার। আজ সকালে নদীর ধারে যাচ্চি, তেঁতুলতলী আম গাছটার তলায় দেখি হাজরি জেলেণী আম কুড়ুচ্চে। আমি যেতে না যেতে খপ্ করে একটা আম তুলে নিলে তলা থেকে। তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। পাগলা জেলের মা আর হাজরি জেলেণী এই দুজন আম কুড়ুবার উদ্বেগে বোধ হয় রাত্রে ঘুমোয় না—নইলে অত সকালে ওঠে কি করে? সেদিন এইমাত্র পাগলা জেলের মা ওর ঝুড়ি থেকে একটা পাকা আম আমায় দিয়ে গিয়েছিল। একটা মশা মারলুম।

আজ কল্যাণীকে নিয়ে ফচু, হর, বুধো প্রভৃতি ছোট ছোট ছেলেরা নৌকো নিয়ে বেড়াতে গেল বিকেলে, আমিও সঙ্গে গেলুম। অনেক দিন ওপারে যাইনি—মাঠ ছাড়িয়ে যে একটা পথ আছে, সেটা ভুলে গিয়েছিলুম। সেই পথ পর্য্যন্ত গিয়ে একটা নিমগাছ থেকে ডাল ভেঙে নেওয়া হোল দাঁতনের জন্যে। আমি নিজে নৌকো বেয়ে ঘাটে ভিড়িয়ে দিলাম—যেমন ও বেলা তেঁতুলতলা ঘাট থেকে সাঁতার দিয়ে এসেছিলুম আমাদের ঘাটে। জলে নামলুম দুজনে, জল খুব বেড়েচে। আর বর্ষার আকাশে মেঘের দৃশ্য অদ্ভুত। সেই সাঁইবাবলা গাছটার ডালে ডালে রাঙা আলো। দেখে একটা অনুপ্রেরণা মনে জাগলো—বিশ্বের মহাশিল্পীর পরিকল্পনার মহনীয়তা আমার চোখের সামনে সুপরিস্ফুট। নীল

আকাশের দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা করি—এই পটভূমি নিয়ে এদেশের একখানা Epic উপন্যাস লিখবো আমি। নীল কুঠীর পুল থেকে সুরু করবো।

গত ৫।৬ দিন ভীষণ বর্ষার পর আজ প্রথম রোদ উঠেচে। এখনও অনেক আম—তেঁতুলতলীতে আম কুড়ুই রোজ। গাছতলায় পাকা আম কুড়ুই। আজ ভোরে মুখ ধুয়ে ফিরচি নদীর ঘাট থেকে, বাঁশতলীর একটা টুকটুকে আম টুপ্ করে পড়লো আমার সামনে—কুড়িয়ে নিয়ে এলুম। কল্যানী সেটি লক্ষ্মীকে দিলে।

বিকেলে শ্যামাচরণ দা'র ছেলে হর বল্লে, নৌকো বেড়াতে যাবেন না? আমি তখন বেরিয়ে গিয়েছি বাঁশ-বাগানের পথে গাব গাছটার কাছে। অনেকদিন যাইনি নৌকোতে—কেবল যা গিয়েছিলুম কাল না পরশু। নলে জেলের নৌকো ছাড়া হোল। বেশ মেঘমুক্ত বিকেলটি, না গরম, না ঠাণ্ডা। দুধারে দীর্ঘ দীর্ঘ নলখাগড়ার শ্যামল সবুজ ঝোপ, ছোয়ারা লতা, বন্যেবুড়ো গাছের সারি, জলজ ঘাসের ঝোপ—সবুজ, সবুজ, এত সবুজও আছে এদেশে! সবুজ সৌন্দর্য্যের ফুলঝুরি যেন চারি ধারে। ক্রমে কুঠী ছাড়িয়ে গেল। নীলকুঠী এখন আর নেই, ভাঙা হাউজ ঘর আছে—এমন ঘন বন সেখানে যে দিনমানেই বাঘ লুকিয়ে থাকে। ঐ সেই ঝিনুকের স্তূপ নদীর ধারটাতে, গত ফাল্গুনমাসে ছেলেরা ঝিনুক তুলেচে—তার পচা গন্ধ আকাশ বাতাস ভরিয়েছে, কাছে যাওয়া যায় না। কুঠী দাড়ালুম, আবার নদীর দুপারে ঘন সবুজ উলুবন, জলের পাড়ে জলজ ঘাস ও বন্যেবুড়োর গাছ, উচ্ছে পটলের ক্ষেত, কুমড়োর ক্ষেত—শান্ত শুব্ধ পল্লীশ্রী, এতদিন ছোটনাগপুরের উষর কাঁকর ও পাথরের দেশে বাস করে এসে চোখ জুড়িয়ে গেল, মন জুড়িয়ে গেল।

হে অরণ্য কথা কও

সবাইপুরের কাছে এসে ইছামতীর তীরের সৌন্দর্য্য আরও রহস্যময় হয়ে উঠলো। যেন তীরভূমির এই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটা, ওই প্রাচীন ষাঁড়া গাছগুলো আমায় চেনে আমার বাল্যকাল থেকে। যেন এখনি বলবে—এই দেখো সেই খোকা কত বড় হয়েচে! সবাইপুরের বাঁক ছাড়িয়ে অদূরে কুঁচিকাটার খেয়ায় কারা পার হচ্চে। একটি ছোকরা, সঙ্গে একটি প্রৌঢ়া, দুটি ছেলেমেয়ে, একখানা সাইকেল। ছোকরা বল্লে আশুর হাটে তাদের বাড়ী। পাশেই মরাগাঙের খাল, বহুদিন পরে আমি ঢুকলাম নৌকো করে এই খালের মধ্যে। ছোট একটা বাঁশের পুলের তলা দিয়ে, বাঁ ধারে আরামডাঙার বাঁশবন খেজুর বাগানের তলা দিয়ে ঐ গ্রামের একটা ঘাটে পৌঁছুই। ছোট্ট খালের এই ঘাটটি ঠিক যেন একটি ছবি। ছায়ানিবিড় স্নিগ্ধ অপরাহ্ন নীল-আকাশে, ঘন সবুজ জলজ ঘাস ও দূর্ব্বাস্তৃত তৃণ-ক্ষেত্র—সামনে কতকগুলি প্রাচীন গাছের আধ অন্ধকার তলায় একটা পুরোণো ইটের দরগা। কত কাল এদিকে আসিনি, আমারই গ্রামের পেছনে আরামডাঙার এই ঘাট কখনো দেখেচি বলে মনে হয় না—হয়তো কখনো আসিই নি—অথচ কোথায় লিপুদারায় সেই বন্য সরোবর। ভালকীর সেই বন অরণ্য, মানভূমের মাঠাবুরু শৈলশ্রেণী, বামিয়াবুরু ও চিটিমিটি, রাঁচীর পথে হিনি জলপ্রপাত ও পোড়াহাট রিজার্ভ ফরেষ্ট। কোথায় দিল্লী, কোথায় আগ্রা, কোথায় চাটগাঁ, কোথায় শিলং, দার্জ্জিলিং কোথায় না গিয়েছি! অথচ জীবনে কখনো আসিনি আমার গ্রাম থেকে মাত্র দু মাইল দূর আরামডাঙার এই ছবিটির-মত-সুন্দর, তীরতরুশ্রেণীর নিবিড় ছায়াতলে অবস্থিত প্রাচীন পীরের দরগা ও ছোট্ট ঘাটটিতে। একটা বড় জিউলি গাছ, আমগাছ, বড় এক ঝাড় জাওয়া বাঁশ ওপারে, সামনে ছোট্ট খালের ঘাটটি—হাত দশ-বারো চওড়া মরগাঙের খালের

এপারেই বর্ষাসতেজ উলুবন, দূরবিস্তৃত মাঠ বেলেডাঙার সীমানায় মিশে গিয়েচে। সূর্য্যাস্তের রাঙা রঙ আকাশে।

পরদিন বিকেলে গেলুম আরামডাঙার এপারে 'কলাতলার দোয়া'তে। নতিডাঙার বড় বটগাছটা ছাড়িয়ে ওপথে কতদূর গেলুম। এ পথে কত কাল আসিনি। ডাঁশাখেজুর তলা বিছিয়ে পড়ে আছে পথের ধারের খেজুর গাছে। মোল্লাহাটির পথে শুধুই ঝুরি নামানো প্রাচীন বটের ছায়া, ঘন পত্র পল্লবের আড়ালে পড়ন্ত বেলায় কথা-বৌ-ক' ডাকচে।

আজ নৌকো বেড়াতে গিয়ে একেবারে মাধবপুর। অনেককাল আগে এই রকমই নৌকো বেড়াচ্ছিলুম আমি আর ভরত। বহুকাল আগে আমার বাল্যকালে। দিগম্বর পাড়ুইয়ের একখানা খেয়া নৌকোতে আমি আর ভরত হাটবারের দিন লোক পারাপার করতাম রায়পাড়ার ঘাটে। এক মেঘাবৃত সন্ধ্যায় মাঠ ভেঙে গিয়েছিলুম মাধবপুরে পার্ব্বতীদের বাড়ী। পার্ব্বতী বিশ্বাস জাতে কাপালী, গোপালনগরের হাটে বেগুন বেচে, আমার সঙ্গে ছেলেবেলায় রাখাল মাষ্টারের পাঠশালায় পড়তো। সেই আর এই।

তারপর কত জায়গায় বেড়ালুম জীবনে—এই সুদীর্ঘ বত্রিশ বছরের মধ্যে কিন্তু মাধবপুর আর কখনো আসিনি। গ্রামের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই গোয়ালাপাড়া—একটা লোক গাড়ু হাতে পথে যাচ্চে, জিজ্ঞেস করতে বল্লে ঋষি ঘোষের বাড়ী। একটা বড় কাঁঠাল বাগান, অনেক কাঁঠাল ঝুলচে, জেলি বল্লে—দেখুন দাদা, কত আম পেকে!

চাষা গাঁ মাধবপুর। সব খড়ের ঘর, ঝকঝকে তকতকে উঠোনে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া চলে। গোলাপালা, ছোট ডোবা, বাঁধানো মনসাতলা ইত্যাদি মাটির পথের দুধারে। একটা চালাঘরে কয়েকখানা

বেঞ্চি পাতা। সেটা নাকি গ্রাম্য পাঠশালা। কয়েকটি লোক সেখানে বসে আছে। একটি ছোকরার বাড়ী বসিরহাটে—সে নামু প্রসাদকে চেনে।

সামনে মনসা সেজির বেড়া দেওয়া একটা পুরোনো কোঠা বাড়ী—নগেন রায় বলে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী। তিনি ছ বছর হোল বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গিয়েচেন—তার স্ত্রী থাকেন বাড়ীতে, ছেলেপুলে নেই।

এই মাধবপুর, ক্ষুদ্র কৃষকদের গ্রাম মাত্র—কিন্তু আমার মনে চিরকাল রহস্যময় হয়ে ছিল। ভালো করে আজই দেখলুম এ গ্রামকে, বত্রিশ বছর আগে সেই যে ভরতের সঙ্গে এসেছিলুম, সে অতি অল্পক্ষণের জন্যে এবং শুধু পার্ব্বতীদের বাড়ীতেই। গ্রামটা ভাল করে বেড়িয়ে দেখলুম এত কাল পরে—আজ প্রথম।

মনে পড়লো সংসারের টানাটানি হোলে বাবা আসতেন এই মাধবপুরে এক বিকেল বেলায় নৌকায় পার হয়ে—আমার বাল্যকালে। বাবার পুণ্যচরণ-ধূলিপূত মাধবপুর!

পরদিন বিকেলে বেড়াতে গিয়ে নতিডাঙার বটতলা পেরিয়ে মরগাঙের ধারের সেই জালি ধানের ক্ষেতটাতে বসি। কি শান্তি, কি শ্যামলতা এই দৃশ্যটার। ওপারে আরামডাঙার মাঠ, খেজুর চারা—গরু চরচে, মরাগাঙের ঘন সবুজ কচুড়ীপানার দামের ওপর শুভ্রপক্ষ বক বেড়াচ্ছে মাছ খুঁজে খুঁজে—পাশেই বাবলা কাঁটার বেড়া দেওয়া একটা ঝিঙে ক্ষেতে হলদে ঝিঙের ফুল ফুটে আছে এই মেঘভরা বিকেলে। যিনি সূর্য্যে, নক্ষত্রে নিওন, আয়রন্ গিলিয়াম, হাইড্রোজেন গ্যাসের আগুন জ্বেলে রেখেচেন তিনিই এই শ্যামল সবুজ শান্ত তৃণতরু, এই সৌন্দর্য্যভরা পল্লী-দৃশ্যের সৃষ্টি করেচেন, তিনিই আগুনে, তিনিই জলেতে—অদ্ভুত contrast! সূর্য্যের বিশাল অগ্নিকটাহের সৃষ্টি শুধু এই শ্যাম বনশোভার, এই

তৃণাবৃত প্রান্তরকে সম্ভব করবার, রূপ দেবার প্রাক্-আয়োজন মাত্র। আগুন কেন ? জল সম্ভব হবে বলে।

হঠাৎ দেখি মেঘ করে আসচে কালবৈশাখী নিশ্চয়—ছুটতে ছুটতে একমাইল এসে নদীতে আমাদের বনসিমতলার ঘাটে নামি। কি চমৎকার নদীজল, পুণ্য সলিলা ইছামতী প্রতি সন্ধ্যার নিস্তব্ধতায় গত দশ পনেরো বছর ধরে আমায় কত কি শিখিয়েচে। ভগবানের কত রূপই প্রত্যক্ষ করেছি ইছামতীতে সাঁতার দিতে দিতে এমনি কত নিদাঘ সন্ধ্যায়, বর্ষা অপরাহ্নের বৃষ্টিধারামুখর নির্জনতায়। আজও দেখলুম, কুঠীর দিকে কি অদ্ভুত কালো মেঘ সজ্জা—উড়ে আসচে ভাঙা নীল কুঠীটার জঙ্গলের দিক থেকে আমাদের ঘাটের দিকে। কি সে অদ্ভুত রূপ! বিশ্বরূপের এ সব রূপ—এ পটভূমিতে, এমন অবস্থায় দেখবার সৌভাগ্য আমায় দিয়েচেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনিই দয়া করে যাকে দেখতে দেন, সে-ই দেখে।

সারাদিন কাটলো ট্রেনে। তিন বার অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখলাম—একবার ব্রাহ্মণী নদীর সেতুর কাছে বিস্তৃত কটারংয়ের বালুরাশির ওপর দিয়ে শীর্ণকায় দ্বিধারা ব্রাহ্মণী বয়ে চলেচে—দূরে নীল পর্ব্বতমালা, ঘন সবুজ বনানী। বাংলাদেশের বন অথচ তার পেছনে আকাশের গায়ে সিংভূমের চেয়ে শ্যামলতর শৈলশ্রেণী। আর একবার এই রকম দৃশ্য দেখলাম কটকের এপাশে মহানদীর সেতু থেকে এবং ওপাশে কাটজুড়ির সেতু থেকে। ট্রেন যত পুরীর কাছাকাছি আসতে লাগলো বনবনানী ততই শ্যামলতর, নারিকেল কুঞ্জ ততই ঘনতর, দোলায়মান বেণুবনশ্রেণী ততই নবতর রূপ পরিগ্রহ করতে লাগলো। ভুবনেশ্বর স্টেশনের কাছে অনেকদূর পর্য্যন্ত মাকড়া পাথরের মাঠভূমি বা টাঁড় এবং এক প্রকারের

সাদা ফুল ফোটা ঝুপি গাছের ঘন সবুজ বন। বাংলাদেশের চেয়েও শ্যামল এসব অঞ্চলের তৃণভূমি ও বনানী। বনপুষ্পের বৈচিত্র্য তেমন চোখে পড়লো না। বর্ষার দিন, ভুবনেশ্বরের এদিক থেকে বর্ষা সুরু হয়েচে, ক্রমেই বৃষ্টি বাড়চে বই কমচে না। পুরীর ঠিক আগেরই স্টেশন হোল মালতীপাতপুর। উড়িষ্যার এই ক্ষুদ্র পল্লী যে একটি শ্রেস্ট সৌন্দর্য্যভূমি শুধু তার ঘন নারিকেলকুঞ্জ ও শ্যাম বন-শোভায়—এ আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

পুরী স্টেশনে গজেন বাবু ও সুমথ এসে আমাদের নামিয়ে নিয়ে যেতে যেতে গল্প করচে—হঠাৎ সামনে দেখি অকুল সমুদ্রের নীল জলরাশি! সে কি পরম মুহূর্ত্ত জীবনের! সমস্ত দেহে যেন কিসের বিদ্যুৎ খেলে গেল। কল্যাণী দেখি হঠাৎ অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে। সমুদ্র দেখেছিলুম বহুকাল আগে কক্স বাজারে—আর এই ২০।২১ বছর পরে আজ পুরীর সমুদ্র দেখলুম।

সন্ধ্যায় ৺জগন্নাথের মন্দির দেখে এলুম। শ্রীচৈতন্য যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন, সে স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে সর্ব্বশরীর যেন অবশ হয়ে গেল। আধ অন্ধকার গর্ভদেউলে বহু নরনারী দাঁড়িয়ে জগন্নাথের বিগ্রহ দর্শন করচে—ভক্তবৃন্দের মুখে হরিধ্বনি, নানা মন্দিরের গর্ভগৃহ, সেখানে ধাঁধা প্রদীপের মিটমিটে আলোয় কত কি দেবদেবীর বিগ্রহ, যুঁই ফুল ও পদ্মমালার সুগন্ধ বাতাসে, বিরাটকায় পাষাণ দেউল, কোথাও সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারিত হচ্চে পাণ্ডাদের মুখে—আমাদের সঙ্গী পাণ্ডা বলচে এই নীলাচল, এখানে শুধু নীলমাধবের মন্দির তৈরি হয়েছে—বাইরের আনন্দ বাজারে নারিকেলের তৈরি নানা রকম মিষ্টান্ন ভোগ ও তাদের সংস্কৃত নাম, প্রাচীন দিনের ভারতবর্ষ যেন এখানে বাঁধা পড়ে আছে।

সকাল থেকে দুর্য্যোগ চলচে। পুরীর বীরেন রায় একজন প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ। তিনি এবং কয়েকটি ভদ্রলোক এলেন গজেন বাবুর ওখানে, আমার সঙ্গে দেখা করতে। ধার্য্য হলো ওবেলা আমায় নিয়ে নাকি সম্বর্দ্ধনা করবেন, সেকথা বলে গেলেন।

বেড়িয়ে ফিরবার পরেই অত্যন্ত বৃষ্টি সুরু হোল। এদিকে পাণ্ডা-ঠাকুরের ছড়িদার বলে গেল যে একটার সময় মহাপ্রসাদ পাঠাবে। ক্ষিদেতে নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে, বাইরে ভীষণ দুর্য্যোগ, মহাপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেই। অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টি থামলো, প্রায় সাড়ে চারটে বিকেল—তখন 'কণিকা' প্রসাদ এল।

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন করতে যাবার পূর্ব্বে কল্যাণী আমি উমা সবাই মিলে সমুদ্রতীরে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে এলুম। কল্যাণী বহু ঝিনুক কুড়ুলে। অনেকদিন আগে এই দিনটিতে বারাকপুরে খুকু আমার সঙ্গে নাইতে গিয়ে 'মাটি আনি' বলে আমায় ফাঁকি দিয়ে ডাঙায় উঠে ছুট্ দিয়েছিল। তখন সে ব্যাপারটাতে কি দুঃখই হয়েছিল মনে। পায়ে হেঁটে চালকী চলে গিয়েছিলুম জাহ্নবীর ওখানে, মনের কষ্ট নিয়ে। আজ কোথায় জাহ্নবী, কোথায় সে খুকু, কোথায় বা সে দিনের মনের কষ্ট! জীবনে এক যখন চলে যায়, তখন বড়ই কষ্ট হয় প্রথম প্রথম, কিন্তু শীঘ্রই অপরদল এসে তাদের স্থান পূর্ণ করে—তারাই আবার হয়ে দাঁড়ায় কত প্রিয়।

গজেন বাবুদের সঙ্গে যখন হরিদাসের সমাধি দেখতে গেলুম। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে ছিলেন আঠারো বছর—তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হরিদাস ঠাকুর যখন মারা যান, তখন তিনি নিজে তাঁকে কাঁধে নিয়ে এসে এখানে সমুদ্রতটে বালুকা খুঁড়ে সমাধিস্থ করেন। কালক্রমে এখন সেখানে বড় বড় বাড়ী হয়ে উঠেচে চারিধারে। স্থানটি অতি শান্তিপ্রদ, মনে

একটি উদাস পবিত্র ভাব এনে দেয়। দুটি বালক শিষ্য হাতে ঝুলি নিয়ে মালাজপ করচে, তারাই সব দেখালে।

সেই পথেই পুরুষোত্তম মঠে গিয়ে পেছনের একটি অতি সুন্দর স্থানে বসলুম। ডাইনে দূরপ্রসারী ঝাউবন, পাশেই টোটা গোপীনাথের বাগানে অজস্র কাঁঠালগাছ, সামনে বিস্তৃত বালুচরের পারে অপার নীলাম্বু রাশি সফেন উর্ম্মিমালা বুকে নিয়ে তটভূমিতে আবার আছড়ে পড়চে। সে দৃশ্য দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে, উঠতে ইচ্ছে হয় না। এই তো বিশ্বরূপের মন্দির, এই আকাশ, এই ঝাউবন, এই অপার নীল সমুদ্র। এ ছেড়ে কোথায় যাবো?

গজেন বাবু কেবল বলে, চলুন বিভূতিবাবু সভার সময় হোল। সাড়ে সাতটাতে সভা।

সুমথ বাবু বলে—আপনাকে নিয়ে দেখচি ওঠানো দায়, সভার সব লোক এসে যে হাঁ করে বসে থাকবে—চলুন।

১০৮শ্রী তীর্থপতি মহারাজ এই পুরুষোত্তম মঠের মোহান্ত। তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন গৌড়ীয় মঠ থেকে প্রচার করতে। তাঁর সঙ্গে বহু আধ্যাত্মিক আলোচনা হোল। বৈষ্ণবদের কি বিনয় ও ভক্তি। অত বড় পণ্ডিত বল্লেন হাত জোড় করে, আমি আপনাদের দাসানুদাস হতে চাই। আবার কবে দেখা পাবো?

ওখান থেকে এসে সবাই গেলুম সভাস্থলে। ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী সভাপতিত্ব করলেন। আমার গলায় ফুলের মালা দিয়ে আমার রচনা সম্বন্ধে অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা অনেকে বল্লেন, গজেন বাবু ও মিঃ পালিত বল্লেন, আমার 'পথের পাঁচালী' ও অপরাজিত নাকি রোমা রোঁলার 'জঁা ক্রিস্তফ'এর চেয়েও বড়।

দিব্যি জ্যোৎস্নারাত্রে কল্যাণী, উমা, বীরেন রায়, গজেন বাবু, সুমথ

বাবু সবাই মিলে একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে এলুম। উত্তাল সমুদ্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেচে, হু হু হাওয়া বইচে, যাকে বলে সত্যিকার 'sea breeze' বা ডাচ্ 'Zee brugge' অর্থাৎ সমুদ্রের হাওয়া।

রাত্রে আবার ভীষণ বৃষ্টি। সকালে উমা ও কল্যাণী সমুদ্রে স্নান করতে গেল। ওরা সমুদ্রে স্নান করে খুব খুসি হয়ে এল।

একটু পরে বৃষ্টি কেটে গিয়ে বেশ রোদ উঠলো—উমাকে রেখে কল্যাণীকে নিয়ে আমি শ্রীমন্দির দর্শন করতে যাচ্ছি, পথে ছাতার মঠ ও রাধাকান্ত মঠ দেখে বার হচ্চি, এমন সময় মহাদেব বাবু পেছন থেকে ডাকচেন। সঙ্গে প্রতাপ বাবু। আমরা গিয়ে এমার মঠ দেখি। ভারতবর্ষের মধ্যে এই মঠটি সবচেয়ে বিত্তশালী। কেমন নীচু-নীচু ঘরগুলি, দেওয়ালে নানারকম quaint ছবি আঁকা, পাথরের কাজকরা থাম, খাঁচায় টিয়া ময়না পাখী, শান্ত পরিবেশ—যেন প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো রাজপ্রাসাদ। তারপর গেলুম মন্দির দেখতে। গজেন বাবুর মা সেখানে উপস্থিত, তিনি বল্লেন রত্নবেদী দেখবার দেরি আছে একটু। বৌমাকে নিয়ে একটু বোসো। একটি সাধু ভাগবত পাঠ করচেন, সেখানে খানিকটা বসি। তারপর মন্দিরের সব দিক ঘুরে ঘুরে দেখলুম বেলা বারোটা পর্য্যন্ত। মন্দির তো নয়, পাহাড়। ঐ আবার সেই কথা মনে পড়ে—প্রাচীন দিনের ভারতবর্ষ সেখানে যেন অচল হয়ে বাঁধা পড়েছে পাথরের বাঁধনে। গগনচুম্বী গম্ভীরা কি অসাধারণ শক্তি ও বিরাটত্বের পরিচয় দিচ্ছে! জগমোহনের কি গঠন ভঙ্গি! নাটমন্দিরের সরল ও সহজ স্থাপত্যের মধ্যে একটি সখ্য ভাব জড়ানো। ভোগগৃহের সামনে সেই স্তম্ভ বর্ত্তমান আজও, যে স্তম্ভটিতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীচৈতন্য প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করতেন। পাণ্ডারা একজায়গায় তাঁর হাতের

আঙুলের ছাপ দেখায়—আমার বিশ্বাস হোল না যে সে তাঁর আঙুলের ছাপ—আর দেখালেই বা কি। শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন অধ্যাত্ম বিষয়ে পথ দেখাতে, ধর্ম্ম উপদেশ দিতে। তাঁর প্রচারিত নামধর্ম্মের মাহাত্ম্য যদি কেউ ভাল না বোঝে, তবে তাঁর হাতের আঙুলের ছাপ দেখে সে কোন্ স্বর্গে যাবে?

মন্দির দেখতে বেজে গেল সাড়ে বারোটা। কিছু কিছু মিষ্টান্ন ভোগ কিনে উমার জন্যে বাড়ী আনা গেল। ভোগ আসতে বড় দেরি হয়, আজও হোল—বেলা সাড়ে চারটার সময় ভোগ এল।

আজ সমুদ্রের উত্তাল রূপ। ঝড়বৃষ্টি কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়েচে, সুনীল সমুদ্র যেন নিজের আনন্দে নিজে মত্ত হয়ে বড় বড় ঢেউ তুলে কূলে আছড়ে আছড়ে পড়চে। দীর্ঘ টানা ঢেউয়ের রাশি মাথায় সাদা ফেনার পুঞ্জ নিয়ে বহুদূরব্যাপী একটি রেখার সৃষ্টি করেচে। দুপুর বেলায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের সে রূপ দর্শন করলুম। সুমথ বাবু এসে বল্লে, চলুন চা খেয়ে আসি আর সস্তায় জুতো নিয়ে আসি মুচিপাড়া থেকে। ওর সঙ্গে বেরিয়ে হঠাৎ আবার সমুদ্রের সঙ্গে দেখা। আর আমি যেতে পারলুম না কোথাও। অবাক হয়ে চেয়ে বসে পড়লাম। কি বিরাটত্বের আভাস ওই দূরবিসর্পী নীলরূপের মধ্যে, উর্ম্মিমালার সফেন আকুতিতে, তটরেখার বিলীয়মান শ্যামলিমায়। স্থলভূমির শেষ হয়ে গেল এখানে, দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই নীলাম্বুরাশির ওপার নেই, আবার এপারে এই এসিয়া মহাদেশের উত্তর প্রান্ত, ইনিসে ও লেনা নদীর মুখ। অবিশ্যি দক্ষিণ মেরু মহাদেশের তুষারাবৃত নির্জ্জন ভূভাগের কথা তুলচি নে এখানে। নুলিয়ারা সেই বিক্ষুব্ধ বীচিমালা পার হয়ে ডিঙিতে মাছ ধরে আনচে—একটা sword fish দেখলুম আনচে—প্রকাণ্ড করাতখানা ঝক ঝক করচে।

মুচিপাড়ার জুতো দেখতে গিয়ে একটা দোকানে বসে সবাই গল্প করচি। একটি পথ-চল্‌তি লোক এসে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ দেখি সে গালুডির সেই হরিপদ ডাক্তার। অনেকদিন পরে দেখে খুব খুশি হই। বল্লে—বেড়িয়ে বেড়িয়েই জীবনটাকে নষ্ট করলুম বিভূতি বাবু।

সন্ধ্যাবেলা আমার এখানে আড্ডা বসলো—অনেকগুলি ভদ্রলোক এলেন আড্ডা দিতে—যদু মল্লিকের পৌত্র বৃন্দাবন মল্লিক প্রভৃতি। জ্যোৎস্নারাত্রে আবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে কতক্ষণ গল্পগুজব করি।

•

সন্ধ্যায় আজ বীরেন রায়, বৃন্দাবন মল্লিক, গজেন বাবু, সুমথ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে চক্রতীর্থে সমুদ্রতীরে বালির ওপর গিয়ে কতক্ষণ বসে-ছিলাম। দ্বাদশীর জ্যোৎস্না সমুদ্রের উপর পড়ে তার তরঙ্গরাজির রূপ বদলে দিয়েচে, ধু ধু নির্জ্জন বালুচরের গায়ে আছড়ে এসে পড়চে উর্ম্মিমালা —চৈতন্যদেব চক্রতীর্থে সমুদ্রের এই রূপ দেখেই নাকি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন—আজ ৪৫০ বছর আগের কথা। সেই সমুদ্র এখনও ঠিক তেমনি আছে, সেই তরঙ্গ ভঙ্গ, সেই নির্জ্জন বালুতট, সেই ঝাউবন-শ্রেণী সেই উদাস অস্পষ্ট চক্রবালরেখা।

বীরেন রায় আজ সকালে প্রাচীন তোসালি নগরের অনেক পুরোনো পুঁথি, পোড়ামাটির খেলনা, পাথরের মালা ইত্যাদি দেখালেন। উড়িষ্যার প্রাচীন শিলা-সংগ্রহ ইনি করে এসেচেন চিরকাল ধরে। কত টাকা নষ্ট করেচেন এদের পেছনে, অথচ ক্লিভ্‌ল্যাণ্ড মিউজিয়ম থেকে যখন ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে ওঁর সংগৃহীত জিনিসগুলি কিনতে চাইলে, তখন উনি তাদের না দিয়ে সামান্য ছ' হাজার টাকা নিয়ে আশুতোষ মিউজিয়মে

দান করলেন। আজ গালুডির সেই হরিপদ বাবু ভোরে আমার এখানে এসেছিলেন।

সবই মিলে খুব আড্ডা দিয়ে চা খাওয়া গেল 'আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এ—তারপর ওরা সব মুচিপাড়ায় গিয়ে জুতো দেখলে। বৃন্দাবন মল্লিক এসে রামকৃষ্ণ লাইব্রেরীতে নিয়ে গেল। চক্রতীর্থে জ্যোৎস্নায় বেলাভূমির বালুর ওপর বসে অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পরে ফিরে এলুম আমার বাসায়। কতরাত পর্য্যন্ত সেখানে আড্ডা। বীরেন রায় একবার এক বড় বুদ্ধমূর্ত্তি জঙ্গলের মধ্যে কি ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন, সে গল্প করলেন। হঠাৎ বুদ্ধের ধ্যান-প্রশান্ত সুন্দর মুখ দেখে বলে উঠলেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি। ঢেন্‌কানল স্টেটে এক প্রাচীন মন্দির দেখতে গিয়ে উনি পড়েছিলেন king cobraর হাতে। ভগবান সর্ব্বভূতে আছেন এই ভেবে হঠাৎ নাকি মহিম্নস্তোত্র আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন চোখ বুঁজে। অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে দেখলেন সর্প অদৃশ্য হয়েচে।

দুপুরের পরে শঙ্কর মঠে গিয়ে একটি চমৎকার গোপালমূর্ত্তি দর্শন করলুম। দোর বন্ধ রয়েচে দেখে আমি দোর খুলে গিয়ে মেজেতে চুপ করে বসলুম—কেমন একটি সুঘ্রাণ বেরুচ্ছে পুষ্প ও চন্দনের। শ্বেত প্রস্তরের মেজেতে ঠাণ্ডা ও শান্ত পরিবেশের মধ্যে গোপালের মূর্ত্তির সামনে বসে রইলুম কতক্ষণ।

সকালে উঠে সামনের ঘরের বুড়ো বুড়ীকে নিয়ে হরিদাস ঠাকুরের মঠে গেলুম ও পুরুষোত্তম মঠে অনেকক্ষণ ধরে ধর্ম্ম উপদেশ শুনলাম।

'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী' সর্ব্বদা জেগে থাকতে হবে। আলস্যই পাপ। আসবার সময়ে শঙ্কর মঠের শ্রীগোপাল

বিগ্রহ দেখে চলে এলুম। ছোট্ট ঘরটিতে পুষ্প-চন্দনের সুবাস। আহারের পর একটু বিশ্রাম করে কল্যাণী ও উমাকে নিয়ে যাচ্চি—একটি বাড়ীতে কথকতা হচ্চে ‘প্রহ্লাদ চরিত্র’-এর। অনেকক্ষণ বসে শুনলুম। মন্দিরের কাছে হরিদাস ঠাকুরের সিদ্ধ বকুল দেখতে গেলুম। ৫০০ বছরের পুরোনো বকুল গাছ আজও দাঁড়িয়ে। মোহান্ত মহারাজের সঙ্গে আলাপ হোল। কলকাতায় একটি সুন্দরী মহিলাকে ‘মা’ বলে মনটাতে বড় ভক্তি হোল।

আজ সকালে বীরেন রায়ের বাড়ী বসে তাঁর দুর্ল্লভ প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহাবলী দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হোল, আজ না পয়লা আষাঢ়। চলুন গিয়ে কালিদাস উৎসব করা যাক্। এমন সময়ে এল বৃন্দাবন মল্লিক। বল্লে—আপনি বলেছিলেন ‘দেবযান’ পাঠ করবেন লাইব্রেরীতে—অনেক লোক এসে বসে আছে।

গেলুম। যাবার আগে সিদ্ধেশ্বর বাবুদের বাড়ী ‘রমা ভিলা’তে গিয়ে খানিকটা বসলাম। ১৯২৩ সালে একবার সিদ্ধেশ্বর বাবুদের বাড়ী থেকে এখানে আসবার কথাবার্ত্তা সব ঠিক, আমি আমার মেস্ থেকে বাক্স বিছানা সব বেঁধে নতুন একটা সতরঞ্চি কিনে (যখন কিনি সুসার কাকা আবার তখন সেখানে উপস্থিত) মুটের মাথায় চাপিয়ে ওদের বাড়ী এসে দেখি সিদ্ধেশ্বর বাবুর জ্বর হয়েচে, যাওয়া হবে না। ১৯২৪ সালের পৌষ মাসে আর একবার ওরা পুরী আসে, আমি যাই ভাগলপুরে। নরেন এসেছিল আমার স্থানে। ১৯৩৪ সালে সুপ্রভা ও তার বাবা যখন আসেন, তখনও আমার আসবার সমস্ত ঠিক্, সুপ্রভা চিঠি লিখলে, আমি পুরীর টিকিট পর্য্যন্ত কিনে আনলাম। সমুদ্রস্নানের জন্যে একটা কোমরবন্ধ পর্য্যন্ত কিন্‌লাম কিন্তু আসা হোল না।

এতদিন পরে 'রমা ভিলা'তে বসে সেই সব পুরোনো কথাই মনে পড়ছিল। আজ আর কেউ নেই—কোথায় বা সেই সিদ্ধেশ্বর বাবু কোথায় বা অক্ষয় বাবু। এত সাধ করে 'রমা ভিলা'র সদর ফটক সেবার ১৯২৩ সালে করানো হোল—ওরা কোথায় চলে গেল! গেটটি আজও আছে দেখে এলুম।

লাইব্রেরীতে কালিদাস উৎসব সম্পন্ন হোল। প্রিয়রঞ্জন সেনের দাদা কুমুদবন্ধু সেন বক্তৃতা দিলেন। আমিও কিছু বললাম সভাপতি হিসেবে। মনে পড়লো বারাকপুরে গ্রীষ্মের ছুটি অতিবাহিত করবার সময়ে প্রতি বৎসর খুকুর কাছে বলতাম—আজ ১লা আষাঢ়, খুকু এসো কালিদাসকে স্মরণ করি। এতকাল পরে ভাল করেই স্মরণ করা হোল কালিদাসকে। বিকেলে আবার খুরদারোড থেকে আমাকে নিতে এল—সেখানেও ওবেলা 'বর্ষা মঙ্গল' অনুষ্ঠিত হবে। পুরী থেকে তো কাল চলেই যাবো। খুরদা রোড পর্য্যন্ত ফার্স্ট ক্লাসে নিয়ে গেল রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়কে, তুষারকান্তি ঘোষকে এবং আমাকে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, গুমট বেশ। ডাঃ সরকারের বাংলার বাইরের মাঠে সবাই মিলে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া হোল। রাধাকুমুদ বাবু ও তুষারকান্তি বাবু ভূতের গল্প আরম্ভ করলেন—রাত সাড়ে দশটায় সভা। আমার প্রথম বক্তৃতা—সবাই খুব হাততালি দিলে। মহাদেব রায়ের বক্তৃতা অতি চমৎকার হয়েছিল।

পরদিন সকাল আটটার সময় থেকে সারাদিন ট্রেণে। মহানদী ও কাটজুড়ি নদীদ্বয়, দূরের নীল শৈলমালা, কাটজুড়ির বিস্তীর্ণ বালুচর ও তার ধারে সুদৃশ্য কটক সহরটি বেশ লাগলো। সারাদিন চলেচে ট্রেণ সন্ধ্যার কিছু আগে সুবর্ণরেখা পার হয়ে বাংলাদেশে পড়লাম। অমরদা' রোড্ স্টেশন থেকে কয়েকটি গোরা সৈনিক উঠলো এবং

সারারাত গানে গল্পে তাদের সঙ্গে বেশ কাটানো গেল।

ভোরে সাঁৎরাগাছি। টিকিট নিয়ে নিলে এখানে এবং হাওড়া নেমেই সোজা শেয়ালদ' হয়ে বারাকপুরে চলে এলুম। এতদিন পরে ইছামতীতে স্নান করে বড় তৃপ্তি হোল। কোথায় ভুবনেশ্বরের কুচিলা বন, খণ্ডগিরি উদয়গিরির গুহাবলী, পাথার তীর্থ পুরীর নীলাম্বুরাশি—আর কোথায় নলখাগড়া ও বন্তেবুড়ো গাছের সারি ও ইছামতী নদী।

বিকেলে নদীর ধারে নিবারণের পটলের ভুঁইয়ে বসে রইলুম কতক্ষণ। শান্ত বর্ষা শ্যামল গাছপালা। বিশ্বরূপের আর এক রূপ এখান। কুঠীর মাঠে সেই জায়গাটায় গেলুম যেখানে থুকুর আমলে একটা বালির ঢিবি ছিল, খেঁক শেয়ালীতে গর্ত্ত করেছিল—আমি গিয়ে বসতুম।

বাদলা নেমেচে—মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ইন্দু রায় ও হাবু, ফুচুকে সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে যাই। হাবু ও ফুচুর সঙ্গে কালও গিয়ে কাঁচিকাটার পুলের নীচে কচুরি পানার জড়ো করা স্তূপের উপর বসে আরামডাঙার শ্যামল মাঠ ও খেজুর গাছের সারির দিকে চেয়ে মনে হলো এ যেন ঠিক সেই বিলিতি ছবিতে South sea Island-এর দৃশ্য দেখচি। বর্ষা সতেজ কচি ঢোঁঢড়া ঘাসগুলো জলের ধারে কেমন বেড়ে উঠেচে আর তার কি শোভা। একটা রাখাল ছোঁড়া মরাগাঙের ধারের ক্ষেত থেকে কাঁকুড় তুলে খাচ্চে দেখে হাবু তাকে কেবল বলতে লাগলো—ও ভাই, একটা কাঁকুড় দে না তুলে ক্ষেত থেকে?

অনেক অনুরোধ উপরোধে সে একটা মাঝারি সাইজের কাঁকুড় তুলে

নিয়ে আসতেই হাবু ও ফুচু সেটার ভাগ নিয়ে ঝগড়া বাধালে। প্রবহমান ক্ষীণকায়া তটিনীর কূলে বসে পুঁটিমাছ ধরা ছোট্ট ছিপ ফেলে মাছ ধরি আর কাঁচা কাঁকুড় খাই—বেশ লাগে এ জীবন।

আজ বেলা তিনটের সময় ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি ও সেই সঙ্গে ঝড়। ঝড় বৃষ্টির কোনো কামাই নেই আষাঢ় মাস পড়ে পর্য্যন্ত। দিনগুলি ঠাণ্ডা, সজল বাতাস বয় সারাদিন। আজ মেঘবৃষ্টির পরে বেড়াতে বার হই বাঁওড়ের ধারের পথ দিয়ে নতিডাঙার সেই বটগাছটা পর্য্যন্ত। সেই বিশাল প্রাচীন মহীরুহ তার ঘন সবুজ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে আছে মজা নদীর ধারে, দূর বিস্তৃত মাঠে আউশ ধানের জাওলা বেড়ে উঠচে, যেদিকে চাই সেদিকেই ঘন শ্যাম ভূমিশ্রী—আর সকলের ওপর উপুড় হয়ে আছে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। কি নব নীল নীরদ-মালা, দেখে মনে হল তখুনি বিশ্বশিল্পীর এ শিল্প আমি না যদি দেখি, তবে এ পাড়াগাঁয়ের কেউই আর দেখবে না : শিল্পী হিসাবে, কবি হিসাবে আমার কর্ত্তব্য হচ্চে এই অদৃশ্য সৌন্দর্য্যের অপরাজিত আয়তনের সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হওয়া। মেঘের কোলে এক জায়গায় সাদা বক উড়চে—ঠিক বেলেডাঙার পুলটার কাছে। খেজুর গাছ আছে একটা সেইখানে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচি। অবাক হয়ে গেলুম উড়ন্ত বক দুটিকে সেই বর্ষার মেঘ থম্‌কানো অপরাহ্নে কাজল কালো মেঘের গায়ে উড়তে দেখে। জগতে এত সৌন্দর্য্যও আছে! কোথায় এর তুলনা? ধন্যবাদ হে মহাশিল্পী, তুমি আজ আমাকে তোমার সৃষ্ট রূপজগৎকে দেখবার সুযোগ দিলে। এর ভাষা সৌন্দর্য্যের ভাষা, কি বলতে চায় এ মুখর প্রকৃতি এই বন, মেঘ, তৃণাবৃত প্রান্তর, উড়ন্ত বক, খেজুর গাছের সারির মধ্যে দিয়ে নীরব, গম্ভীর ভাষায় তা যে কান পেতে

শুনতে চায় সে শুনতে পাবে। কিন্তু ওই যে বাগদীরা মরগাঙের ধারে বসে মাচা বেঁধে সারি সারি জলি ধান পাহারা দিচ্ছে—ওরা কেউ শুনতে চায়ও না, পায়ও না।

সকাল বেলা আজ বাঁওড়ের ধারের পথে বেড়াতে গেলুম। নীল আকাশ, গাছপালার প্রাচুর্য্য, বনবিহঙ্গের কূজন আমার মনকে অপূর্ব্ব আনন্দ রসে অভিষিক্ত করে রাখলে। একস্থানে বসে চারিধারে চেয়ে চেয়ে দেখি—কি চমৎকার অপরূপ সৌন্দর্য্যশিল্প ভগবানের। কুঠীর মাঠে পেয়ারা গাছটার তলায় এসে বসলুম নরম সরস সবুজ ঘাসের ওপর গামছা পেতে। যেন কত বন, এমন সবুজ তেলাকুচা লতার তাজা সাদা সাদা ফুল ও ঝলমলে সূর্য্যালোকে প্রজাপতির আনন্দ নৃত্য দেখে দেখে সারাজীবন কাটিয়ে দিলেও আমার আনন্দ কখনও পান্‌সে হয়ে যাবে না—এই রৌদ্রদীপ্ত প্রভাতের আনন্দ, এই তরুলতার শ্যামল রূপের আনন্দ, নীল আকাশের আনন্দ।

বিষম বর্ষা কমেচে আজ ক'দিন। বিরাম-বিশ্রামহীন বর্ষা, মেঘ-মেদুর আকাশ। কাল আমরা (কল্যাণী, তিনু ও আমি) বিকেলে কুঠীর মাঠ দিয়ে মরাগাঙের খাল পার হয়ে আরামডাঙা বলে ছোট মুসলমানের গ্রামটিতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা বাড়ীতে বৌয়েরা কল্যাণীকে খুব যত্ন করে পিঁড়ি পেতে দিলে, পান সেজে দিলে, একটা কাদের ছোট ছেলে এনে ওর কোলে দিয়ে আপ্যায়িত করলে। বেশ লাগলো ওদের সরলতা। মরাগাঙের ধারে যখন বসেচি, তখন সবুজের কি বিপুল সমারোহ চারিদিকে! সামনে আরামডাঙা, ওদিকে বেলেডাঙা যেন সবুজের সমুদ্রে ডুবে আছে। যখন আমাদের ঘাটের কাছাকাছি

এসেচি, তখন মেঘের ফাঁকে আষাঢ়ী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র একটু একটু উঁকি মারচে—মেঘভাঙা সেই জ্যোৎস্নাতেই আমরা নদীজলে স্নান করতে নামলুম। সন্ধ্যায় ট্রেণ যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। কিন্তু গতকাল রাত্রে জ্যোৎস্নার কি অপূর্ব্ব শোভা রাত দশটার পর দেখা দিল সারাদিনের বৃষ্টিস্নাত আকাশে! বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে দেখি আকন্দ পাতা, সজ্‌নে গাছ, বাঁশ ঝাড়, বন কাপাসের ডাল—এ সবের ওপর সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নার কি শোভা—বিশ্বরূপকে একেবারে প্রত্যক্ষ করলুম সামনে। ছেলেবেলা এমন পাঁচড়া হয়েছিল—তখন এ সময় দেশে ছিলুম, আর কখনো থাকিনি।

আজ বড় সুন্দর শরতের রোদ। নাইবার পূর্ব্বে পেয়ারাতলায় গিয়ে বসি কুঠির মাঠে, প্রজাপতি উড়চে ফুলে ফুলে। শ্যামল বনঝোপ কি সুন্দর চারিদিকে। কে যেন এসে পেছন দিক থেকে চোখ টিপে ধরবে সব সময়েই মনে হয়। উঠে আসতে ইচ্ছে করে না—কি সৌন্দর্য্য! ঘাটে এসে যখন স্নান করতে জলে নামি—তখন নদীর ওপারের নীল শোভা হৃদয় মুগ্ধ করে দিলে। কাল বনগাঁ থেকে জমি কিনে ফিরে আসবার পথে ইন্দু বারিক আমি ও সন্তোষ খুব ভিজে গেলুম ঝড় বৃষ্টিতে।

পরশু নুটু ধলভূমগড়ে ফিরে গেল। অনেকদিন পরে সে দেশে এসেছিল—দিন চারেক ছিল। একদিন ইন্দুর সঙ্গে বেলেডাঙার ধারের সেই সুন্দর জায়গাটাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম—একদিন মরগাঙে আমাদের কেনা জমিগুলোতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পরশু বিকেলে ইন্দু, মধু কামার ও খুড়ো মাছ ধরচে—আমি বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে

হাজির। আকাশের এই অদ্ভুত রং ও রচনার তলায় দুলে দুলে মানুষে এই রকম মরগাঙের ধারের মত জাল ফেলচে, ছিপে মাছ ধরচে, যুগল ঘোষের মত গরু চরাচ্চে, তামাক খাচ্চে, পটলের ভুঁই নিড়ুচ্চে—এমনি ঝিঙের ক্ষেতে হলুদ ফুল ফুটচে, কত শত বছর থেকে ভর সন্ধে বেলা—এমনি শান্ত, অনাড়ম্বর জীবনধারা চলচে।

কাল উষার পত্র পেলুম লাহোর থেকে, ম্যাট্রিক পাশ করেচে খবর দিয়েচে। সুখী হলুম খবর পেয়ে। সামনের শনিবারে পাথুরেঘাটার অক্ষয় ঘোষের মেয়ে ছোট বুড়ীর বিয়ে। সেখানে নিমন্ত্রিত আছি, যেতে হবে শনিবারে।

ক'দিন ভীষণ বৃষ্টির পরে আজ দুদিন আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েচে। গত শনিবার ২৬শে শ্রাবণ অক্ষয় বাবুর মেয়ে ছোট বুড়ীর বিয়ে হয়ে গেল—সেখানে রামজোড়, ছুট্টু সিং, সরণপ্রসাদ, যুগল তাদের সঙ্গে দেখা। বহুদিন পরে ইসমাইলপুরের সেই আবহাওয়া যেন ফিরে এল। আগামী শনিবারে এখান থেকে ঘাটশিলা যাবে, নুটু চিঠি লিখেচে।

পরশু ফণি কাকা মাছ ধরতে গিয়েছিল সুন্দরপুরের নীচে মরগাঙে, আমি তার খোঁজে সুন্দরপুর পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। ওপথে অতদূর অনেকদিন যাইনি। বন কলমীর ফুল ফুটেচে ঝোপের মাথায়, চারিধার ভরপুর সবুজ, কি অদ্ভুত শোভা ঝোপগুলির। এই ঝোপ ঝাপ এ অঞ্চলের একটী বৈশিষ্ট্য—এর সৌন্দর্য্য বর্ষাকালে যে দেখবে সেই মুগ্ধ হবে। আর আমার সেই পেয়ারাগাছের তলাটা। সেখানে ছোট ছোট পাতা-ওয়ালা ভ্যাদ্‌লা ঘাস্ হয়েচে যেন সবুজ মখমলের আসন বিছানো, মাথায় ওপর নত হয়ে আছে পেয়ারা ডালটি। সুরেনদের বাড়ীর পেছনে আর একটা ঝোপে বনকলমী ফুটেচে দেখে সেদিন আমি আর চোখ

ফেরাতে পারিনে। বিশ্বশিল্পীর এই অপূর্ব্ব দৃষ্টির ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ মনের গভীর অন্তস্থলে সচেতন ভাবে গ্রহণ যে করতে পারে, এ পৃথিবী, ফুলফল, নীল আকাশ, উদার ভূমিত্রী তার কাছে আপনরূপে ধরা দেয়।

কাল কলকাতা গিয়েছিলুম—সকালে গিয়ে রাত ন'টায় ফিরি। আজ ক'দিন থেকেই আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে সাঁতার দিয়ে চলে যাই, কূলে কূলে ভরা নদীর ধারে বনঝোপ, সাঁই বাবলা গাছ, নীল আকাশ শরতের রোদ, ঘুঘুর ডাক—সত্যিই যেন বহুকাল পূর্ব্বেরই বিস্মৃত বাল্যদিনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সাঁতার দিয়ে বাঁশতলায় উঠি তারপর নিভৃত বনচ্ছায়ায় একস্থানে একটি বনকলমী ফুলের ঝোপের কাছে বসে রইলুম, ওদিকে কি একটা গাছের মাথায় মাকাললতা উঠে কেমন একটা চমৎকার ঝোপের সৃষ্টি করেচে। রোদ না থাকলে, নীল আকাশ না থাকলে কি শরৎ মানায়? এতদিন শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি! গরম রোদ হবে, লতাপাতার কটুতিক্ত গন্ধ বার হবে তবে শরতের স্বপ্নলোক নামবে নীল আকাশের অনন্ত মুক্তির চন্দ্রাতপতলে।

আজ কুটীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে সেই পেয়ারা গাছটার তলায় চুপ করে বসি—গাছে উঠিও। গাছে উঠলে যেন অন্য মানুষ হয়ে যেতে হয়—বন্যপ্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ যেন আরও নিবিড় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নিবারণের ভূঁই থেকে জলে নামলুম ও সাঁতার দিতে দিতে কত নল খাগড়ার বন, ভাসমান কচুড়িপানার দাম, কলমীলতার পাশ কাটিয়ে দোদুল্যমান কত বাবুই পাখীর বাসা, নীল আকাশের তলায় শরৎ মধ্যাহ্নের শুভ্র মেঘস্তূপের দিকে চেয়ে চেয়ে এসে পৌঁছুলাম বনসিমতলার ঘাটে।

অভিলাষ জেলে ওপারে দোয়াড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে বলচে—বাবু, ঘোলার গাঙে এমন ভেসে বেড়াচ্চেন কেন? কত আপদ বালাই থাকে, বিপদের কথা কি বলা যায় বাবু? অমন বেড়াবেন না।

অপূর্ব্ব শান্তি ও আনন্দ পাই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে এমনি ধারা মিশিয়ে দিয়ে।

বিকেলে আজ বাঁওড়ের ধারে বেড়াতে গিয়ে সেই অশথ গাছটার ওপর উঠে বসলুম খানিকক্ষণ। দূরে বাঁওড়ের নির্ম্মল জল, আমার চারিপাশে নিস্তব্ধ বনানী। এক জায়গায় কি অজস্র বনকলমী ফুলই ফুটেচে! জেলেপাড়ার ঠিক পেছনের মাঠটাতে। সাঁকারীপুকুরের রাস্তা দিয়ে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চলে এলুম।

আজ দুপুরে দুলা সাঁওতালের সঙ্গে হেঁটে এলুম বরাজুড়ি। শরতের নীল আকাশ, দূরে দূরে নীল শৈলশ্রেণী, বাটাইজোড় পার হয়ে চ্যাংজুড়ি সারাডাবা প্রভৃতি সাঁওতালী গ্রাম পার হয়ে গেলুম অবশেষে বরাজুড়ি বলে গ্রামে, খোলার অর্ডার দিতে। খোলা অর্থাৎ চাল ছাইবার খাপরা। কি সুন্দর গ্রামটি, ঢুকেই আমার ভাল লাগলো, ছায়া নেমে এসেচে শরৎ অপরাহ্নের মৌলবনে ও শালবনে, দীঘিতে রক্ত মৃণাল ফুটেচে, শ্যাম ধানের ক্ষেত ঠেকেচে সুদূরের নীল শৈলমালায়। কার্ত্তিক গোরাই বলে একজন দোকানদার আমাকে খাতির করে চা খাওয়ালে—বল্লে ধানের জমি বড় সস্তা। দোকানে লোকে এ বিশ্বব্যাপী দুর্দ্দশার দিনে ঘটি বাটি বাঁধা রেখে ছোলা, কলাই (এ দেশে বলে বিরি) নিয়ে যাচ্চে। সন্ধ্যার আগে চলে এলুম। তখন বেশ ছায়া নেমেচে, গুটকে কেবলই মংলার নিন্দে করচে সারাপথ। আজ এসে পড়লুম সেই চমৎকার কথাটি—।

"On the contrary, the wise man is conscious of himself, of God. If the road I have shown to lead to this is very difficult, it can yet be discoverd. And clearly it must be very hard when it is so seldom found. For how could it be that it is *neglected practically by* all, if salvation were close at hand and could be found without difficulty? But all excellent things are as difficult as they are rare." Ethics—Spinoza.

"The really valuable things in human life are individual—what is of most value in human life is more analogous to what all the great religious teacher have spoken of." Power—Bertrand Russel.

"The ultimate realities of the universe are at present quite beyond the reach of science, and probably are for ever beyond the comprehension of the human mind.

—Sir James Jeans.

"There can never be any real opposition betwen religion and science; for the one is the complement of the other...It was not by accident that the greatest thinkers of all ages were deeply religious souls." Max Plauck.

ওপরের কথাগুলো সমর্থন করে আমারই অনুভূতির, যে অনুভূতির কথা আমি এই ডায়েরীর নানাস্থানে নানা আকারে লিখেছি। সেই স্তব্ধ চিন্ময় ভাবলোক যার সন্ধান মেলে নদীতীরে নেমে-আসা অপরাহ্নের

নির্জ্জনতার, বনঝোপে ফোটা বনকলমী ফুলের উদাস শোভার, আঁধার নিশীথে মাথার ওপরকার জলজ্বলে নক্ষত্র ছিটানো ছায়াপথের বিরাট ইঙ্গিতে। যে জীবনরহস্যের মূল উর্দ্ধাকাশে, শাখা প্রশাখা ধরণীর ধূলিতে।

মিঃ সিন্‌হার মোটরে আমি ও কল্যাণী ধলভূমগড়ে নুটুর বাসায় এসে দেখি গুট্‌কে, মংলা ও গোপাল উপস্থিত। ওখানে বিকেলের দৃশ্যটি বেশ চমৎকার হয়েচে। চা খেয়ে চলি আবার মোটরে, চাকুলিয়া থেকে বর্ষাস্নাত বনের দৃশ্য দেখতে দেখতে মান সমুড়িয়া হয়ে বহরাগোড়া ডাকবাংলো পৌঁছে গেলুম। সেদিন কত রাত পর্য্যন্ত গল্প করি। পরদিন অর্থাৎ গতকাল খাড়া মৌদা হয়ে বম্বে রোড দিয়ে দুধকুন্তী রিজার্ভ ফরেষ্টের বাংলোতে। খড়ের ঘাটোয়ালি বাংলো, চারিধারে আম ও ফলবান বৃক্ষের কুঞ্জ। নিকটেই বন আরম্ভ হয়েচে, জানালা দিয়ে চোখে পড়চে—এতোয়া বৃষ্টিস্নাত বনভূমি থেকে বন্যশনের ফুল ও বন্য কলাফুলের মত কি ফুল নিয়ে এল। বৃষ্টি পড়চে—কল্যাণী রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' পড়চে, আমি টেবিলে বসে ভাবচি, এ যেন আমার ক্রীত মৌজা, ওই বন আর এই ঘাটোয়ালি বাংলো যদি আমার থাকতো এমন নির্জ্জন স্থানে ডুবে লিখবার কতসুবিধাই না হোত। কতক্ষণ পরে মিঃ সিন্‌হা বন তদারক করে ফিরে এলেন, আমরাও একটা বনের মধ্যে যেতে যেতে বনবিভাগের রোপিত বোনা গাছ ও শিশুগাছ দেখলাম। বিকেলে বাংলোতে বেড়াতে এলেন হেডমাষ্টার মহাশয়। কাল এখানে মিটিং আছে। কি থৈ থৈ করচে space এখানে ডাক-বাংলোর আশে পাশে। অস্ত আকাশের রং অতি অদ্ভুত। গত ফেব্রুয়ারী মাসে দৃষ্ট সেই সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে দেখি আশ্রমটা

একেবারে ভেঙে পড়ে গিয়েচে, চালের খড় খসে পড়চে, আমরা সন্ধ্যার পরে আসবার সময় দুটি ছোকরাকে সেখানে দেখলুম—সেই অন্ধকারে ঘরের মধ্যে তারা কি করচে? ওরা নাকি ওখানে আমোদ করতে এসেচে। এই ভাঙা বাড়ীতে এরা গল্প করে বসে। আমাদের তখনই মনে সন্দেহ হোল—পরে শুনলুম ওরা ওখানে বসে গাঁজা খায়। মৃদু জ্যোৎস্নালোকে কতক্ষণ সাঁকোর ওপর বসে ভগবদ্বিষয়ে চর্চ্চা করি। কত রাত পর্য্যন্ত গল্প করলুম বাংলোতে বসে।

সকালে মেঘ ও ঠাণ্ডা দিন। মোটরে কল্যাণী, আমি ও মিঃ সিন্‌হা চলে গেলুম কেশরদা বাঁশবনে। এই বিরাট বাঁশবনের রোপন ইত্যাদি কাজ বন বিভাগ থেকে করা হয়েচে। নুরুল হক Ranger বল্লে—হুজুর, দুহাজার কাঁটালের চারা পোঁতা হয়েচে।

আমরা কেশরদা গ্রামে চলে গেলুম। এই গ্রামটি বাঙালী ও উড়িয়া অধিবাসীদের গ্রাম। কথার মধ্যে অনেক উড়িয়া মেশানো। আমাদের মোটর যেতে অনেক লোক এল—বল্লে, এবার খাদ্যের অভাবে বড়ই কষ্ট হয়েচে লোকের। কল্যাণীকে নিয়ে গ্রাম্যদেবী স্বর্ণ বাউড়ীর মন্দির দেখি। বহু পুরোনো মূর্ত্তি—নাকমুখ ভাঙা, মন্দিরের আশপাশে অমন ছোট বড় কত মূর্ত্তি পড়ে আছে। কৃষ্ণ পাণ্ডা বলে ওই মন্দিরের পূজারীর বাড়ী আমরা গিয়ে বসলুম। ওরা কল্যাণীকে নামিয়ে নিয়ে গেল। মাটির ঘর, দেওয়ালে সুভাষ বসু ও গান্ধির ছবি। একটা লোকের বোধহয় জ্বর হয়েচে, সে খাটিয়ায় শুয়ে আছে—বল্লে, ম্যালেরিয়া নয়, কারণ ম্যালেরিয়া জ্বর এখানে নেই। কঙ্কালসার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এল ২৫।৩০টি, এরা নাকি ডোমেদের ছেলে, সারাদিন ভিক্ষে করে বেড়ায়; এক এক মুঠো সবাই দেয়। চিন্তামণি পাণ্ডা এক ধামা মুড়ি নিয়ে ছেলেদের

এক এক মুঠো মুড়ি সবাইকে দিলে, তারপর তারা কাঠ ও গরু চরানো নিয়ে দুঃখ করলে। আমাকে পাণ্ডাঠাকুর বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে চিঁড়ে, দই ও দুধ খাওয়ালে। একটা ঘরে নিয়ে গেল, বেতের ঝাঁপি যে কত রয়েচে সারি সারি—৺পুরীর দোকানের সেই বেতের ঝাঁপির মত। কোনো ঘরে একটা দরজা জানালা নেই, অন্ধকার সব ঘর। বেলা একটার সময় ওখান থেকে ডাকবাংলো গিয়ে স্নানাহার সেরে নিই। তখনই একটা স্কুলের ছেলে ডাকতে এল, আমরা গেলুম মিটিংএ। হেড্‌মাষ্টারের বাড়ীতে চা ও খাবার খেলুম সাহিত্য সভার পরে। গ্রীক যুবক হেলিওডোরাসের যেন আবির্ভাব হোল বহু শতাব্দী পরে।

সন্ধ্যার সময় কল্যাণীকে নিয়ে স্নুবর্ণরেখার এপারে বোনালি ঘাটে গিয়ে বসলুম। ওপারে ময়ূরভঞ্জের শৈলমালা, বড় একটা শৈলমালার ওপর প্রকাণ্ড একখানা কালো মেঘ ঝুঁকে পড়ে আছে। এপারে মাঠে নিসিন্দে গাছের বেড়ার ধারে বসে আছি। ভগবানের উপাসনা করলুম সেখানে। কল্যাণী গাইলে যো দেবাগ্নৌ যোঽপ্সু ইত্যাদি উপনিষদের সেই গভীর বাণী।

জ্যোৎস্না উঠেচে—চতুর্থীর ভাঙা চাঁদ। কিন্তু থৈ থৈ করচে মুক্ত space বহরাগড়া ডাকবাংলোর সামনে। কত রাত পর্য্যন্ত আমরা জেগে বসে থাকি রোজ রোজ—এমন দূরপ্রসারী space আর কোথায়? জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা বেড়াতে গেলাম সেই সন্ন্যাসীর ভাঙা আশ্রমটির কাছে।

সকালে বহরাগড়া থেকে বেরিয়ে ধলভূমগড়ে নুটুর মেডিক্যাল ক্যাম্পে এলুম। সেখানে ভাত খেয়ে আবার মোটরে বার হই। একটা কুলীর মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েচে ডিনামাইট ফাটাতে গিয়ে। কল্যাণী তাকে

দেখে বড় কাতর হয়ে পড়লো। ধলভূমগড়ের ক্যাম্পটি বেশ জায়গায়। সামনে দূরবিস্তৃত শালবন ও সবুজ ধানবন। আজ চাকুলিয়ার হাট, সাঁওতাল মেয়েরা ঝাঁটা নিয়ে বিক্রি করতে আসচে চাকুলিয়ার হাটে। কল্যাণী কেবল বলচে, ঝাঁটা কিনলে হোত!

ওখান থেকে এলুম ঘাটশিলা। বেলা ৫টার সময় চা খেয়ে আবার মোটরে বার হই এবং সুবর্ণরেখা সেতু পার হয়ে রাখা মাইন্‌স্ মিলিটারি ক্যাম্পে লেফ্‌টেনাণ্ট জহুরী ও বোসের আতিথ্য গ্রহণ করি।

সকালে রাখা মাইন্‌স্ থেকে চা খেয়ে বার হয়ে কালিকাপুর রোড আপিসে এসে গল্পগুজব করি। সেখানে হেলিওডোরাসের গল্পটি পাঠ করি। বেশ জায়গা কালিকাপুর। চাঁইবাসা এলুম বেলা বারটার সময়ে। দ্বিজু বাবু এলেন ঘাটশিলা থেকে—খুব মিটিং হোল। সারা রাত্রি কোলহান পার্কে রাত জেগে আবৃত্তি ইত্যাদি করা গেল ও শেষরাত্রের জ্যোৎস্নালোকে চলে এলুম মোটরে চক্রধরপুর। দ্বিজু বাবুকে নামিয়ে দিয়ে আমরা সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নালোকে পোড়াহাট পাহাড় ও বনানীর মধ্যে দিয়ে হেসাডি বাংলোতে পৌঁছুলাম। মোটরে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল আজ আমাদের দেশের হাটবার ছিল।

মোটরেই ঘুমিয়ে নিলাম। ভোর হোল—চা খেয়ে চলে এলুম হিড্‌ণী falls-এ। স্থানটির কি অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য। উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র বেয়ে এই বড় ঝর্ণাটা পড়চে—চারিপাশে ঘন বনানী, চূণা পাথরের ধ্বসে পড়া চাঁই। স্নান করার সময়ে রাঁচীর হুড্রু জলপ্রপাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বনের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলার পথ বেয়ে আমি, সুবোধবাবু, মিঃ সিন্‌হা ও পরেশ সান্ন্যাল চলে এলুম। জলপ্রপাতের এপারে

হে অরণ্য কথা কও

পাথরের আসনে বসে লিখচি। জলপ্রপাতের গম্ভীর শব্দ বনের বনস্পতিতে বনস্পতিতে প্রতিধ্বনিত হচ্চে যুগযুগান্তের বাণীর মত। কি গম্ভীর শোভা! এক ধারে বনে অসংখ্য Lantana camera ফুটে আছে। কানের কাছে সুবোধ কেবল বলচে, চলুন ফিরে যাই, চলুন ফিরে যাই। এই নির্জ্জন বনের মধ্যে এই অপূর্ব্ব গম্ভীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বসে সেই সৌন্দর্য্য স্রস্টার উদ্দেশে প্রার্থনা নিবেদন করি। এই স্থানে বনের পরিবেশের মধ্যে বসে তাঁর কথাই আগে মনে পড়ে। ওপরে নীল আকাশ, চারিদিকে বনশ্রেণীর নির্জ্জনতা—সতিাই হরি রায়ের কথা, আমাদের গ্রামের বহু হতভাগ্যের কথা এখানে না মনে হয়ে পারে?

এবার এই ক'দিনের মধ্যে কত জায়গায় বেড়ালুম। বহরাগড়ার সেই মুক্ত space, কেশরদা গ্রামের সেই উড়িয়া পাড়ার বাড়ী, ধলভূমগড়ের মুক্ত সবুজ ধানের ক্ষেত ও শালবন, রাখা মাইন্‌স্‌-এর মিলিটারি ক্যাম্পে চাঁদ ওঠা রাত্রে বোসের সঙ্গে গল্প করচি। সকালে এলুম কালিকাপুর, সেখান থেকে চাঁইবাসা, আবার কল্যকার মত শেষরাত্রের জ্যোৎস্নালোকে চাঁইবাসা থেকে ৪২ মাইল দূরবর্ত্তী হেসাডি বাংলোতে মোটরে আগমন পোড়াহাট অরণ্যের মধ্যে দিয়ে—তারপর আজ এই হিড়্‌নি জলপ্রপাতে স্নান সকাল বেলা!

চলার গান সার্থক হোক জীবনে। চরৈবেতি।

সামনে চেয়ে দেখি উত্তুঙ্গ শৈলগাত্রের গায়ে থাকে থাকে ঘনশ্যাম বনানী, রাঙা পাথর ও মাটির ক্ষয়িত পর্ব্বতগাত্র, অনেক উঁচুতে বড় বড় বট অশ্বথের মত বনস্পতি, তার ওপরে শরৎ দুপুরের নীল আকাশ, পাশেই বিশাল হিড্‌নী প্রপাতের তুলোর বস্তার মত দ্রুত নীয়মান জলধারা, তার ডানপাশে আবার বন, তার নীচে ল্যাণ্টানা ক্যামেরার জংলী রঙ্গীন ফুল।

ছায়া পড়েচে মেঘের—অন্য কোনো শব্দ নেই শুধু জলপতন ধ্বনি দ্বারা বিখণ্ডিত নৈঃশব্দ আর বনবিহঙ্গ কাকলী। প্রকৃতির এমন নিভৃত লীলা নিকেতনে মন সৃষ্টিমুখী হয়ে ওঠে, বিশ্বের স্রষ্টার অপূর্ব্ব রহস্যের দিকে মন যায় চলে—এখানে মানুষ ছোট হয়ে গেছে—এই আকাশ, এ কোয়ার্ট জাইটের চাঁই বাঁধানো সুবিশাল শিলাসন, এই বনানী, এই ফেনপুঞ্জবাহী দ্রুতপতনশীল জলধারা—এরাই বড়।

পরেশ বাবু সেখানে বসে গান গাইছেন। মিঃ সিন্‌হা ডায়েরী লিখচেন—সুবোধ সর্ব্বদা ব্যস্ত, সে চলে গিয়েচে মোটরে। কল্যাণীকে এবার আনতে হবে এখানে। কতদূর এখান থেকে বারাকপুর, কুঠীর মাঠের আমার সেই পেয়ারাগাছের তলাটা, কূলে কূলে ভরা ইছামতী ও তার তীরে কাশের ফুল ফোটা চরভূমি? সেই আমাদের নৌকো করে বনগাঁয়ে যাওয়া আজ যেন স্বপ্ন বলে মনে হয় না কি?

সত্যিই মনে হচ্চে কে যেন আমায় হাত ধরে দেশে বিদেশে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চেন নতুবা তো গ্রামে বসে বারিক মণ্ডল ও ফণিকাকার সঙ্গে ধান বোনার গল্প করতাম, হরিপদদার সঙ্গে মোকদ্দমার ষড়যন্ত্র করতাম।

ভগবানকে এজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।

তারপর কি চমৎকার রাস্তা দিয়ে মোটরে এসে বসলুম। সুবোধ বাবু যে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে রাস্তা এটা নয়, এপথে বড় বড় বনস্পতির ঘন ছায়া—এক ক্ষুদ্র ঝর্ণার ওপর পাথরের সাঁকো, একটা শিউলি গাছে যথেষ্ট কুঁড়ি ধরেচে। যেন ঋষির পবিত্র তপোবনের স্থান। তারপর চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের শোভাও অদ্ভুত। মোটর চললো কালকার রাত্রের বনভূমি ভেদ করে। বন কলমী ফুল আরও কত কি ফুল বনের মধ্যে ফুটেচে এই বর্ষা শেষে। ২০০০ হাজার ফুট উঁচু টেবো বাংলোর ধার দিয়ে গাড়ী চলেচে—পাশে বর্ষায় উদ্দাম এক

পাহাড়ী নদীর গৈরিক জলধারা। শিউলি গাছ মুকুলিত হয়েচে এ বনেও। সুবোধকে বলি—সাহিত্যিকদের জন্যে আপনারা P.W.D. থেকে এখানে একটা বাংলো তৈরি করে দিন না? যেখান থেকে সমতলভূমির দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়, সেখানেই একথা উঠলো। জলতেষ্টা পেয়েছিল, রাঁচী রোডে নেমে নাকটি বাংলোতে এসে গাড়ী থামিয়ে জলের সন্ধানে গেল ড্রাইভার। বেলা তখন একটা, কিন্তু ডাকবাংলার চৌকীদারের টিকি দেখা গেল না কোথাও। তখন জলের আশা ছেড়ে দিয়ে চক্রধরপুর এসে জল খাওয়া গেল, নগেন বাবুর ছেলে জল নিয়ে এল।

রাত্রে সুবোধ বাবুর বাড়ী দুচারটি ভদ্রলোকের সামনে গল্পপাঠ করলুম।

আজ দিনটি বেশ পরিস্কার। পরশু রাত্রে সারারাত্রি হৈ হৈ-এর পরে খুব আরামের ঘুম হয়েচে। সুবোধ ও অবিনাশ বাবু এসে চা খাওয়ার সময়ে গল্প করলেন—চালের দর, ট্রেণে ভীষণ ভিড়। প্রেমচাঁদের গল্প 'বেটিকা ধন' ও 'সুহাগ কী শাড়ী' দুটি হিন্দীতে পাঠ করা হোল চায়ের টেবিলে। এখানে বেশ সাহিত্যিক আবহাওয়া। মনে পড়চে কাল এ সময় সৌন্দর্য্যময় বনভূমির মধ্যে বসে ছিলাম। এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র, রাঙা মাটি ও চূণা পাথরের ধ্বস্ নামা খাড়া দেওয়াল, সেই অজস্র Lantana পুষ্প। আজ আকাশ খুব নীল, হেসাডি ডাকবাংলোতে কাটানোর উপযুক্ত দিন যেন এগুলি।

সন্ধ্যায় সুবোধ বাবুর বাড়ীতে চায়ের আসরে আমার গল্প দুটি পড়া হোল—গ্রীক যুবক হেলিওডোরাস কি করে বাসুদেবের ভক্ত হোল ও

'ভিড়'। রাত্রে ফিরে এসে খেয়ে শুয়ে পড়ি। কোল্‌হান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কে মিত্র, আরও কয়েকটি উকীল উপস্থিত ছিলেন।

ভোরে উঠে আমি ও মিঃ সিন্‌হা চা খেয়ে হিন্দি সাহিত্যিক প্রেমচাঁদের বই পড়ি। জগৎ সিং এসে ভাঙেই ভাঙে অর্থাৎ 'আমি বার বার বলচি' গল্পটি করেন। এই গল্পটি ওঁর মুখে কতবার শুনেচি—যতবার শুনি, নতুন লাগে প্রতিবার। সুবোধ বাবু এসে বল্লে—সে ডেপুটি কমিশনার মিঃ কেম্পের গাড়ীতে টাটা চলে যাচ্ছে। একটু পরে ঘাটশিলা থেকে মুকুল চক্কত্তি এল। তারপর আমরা মোটরে বার হয়ে ভবানী সিংয়ের বাড়ী যাই। গত ৩০শে চৈত্র এঁর বাড়ীতে কম্পাউণ্ডে বসে আমরা চা খেয়েছিলাম—চাঁইবাসার বাইরে অপূর্ব্ব মুক্ত space এর বাহার, একদিকে নীল শৈলমালা—বরকেলা ও সেরাইকেলা। আমার মনে হোল সেরাইকেলা শৈলমালাই বরাবর গিয়ে বুরুডি ও বাসাডেরার পাহাড়ে শেষ হয়েছে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম। মস্ত বড় হাট বসেচে চাঁইবাসায়—বাঁশমতী চাল বিক্রি হচ্ছে ৩২৲ টাকা মণ। কিন্তু অতি সুন্দর সরু চাউল।

সেই সন্ধ্যায় ট্রেণে এসে টাটানগর পৌঁছে গেলুম ও বাদাম পাহাড়ের যে গাড়ীখানা প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে, তাতেই শুয়ে রইলাম। ছোটনাগপুরের অধিবাসী হয়ে গিয়েচি আজকাল। বরকাকানা ও মুরী থেকে রাঁচি এক্সপ্রেস আসবে তারই সন্ধানে বার বার গাড়ী থেকে নামচি কিন্তু গাড়ী পেলুম না। ভোরে বম্বে মেল ধরে ঘাটশিলা পৌঁছুই। আসানবনী ছাড়িয়ে দূর থেকে আমাদের অতি পরিচিত সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মোচাকৃতি শিখরদেশ দেখে মনে কি-আনন্দ! বাড়ী এসেচি মনে হোল বহুদিন প্রবাস যাপনের পর। ওই সেই মিলিটারি ক্যাম্প রাখা মাইন্‌স-এর—

শনিবার রাত্রে যেখানে লেফটেনাণ্ট জহুরী ও বোসের অতিথি হয়ে রাত কাটিয়েছিলাম। গালুডির বিষ্ণু প্রধান যাচ্চে এ গাড়ীতে, সে নমস্কার করে বল্লে, কোথায় নামবেন? আমি বল্লাম, ঘাটশিলায়।

রেডিও বক্তৃতা দিয়ে বারাকপুর গিয়েছিলাম একদিনের জন্যে। শিউলি ফুল ফুটচে দেখে এসেচি। বেশ লাগলো একটা দিন। তবে ম্যালেরিয়াতে সবাই ভুগচে। ফণি রায় ও আমি এক সঙ্গে বেলা দুটোর গাড়ীতে চলে এলুম। ঘাটশিলা যেদিন এলুম, সেদিন সুরেশ বাবুও এলেন আমার সঙ্গে।

ক'দিন খুব জ্যোৎস্না। আজ চতুর্দ্দশী, কাল কোজাগরী পূর্ণিমা। রাত ৮৷৷টা পর্য্যন্ত দ্বিজেন মল্লিকের বাড়ী বসে গল্প করলুম—তারপর মনে হোল আজ জ্যোৎস্নাটি মাটি করবো? কোথাও যাবো না? অত রাত্রে সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাতে হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেলুম ফুলডুংরি।

রাত ন'টা। বেশি রাত্রির জ্যোৎস্না। আমার সেই প্রিয় স্থানটিতে পাথরের ওপর গিয়ে যোগাসনে বসলুম। দূরে বুরুডি ও বাসাডেরা পাহাড় ও বনানীর মাথায় একটি নক্ষত্র অনন্তের হৃদ্স্পন্দনের মত টিপ টিপ করে জ্বলচে। জ্যোৎস্নাস্নাত বনভূমি ও ফুলডুংরি পাহাড়ের সে রূপে মন মুগ্ধ, স্তব্ধ ও বিস্মিত হয়ে উঠেচে। মুখে কথা বলতে পারি নে —এমন একটি অবশ, আড়ষ্ট ভাব। ভগবানের উপাসনা এখানে নীরব ও ভাবঘন, সমাহিত। বিশাল প্রান্তরের যেদিকে চাই—জ্যোৎস্না-লোকিত ধরিত্রী যেন জন্মমরণ-ভীতি-ভ্রংশি কোন্ মহাদেবতার সঙ্গে ঘনিষ্ট মিলনের আনন্দে নিস্পন্দ সমাধিতে অন্তর্মুখী। শুধু দেখা যায় বসে বসে এর অপূর্ব্ব রূপ, শুধু অনুভব করা যায় মনের গোপন অন্তরে এর সে নীরব বাণী। চারিদিকে নিঃশব্দ, একে তো নির্জ্জন প্রান্তর—এত রাত্রে

এখানে কেউ আসে না—ভূতের ভয়ে স্থানীয় লোক এদিকে নাকি থাকে না বেশি রাত্রে—মানুষের গলার স্বর এতটুকু কানে গেলে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায় আমার। সুতরাং প্রাণভরে এই নির্জ্জনতা ও নৈঃশব্দের বাণী শুনলাম বসে বসে কত রাত পর্য্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা এখানে বসলে ভয় হয়—এই বুঝি কোন্ কলকাতার চেনজার বাবুরা পুত্রপরিবার সহ হাওয়া খেতে এসে পড়ে কলকোলাহল করতে করতে! এত রাত্রে মন একেবারে নিরুদ্বেগ সে দিক থেকে। বেশ জানি এ সময় জনপ্রাণী আসবে না এদিকে। মন শঙ্কাশূন্য ও নিরুদ্বেগ না হোলে কি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসুধা উপভোগ করা যায় ঠিকমত?

আমি ক'দিন ধরে ভাবচি এমনি সব নির্জ্জন স্থানের কথা। সেদিন পাঠক বাবু বলছিল, রাইপুর (C.P.) থেকে ১০৪ মাইল দূরে বাস্তার ষ্টেটের রাজধানী জগৎদলপুরের গল্প। ধামৃতারি ছাড়িয়ে (রাইপুর থেকে ৫০ মাইল দূর) ঘন বন পথের দুধারে—এমন এক বনের মধ্যে মানব বসতি থেকে বহুদূরে খুব বড় বড় গাছের ছায়ায় শিলাসনে বসে আছি, সকাল বেলাটি, অসংখ্য পক্ষীকুলের কলরব, অদূরে স্নিগ্ধ সলিলা গোদাবরী (ওখানে অবিশ্যি গোদাবরী নেই, আমার কল্পনা) কুলু কুলু রবে উপলবন্ধুর পথে বনপাদপের ছায়ায় ছায়ায় বয়ে চলেচে। নির্ভয়ে বিচরণশীল মৃগযূথ আমার শিলাসনের কাছে কাছে তৃণ আহরণ করচে—এমন একটি ছবি প্রায়ই মনে আসে।

কাল বিকেলে ফণি এল—ওর সঙ্গে অমর বাবু এসেচেন কিনা দেখতে গেলুম। পথে ব্রাউন সাহেবের সঙ্গে দেখা—ব্রাউন বল্লে, অমর বাবু আসেনি। তারপর রেলের বাঁধের ওপর দুজনে বসলুম, বেশ চাঁদ

উঠেচে। পরশু কল্যাণী, উমা ও বৌমাকে নিয়ে ফুলডুংরি বেড়াতে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিলাম।

আজ মিঃ সিন্‌হা চিঠি লিখেচেন তাঁর সঙ্গে সারেণ্ডা বেড়াতে যাবার জন্মে। ৮ই তারিখে এখান থেকে চাঁইবাসা যাবো—সেখান থেকে সারেণ্ডা রওনা হবো। সারেণ্ডা বিখ্যাত অরণ্য, প্রাকৃতিক দৃশুও অতি অপূর্ব্ব। সিংহভূমের বিখ্যাত বন। ওখানে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ কি ছাড়তে আছে?

ঘাটশিলা থেকে বন ভ্রমণের জন্ম বেরিয়ে রাত ১১টার গাড়ীতে চাঁইবাসা রওনা হই। সঙ্গে রইল ওভারসিয়ার নসিরাম। বেশ শীত রাত্রে। সিন্‌হা সারেণ্ডাবনের ভাব পেয়েছিলেন এ মাসে। গোটা বনটা ঘুরে আসবেন, আমায় নিমন্ত্রণ করেচেন। তাঁরই আহ্বানে আসা।

চাঁইবাসাতে সুবোধ বাবুর আপিসে বসে সকালে চা খেলুম ও অনেক গল্পগুজব হোল। কাল বেলা একটার সময় চাঁইবাসা থেকে রওনা হয়ে এলুম হাটগামারিয়ায় পরেশ সান্যালের ওখানে। তারপর বনপথে মোটর ছুটলো। টকটকে লাল মাটির পথ ও দুধারে ঘন জঙ্গল। আগে নোয়ামুণ্ডী, পরে এলুম গুয়া। দুই জায়গাতেই টাটা ও আর একটি কোম্পানীর লৌহ সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েচে—লোহার পাহাড় কেটে লৌহ প্রস্তর টন টন গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে চলেচে। গুয়াতে একটি বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ী চা পানান্তে আবার ঘনতর জঙ্গলের পথে এলুম কুম্‌ডি বাংলোতে। নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে পথ, কারো নদী পার হয়ে অদ্ভুত বনশোভা—ফুটন্ত পিটুনিয়া ও বন্য কাঞ্চনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে সন্ধ্যায় গাড়ী কুমডি পৌছে গেল। ডাকবাংলোর কাছেই বনের ভেতর দিয়ে কোইনা নদী কলকল শব্দে বয়ে চলেচে। আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী—কাল রাসপূর্ণিমা।

হে অরণ্য কথা কও

জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা পায়ে হেঁটে কোইনা নদী পার হয়ে বনের মধ্যে কতদূর বেড়াতে গেলুম। লোকালয় নেই কোথাও—গুয়া ছাড়িয়ে ষোল মাইল অবিচ্ছেদে অরণ্যপথ দিয়ে এসে বন বিভাগের এই বাংলা। বনের পথে বেড়াতে বেড়াতে দেখলুম সেই বিরাট অরণ্যের প্রাচীন বনস্পতি শ্রেণীর মধ্যে শুক্লা চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্নার রূপ। জ্যোৎস্নাস্নাত বিশাল অরণ্যানী যেন প্রাচীন ঋষির মত শান্ত, সমাহিত। এক একটা গাছ নাকি ১৫০।১৬০ বছরের। আমার প্রপিতামহের শৈশবেও এ সব গাছ এমনিই ছিল।

বড় ঠাণ্ডা। শিশির পড়চে। কারো নদীর ধারে অনেকক্ষণ বসে তারপর বাংলাতে ফিরে এলুম। বন্য হস্তীর ভয়ে বেশিক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে বসতে সাহস হোল না।

আজ বেলা ১২টার সময় মোটরে রওনা হয়ে মাইল চারেক গিয়ে এক বনের মধ্যে গাড়ী রেখে শশাংদা বুরু আরোহণ সুরু করলাম। শশাংদা বুরু সারাণ্ডা অরণ্যের সর্ব্বোচ্চ পাহাড়—উচ্চতা ৩০৩৮ ফুট। প্রায় কালিম্পং-এর উচ্চতা। মোটর ছেড়ে ৫।৬ জন লোক বনপথে পাহাড়ের গা কেটে বনবিভাগের তৈরি রাস্তা বেয়ে চলেচি। একদিকে শৈলগাত্রে নিবিড় অরণ্য, দুটি ঝর্ণা বনের মধ্যে কলধ্বনি করে নেমে চলেচে। বনের মধ্যে বন্য কদলীবৃক্ষ—ঠিক যেন চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মত। একটা স্থানে এসে পাহাড়ের ওপর উঠতে আরম্ভ করলুম। খাড়া উঠেচে, অতি দুরারোহ শৈলগাত্র, নিবিড় বনের মধ্যে সোজা উঠে চলেচে। একটা বন মোরগ আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে বনের মধ্যে পালালো। বড় বড় মোটা মোটা শাল, ধ, করম, আসান, লুদাস, পানজন, আন্দী, বন্য কাঞ্চন, টীহড় লতা আরও শ' দুশো রকমের

গাছ ও লতাপাতা। ৬০।৭০ বছরের পুরোণ চীহড় লতা (bohinia vallai) গাছের কাছে ঠেলে উঠেচে। এক এক জায়গায় পাহাড়ের ও বনের ফাঁকে দূরের ছোট বড় পাহাড় চোখে পড়ে। চাড্ডা গাঢ়া নামক পার্ব্বত্য ঝর্ণার কলকল জলপতন ধ্বনি বনে বনে, স্তরে স্তরে যেন নেমে চলেচে নীচের দিকে—উপত্যকার নিবিড় অরণ্যে এ গম্ভীর শব্দ একটি উদাত্ত সঙ্গীতের সৃষ্টি করেচে। বড় ক্লান্তি হচ্চে। এত দুরারোহ পাহাড়—শেষের দিকে যেন আরও বেশি। পা যদি সামান্য একটু পাথরেও আটকে যায়—তাও যেন তুলে ফেলতে কষ্ট হচ্চে। ঘন ঘন হাঁপাচ্চি—মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে এক রকম যন্ত্রণা হচ্চে। ধূমপান করবার জন্যে সেই খাড়া পথের এক জায়গায় বসলুম। সামনের দৃশ্য আরও স্পষ্ট করবার জন্যে সঙ্গের বনবিভাগের গার্ড কুড়ুল দিয়ে bohinia vallai-র একটা মোটা লতা কেটে দিলে। Forest Officer ও রেঞ্জ অফিসার শ্রীরাসবিহারী গুপ্তকে একটি গল্প শোনালুম। দুজনেই শুনে খুব খুসি। যেখানে চাড্ডা ঝর্ণা পড়চে—যেখানে নালা পার হবার সময়ে মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—Take courage in both hands, দাদা। আমি বললুম—একটা হাত আটকানো—লাঠি ধরে আছি যে! প্রকাণ্ড আম গাছ বনের মধ্যে এই স্থানে দেখলুম। আজ গোপালনগরের হাট, এতক্ষণ হাটে চলেচে লোকে।

ওপরে উঠে প্রায় দুমাইল দীর্ঘ তৃণক্ষেত্রের ওপর দিয়ে চলে গিয়ে একটা জলাশয়ের ধারে এলুম। সেখানে নরম কাদায় কত রকম পশুর পদচিহ্ন। হো ফরেষ্ট গার্ডকে আমরা ডেকে বললুম—কি কি জঙ্গলের জানোয়ারের পায়ের দাগ আছে দেখ। সে দেখে বল্লে—হুজুর হাতী, বাইসন, সম্বর, বুনো শূওর বেশি। আমি বললুম—বাঘের পায়ের দাগ?

—নেই হুজুর। বাঘ এখন এখানে জল খেতে আসবে না। একটা গাছের ছায়ায় গাছের ডাল পালা বিছিয়ে আমরা শুয়ে পড়লুম। চা পান করে বেলা ৪টার সময় রাসবিহারী বাবু বল্লেন—চলুন, বড্ড হাতীর ভয় বেলা পড়লে। তারপর এখানে কি ভাবে একটা বাঘের গর্জ্জন শুনেছিলেন, সে গল্প করলেন। হো কুলী বললে—বাবু রাৎ আনা—উনি বুঝতে পারেন না। শেষে দেখলেন কুলী পিছিয়ে পড়চে। তখন শুনলেন বাঘ ডাকচে বনের মধ্যে। আর একবার একটা হাতীর হাতে পড়েছিলেন, কুলী ছিল সঙ্গে। সে ওঁকে পাহাড়ের ওপর থেকে ঢালুর দিকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে গেল। আসবার সময় আরও অদ্ভুত দৃশ্য। হল্‌দে রোদ দুর পাহাড়ের মাথায়, আরণ্যবনস্পতি-শীর্ষে। নামচি, নামচি—সেই দুরারোহ পথে হড়কে পড়ে যাওয়ার ভয় প্রতি মুহূর্ত্তে। রোদ কমে এল। বনের ছায়া নিবিড়তর হচ্চে। এক জায়গায় barking deer ডাকচে, ঠিক কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ আওয়াজ করে। বনের আমলকী পাড়িয়ে নিয়ে খেতে খেতে এলুম। বনের মধ্যে কামিনী ফুলের গাছ দেখলুম এক স্থানে।

নীচে নেমে বনের মধ্যে দিয়ে প্রায় দেড় মাইল হেঁটে এসে আমাদের মোটরের কাছে এলুম। গুয়া রেল স্টেশন থেকে শশাংদাবুরু প্রায় ১৬॥ মাইল। এ অপূর্ব্ব বনশোভা যদি কেউ দেখতে যান তবে হেঁটে তাঁকে আসতে হবে এই ১৬॥ মাইল পথ। কোথাও কোনো লোকালয় নেই—শশাংদাবুরু মালভূমি বা তার আশপাশে কোথাও একখানা বন্যগ্রাম পর্য্যন্ত নেই! পথে যথেষ্ট বন্য হস্তীর ভয়। আমরা মোটরে আসচি কুম্‌ডিতে শশাংদাবুরু থেকে নেমে—হঠাৎ ফরেষ্ট গার্ড হো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—হাতী! হাতী!

আমরা সকলে চেয়ে দেখি উপত্যকার ওপারে শৈলসানুর বনে

একটা লাল রং-এর ধুলো মাখা হাতী বনের মধ্যে আমাদের দিকে পিছন ফিরে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কেবলই ভাবচি শশাংদাবুরুর ওপরে কেউ যদি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বেশ হয়।

আজ আবার রাসপূর্ণিমা। সন্ধ্যায় বাংলোর বারান্দাতে বসে চা খাচ্চি—পূর্ণচন্দ্র উঠলো বনের মাথায়। গোপালনগরের হাট করে বাড়ী ফিরচে পঞ্চা মাষ্টার ওর গরুর গাড়ীতে। বাংলোটি চমৎকার স্থানে। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা, ঘন বন। পাশেই দিনরাত শুনচি কোইনা নদীর কুলুকুলু শব্দ বনের মধ্যে। জ্যোৎস্নারাত্রে নদীর ধারে একটা শালগাছের শুকনো গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসলুম আমি ও মিঃ সিন্‌হা। জল চক্ চক্ করচে জ্যোৎস্নায়।

আজ ভগবানের বিরাটরূপ প্রত্যক্ষ করেচি শশাংদাবুরুর শৈলারণ্যে;—তিনিই সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েচেন। প্রাচীন বনস্পতিতে তাঁর গম্ভীর রূপ—আবার বন্য লুদাম, বন্য চিরেতার অতি সুন্দর পুষ্পে তাঁর কমনীয় রূপ। তিনি অব্যক্ত, অনন্ত।

আমার মনে হয় সারেণ্ডা ভ্রমণের মন ছিল আমার বহু দিনের। তাই তিনিই দয়া করে এই যোগাযোগ ঘটালেন। এ এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা জীবনের। সেই শৈলশীর্ষে রাঙা রোদ, ঘন বনে সেই চাড্ডা ঝর্ণার জলপতন ধ্বনি, সেই প্রাচীন বনস্পতি-শ্রেণী, দূরে দূরে অগণ্য শৈলমালার সমারোহ—সেই সুগন্ধি বন্য কুসুম রাজি—এ সব যদি আমি না দেখতুম, মনের মধ্যে এর ছবি যদি না এঁকে রাখতুম—তবে আমার জীবন ফাঁকা থেকে যেতো। হে বিশ্বশিল্পী, তোমাকে এই করুণার জন্য ধন্যবাদ।

কি চমৎকার কমলালেবু কুমডি বনবিভাগের বাংলো-সংলগ্ন বাগানে!

ফলভরে গাছ অবনত হওয়া বলে—সত্যিই তাই। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। সকালে খেয়ে দেয়ে আমরা বনপথে থলকোবাদ রওনা হলুম। সারাণ্ডা অঞ্চলের বনের মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই—৩৩০ বর্গ মাইল (ছয়লক্ষ একার) ব্যাপী ছেদহীন নিবিড় অরণ্য। কোইনা নদী পার হয়ে কিছুদূরে বড় বড় শাল গাছ দেখা গেল। পথে বনে সত্যিই চাঁপাফুলের গাছ দেখা গেল—ভেড্‌লেডিয়া নয়, সত্যিই চাঁপা। কোদলিবাদ নামক বন্য গ্রামে একটি বনান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র কুটিরে মিঃ সিন্‌হা ছিলেন ১৯১৬ সালে—যখন তিনি প্রথম বনবিভাগে ঢোকেন। আমরা সেই কুটিরে গেলুম—বন এসে পৌঁছেচে ঘরের উঠানে। চারিধারে বন ও পাহাড়। মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—অদূরে বনে barking deer ডাকতো—কত শুনেছি। বিকেল ৪টার সময় থলকোবাদ বাংলাতে এসে গাড়ী থেকে নামলুম। জঙ্গল ও পাহাড়ে ঘেরা একটি ক্ষুদ্র শৈলোপরি এই অতি সুন্দর বাংলোটি অবস্থিত। আমরা পাহাড়ের প্রান্তে বাংলোর কম্পাউণ্ডে বসে চা খাচ্চি, নিকটের শৈলারণ্যে কর্কশ স্বরে একটা পাখী ডেকে উঠলো। বিজয় আরদালী বল্লে—ময়ূর। সে এই সারাণ্ডা বিভাগে অনেকদিন আছে। তারপর একটা গম্ভীর শব্দ শোনা গেল—মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—সম্বর। আমি বাংলোর পিছনে একটা নির্জ্জন স্থানে গিয়ে খানিকটা বসলুম। পাথর বেরিয়ে আছে, শুকনো খটখটে জায়গা। অজস্র বনতুলসীর গাছ। সন্ধ্যার আগে আমরা থলকোবাদ গ্রাম ছাড়িয়ে বনের মধ্যে বেড়াতে গেলুম। আমি, রাসবিহারী গুপ্ত ও মিঃ সিন্‌হা। ঘন বন, অন্ধকারে ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকচে। ওঁরা প্রথমটা যেতে চাননি হাতীর ভয়ে। সারেণ্ডা অরণ্য বন্য হস্তীতে পরিপূর্ণ। একজন কর্ম্মচারী বলছিল বাংলোর কম্পাউণ্ডে রোজ রাত্রে হাতী আসে। যেখানে সাইনবোর্ডটা আছে সেখানে তিন দিন আগে হাতী এসে সাইনবোর্ডখানা

উপড়ে ফেলেছিল খুঁটিসুদ্ধ। আবার পোঁতা হয়েচে। বনের মধ্যে আমরা বসে আছি, সেই ঘন-অন্ধকারে ভরা বনভূমির কি রূপ! ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় এখানে, এই সময়ে। চাঁদ উঠলো একটু পরে দূর বনের মাথায়। রাসবিহারী বাবু বল্লেন—আজ দেখচি পূর্ণিমা। আমিও লক্ষ্য করলুম পূর্ণচন্দ্রই বটে। যদিও ভেবেছিলুম কালই পূর্ণচন্দ্র উঠেছিল। দুটি লোক বনের মধ্যে শুঁড়ি পথ বেয়ে অন্ধকারে আসছিল—আমাদের দেখে ভঁয়ে থমকে দাঁড়ালো। কাছে এলে বল্লুম—কোথায় গিয়েছিলি? তারা বল্লে—বাজারে।

—কোথায় বাজার।

—বালজুড়ি।

—কতদূর?

—পাঁচ ক্রোশ বাবু। বোনাইয়ের মধ্যে।

শুনলুম এই অরণ্যের দক্ষিণে কেউন্ঝর ও বোনাই স্টেট্—পশ্চিমে গাংপুর। উড়িষ্যার বনপর্ব্বত-সঙ্কুল দুটি রাজ্য। কি চমৎকার পূর্ণচন্দ্র উঠলো বনের ফাঁক দিয়ে। পেছন দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচি বনের গাছের গায়ে জ্যোৎস্না পড়ে অদ্ভুত শোভা হয়েচে। এ বারাকপুরের বাঁশবন নয়—শ্বাপদ-সঙ্কুল বন্যগজ-অধ্যুষিত ময়ূর-নিনাদিত আরণ্যভূমি—সারাণ্ডা। সিংহভূমের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, নিবিড়তম ও ঘনতম অরণ্য।

কয়েকটি গাড়োয়ান Bengal Timber Co.'র কাঠ বোঝাই করে থলকোবাদ গ্রামে সন্ধ্যাবেলায় গাছতলায় রেঁধে খাচ্চে। আমরা গিয়ে আলাপ করলুম। তাদের নাম বিরসা, নীলা, লব মাহাতো। বাড়ী জেরাইকেলা। দিন এক টাকা হিসাবে পায় গাড়ী-ভাড়া বাবদ। ঘন জঙ্গলের পথে প্রত্যেক মাসে তিনবার আসে ভাড়া বইতে। ছ' দিন করে থাকে।

আমরা বল্লুম—কি রাঁধচিস?

—ভাত আর দাল।

—আর কিছু?

—না বাবু।

বনের মধ্যে রওনা হবে শেষ রাত্রে উঠে। এই ভীষণ শীতে শালগাছের তলায় মুক্ত হাওয়ার শুয়ে রাত কাটাবে। বিছানা নেই—একখানা বন্য খেজুরের ছেঁড়া চেটাই ও আধ ছেঁড়া পাতলা মলিন কাঁথা সম্বল। শুনলুম পথে বাঘের উপদ্রব আছে। গত বৎসর চলন্ত গাড়ী থেকে বাঘে অনেক বলদ নিয়ে পালিয়েছিল। রাসবিহারী বাবু এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন, কিন্তু মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—সম্বলপুরের অরণ্যে সকাল আট-টার সময় গরুর গাড়ী থেকে বলদ নিয়ে গিয়েচে বাঘে—তিনি জানেন, স্বচক্ষে দেখেচেন।

ভাবলুম—এই দরিদ্র সরল লোকগুলিই ভারতবর্ষের প্রাণবস্তু। অথচ কি দুঃখপূর্ণ জীবন এদের! নিরাবরণ আকাশতলে হিমবর্ষী রাত্রে কাঁথা গায়ে দিয়ে শোবে, বাঘের মুখে রাত্রে গাড়ী চালাবে—মজুরি কত, না দৈনিক একটাকা!

অনেকরাত্রে বাংলোর বাইরে চেয়ার পেতে বসলুম। অদূরে গম্ভীর শৈলারণ্যের জ্যোৎস্না-স্নাত রূপ কি বর্ণনা করা যায়? ভগবানকে যদি ঠিকমত উপলব্ধি করতে চাও, তবে এইখানে এই পটভূমিতে সেই বিরাটের রূপ ধ্যান কর—লোকালয়ের কলকোলাহল থেকে বহুদূরে ময়ুর-নিনাদিত অরণ্যভূমির প্রান্তে। এই হিমবর্ষী আকাশতলে ঐ দরিদ্র গাড়োয়ানদের ছেঁড়া চেটাইতে শুয়ে রাত কাটাও। একটা প্রবন্ধ লিখ্‌ব, প্রবন্ধটার নাম দেবো—'বনান্তে সন্ধ্যা'। ভগবানের সৌন্দর্য্য যে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করচি—যেদিকে চাই, সেদিকেই বিরাটের আসন পাতা, সেই মহাশিল্পীর হাতের কাজ চারিদিকে ছড়িয়ে। জয় হোক তাঁর!

একজায়গায় পাতার কুঁড়ে বেঁধে জনকতক লোক রেঁধে খাচ্চে সন্ধ্যাবেলা। ওদের হো ভাষায় কি জিজ্ঞেস করলে রাসবিহারী বাবু। ওরা হো ভাষাতেই জবাব দিলে। শুনলাম ওদের বলে 'আরাকাশি', বোনাই ও গাংপুর ষ্টেট্ থেকে আসে আমের কাঠ চেরাই করতে। ওদের পাতার কুঁড়ের কাছে একটা বিরাট আট ফুট পরিধি-বিশিষ্ট শালগাছ, উচ্চতায়ও প্রায় ৫০।৬০ ফুট। বনস্পতি একেই বলে—বৃক্ষ-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা হয় দেখলে।

গভীর রাত্রি। আমরা বাংলোর বাইরে ত্রিশ গজ আন্দাজ গেলুম। রাসপূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র মাথার ওপর উঠেচে। একটা উঁচু টিলা—অথবা সেটা এই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়া—সেখানে ঘাস নেই, শুকনো খট্খটে জায়গা—মাঝখান দিয়ে পথ, দুধারে শাল ও আমলকী বন, আজ বৈকালে যেখানে গিয়ে বসেছিলুম সেখানটাতে গিয়ে দাঁড়াই। জ্যোৎস্নার বর্ণনা নেই—এ জ্যোৎস্নাস্নাত বনভূমি ও অদূরবর্ত্তী শৈলমালার বর্ণনা নেই। কে দিতে পারে এর বর্ণনা? গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একমাত্র শব্দ ঘন বনের কোথায় অবিশ্রান্ত জল-পতনধ্বনি। এ ধ্বনি বনের মধ্যে চাড্ডা ঝর্ণায় শুনেছি শশাংদাবুরু আরোহনের সময়, এ শব্দ শুনেছি কাল ও পরশু রাত্রে কোইনা নদীতে ঘন বনে—কুমৃডি বাংলোতে—আবার থলকোবাদ বাংলোতেও শুনচি। কোথায় একটা সম্বর হরিণ পূর্ব্বদিকের পাহাড়ে গম্ভীর আওয়াজ করলে। মাথার ওপরে দু-চারটা নক্ষত্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যাচ্চে।

টিলার দক্ষিণে যে শালবন, তার শিশিরসিক্ত পত্রপুঞ্জ জ্যোৎস্নায় চক্‌চক্ করচে! ডাইনে একটা গাছের গায়ে বন্যহস্তী তাড়ানোর উঁচু মাচা। এই গভীর রাত্রে আরণ্য-নিঃশব্দতার মধ্যে—দূরবর্ত্তী অপরিচিত পাহাড়ী ঝর্ণার জল-পতনধ্বনি ও দুএকটা নৈশপাখীর কূজন দ্বারা

বিখণ্ডিত যে গম্ভীর নৈঃশব্দ্য, এর মধ্যে কান পেতে থাকলে যেন কার বাণী শুনতে পাওয়া যায়। শুনলামও তাঁর বাণী, শুনে সারা হৃদয় মন জয়ধ্বনি করে উঠলো সেই বিরাট স্রষ্টা, সেই সৌন্দর্য্যশিল্পী, সেই রহস্যময় অনন্তের উদ্দেশে! মুখে কিছু বলা যায় না। পনেরো মিনিট বাইরে ছিলাম এই পৌর্ণমাসী রজনীর মায়াময় জ্যোৎস্নালোকে বাংলো থেকে কিছুদূরে বনের মধ্যে টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে বাংলোর সাদাবাড়ীটা বা কোনো লোকালয়ের চিহ্ন চোখে পড়ে না, শুধু মনে হয় একা আমি এই জনহীন গভীর বনভূমিতে এই গভীর রাত্রে আকাশ ও বনের দিকে চেয়ে আছি—এই পনেরো মিনিটে পনেরো বছরের জ্ঞান সঞ্চয় হোল। চোখ যেন খুলে গেল। তাঁর জয় হোক।

সকালে উঠেচি—মিঃ সিন্‌হা ডেকে বল্লেন—ময়ূর দেখুন! পাশের উপত্যকায় মাঠের মধ্যে ছ-সাতটি বড় বড় ময়ূর দেখে বড় খুশি হই। বেলা দশটার সময় মোটরে বার হয়ে আমরা 'কোদলিবাদ ১৫-এর' ঘন জঙ্গলে গেলুম। কায়াউলি নামক একটি ক্ষুদ্র নদী প্রথমে পেলুম। বড় বড় পাথর বাঁধানো জায়গা। পাথরের ওপর দিয়ে নদী বয়ে চলেচে। বনের পথে নামচি উঠচি—দুধারে শৈলশ্রেণী—আবার এক ঝর্ণা। তারপর কোইনা নদী ঘন বনের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। কোইনা নদীর পাষাণময় তীরের ঘন বনের ধারে বসে আমি ১৯৩১ সালের ব্লাকউড্‌স ম্যাগাজিনে 'Cast adrift in the woods' বলে একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়তে লাগলুম। মাঝে মাঝে মুখ চেয়ে দেখি ঝোপ ও লতা দিয়ে তৈরি নিবিড় বন যেন বাংলাদেশের বনের পদ্ধতি-বিশিষ্ট—যেন কুঠীর মাঠের বন—শুধু শাল আসান নয়। পথে তিন রকমের ফুল অজস্র ফুটে—দেবকাঞ্চন, বন্য পিটুনিয়া, ও এক ঈষৎ সুগন্ধ-বিশিষ্ট রকমের

হলদে ফুল বেশ দেখতে। কামিনী ফুলের গাছ জঙ্গলের মধ্যে যথেষ্ট। সকালে চমৎকার আলোছায়ার খেলা জঙ্গলে—নিবিড় ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যালোক এসে পড়েচে, বন্য-পক্ষীর কূজন, কোইনা নদীর মর্ম্মর কলতান, বামে নদীর ওপারে প্রায় দুশো গজ দূরে পাহাড় শ্রেণী কি সুন্দর লাগছিল। ভগবানকে মন থেকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়।° আরও কিছুদূরে গিয়ে কোইনা নদী আর একবার ঘুরে আমাদের পথে এসে পড়ল—এখানে একদিকের পাড় উঁচু ও প্রস্তরময়, নিবিড় বনাবৃত। এখানে অনেকক্ষণ বসলুম। কমলালেবু দিলেন মিঃ গুপ্ত। কি পাখীর গান! কি বনানীশোভা! ভূতধাত্রী ধরিত্রী অপূর্ব্বরূপে সজ্জিতা এই ঘনবন ও পর্ব্বতান্তরালে।

আজ সকালে উঠে ঘন বনের পথে মিঃ সিংহ, মিঃ গুপ্ত ও আমি রওনা হই বোনাই স্টেটের সীমানা দেখতে। পথে গভীর অরণ্যের মধ্যে কুইনা নদী (যার সঙ্গে আমার একবার পরিচয় হয়েচে কুম্‌ডি বাংলোর পাশে) কুলুকুলু তানে বয়ে চলেচে, হঠাৎ আমার নজর পড়লো প্রস্তরবহুল একটি চমৎকার জায়গা কুইনা নদীর মধ্যে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বনের মধ্যে যেখানেই এসব দেশে নদী বয়ে যায়, সেখানে গতিপথে নানা সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করেই অগ্রসর হয় নদী, পদে পদে রমণীয় শোভা বিতরণ করতে করতে চলে। পাথরের বড় বড় চাঁই, গাছপালা, তরুছায়া, বিহঙ্গ কাকলী, সুস্নিগ্ধ তরুচ্ছায়া, মর্ম্মর জল-কলতান —যাকে বলে বিউটি স্পট্ (beauty spot) তার আর বাকি রইল কি? কিন্তু এ জায়গার বিশেষত্ব এই, এখানে নদীর মধ্যে যে চড়াসৃষ্টি হয়েচে, যেখানে বালি, বড় জোর পাথরের নুড়ি কি দু-দশখানা পাথরের চাঁই থাকা উচিত ছিল, সেখানে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান মাকড়া পাথর

(Labrite) দিয়ে যেন বাঁধানো! কত হাজার বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোইনা নদী এমনি বয়ে চলে মাটি ক্ষইয়ে তুলে ফেলে তলাকার পাথর বার করে ফেলেচে, সে পাথরেরও নানাস্থানে মৌচাকের মত অসংখ্য গর্ত্ত সৃষ্টি করেচে। তার প্রায় ৫০।৬০ হাত চওড়া, ১৫০ হাত লম্বা এক সমতল পাষাণের চত্বর-মত নদীর খাতের মধ্যে, কে যেন পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেচে। ঘন বন এর উভয় পাশে, থলকোবাদ নিজেই বনের মধ্যে—সেখান থেকে ছ' মাইল এসেচি মোটরে ঘনতর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে—তারপর এই সুন্দর ছায়াভরা, পাষাণময়, জলকলতান মুখর, জনহীন স্থানটি। আরও কিছুদূরে একটি বন্যগ্রাম, নাম করমপদা, তার ওধারে নুয়াগাঁও ও বানগাঁও ব'লে আরও দুটি গ্রাম। গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা এরা নয়, বনবিভাগ থেকে এদের বিনাখাজনায় চাষের জমি দেওয়া হয়। ফসল করে তুলতে পারে না বন্যহস্তী ও সম্বর হরিণের উপদ্রবে। বনগাঁও গ্রামের দৃশ্যটি ছবির মত। গাড়ী থেকে নেমে আমরা একটা ছোট্ট টিলার ওপরে বসলুম শালগাছের ছায়ায়, আমাদের সামনে ক্ষুদ্র কোইনা নদী সরু নালার মত বয়ে চলেচে, কারণ এই নদীর উৎপত্তি স্থান অদূরবর্ত্তী বোনাই সীমান্তের শৈলমালা, এখান থেকে মাইল খানেক মাত্র দূর। নদীর ওপারে ঢেউ খেলানো জমি পাহাড়ের মত উঠে গিয়েচে, তার গায়ে হরিৎবর্ণ-ফুলে ভরা সরগুঁজা ক্ষেত, সবুজ কুরথীর ক্ষেত, দশটা খড় ও মাটির কুটির, গরু মহিষ চরচে মাঠে, মেয়েরা কাজ করচে ক্ষেতে, ওদের সকলের পেছনে কেউন্ঝর রাজ্যের ঘনবনাবৃত শৈলমালা। স্থানটি গভীর অরণ্যের মধ্যে এবং চারিদিকে দূরে দূরে পাহাড়। আরও এগিয়ে গেলুম বোনাই রাজ্য ও সারাণ্ডা বনের সীমান্তে। একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে পাঁচশ' ফুট জায়গা ফাঁকা, সব গাছ কেটে সীমা চিহ্নিত করা হয়েচে। তারপর আমরা নেমে গেলুম—ভাবলুম, বোনাই স্টেট্ একবার বেড়িয়ে

আসা যাক না? রাস্তা ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে গিয়েচে ঘনবনের মধ্যে দিয়ে—কোনোই পার্থক্য নেই সা'রণ্ডা অরণ্যের সঙ্গে। মোটা মোটা লতা বড় বড় প্রাচীন বনস্পতি-শ্রেণীকে পরস্পর সংযুক্ত করেচে, ফাঁক রাখেনি কোথাও, কালকার সেই হলুদ ফ ল পথের ধার আলো করে ফুটে আছে, নিস্তব্ধতা তেমনি গভীর, যেমন কিছু পূর্ব্বে সারেণ্ডাতে দেখেচি।

নেমে যেতে আমাদের সামনে পড়লো একটা সংকীর্ণ উপত্যকা, দুদিকে পাহাড়শ্রেণী দ্বারা ঘেরা। শুধুই বনস্পতির সমারোহ, শুধুই বনশীর্ষ, শুধুই সবুজের মেলা। একটা কুসুম গাছের তলায় আমরা বসলুম। বনের মধ্যে কর্কশস্বরে কি পাখী ডাকচে। ফরেষ্ট গার্ডকে বললুম—ময়ূর? সে বল্লে—নেহি হুজুর, ধনেশ পাখী। বড় বড় ঠোঁট-ওয়ালা ধনেশ পাখী দেখেচি বটে, কিন্তু দেখেচি কলকাতায় খাঁচায় বন্দী অবস্থায়। এমন ঘন বনে তার আদিম বাসস্থানে, উড়িষ্যার বোনাই স্টেটের অরণ্যে ওর ডাক শুনবো, এ ভাগ্য কখনো হয়নি। ভেবে দেখলুম যেখানে বসে আছি, নিকটতম রেলস্টেশন থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল—এও জীবনে কখনো ঘটেনি। কলকাতায় যেতে হোলে এখান থেকে কদিনের হাঁটাপথে গুয়া বা জেরাইকেলা গিয়ে ট্রেণে চড়তে হবে।

বসে আছি, আমাদের সামনের সরু-পায়ে-চলা পথ দিয়ে এক কৃষ্ণকায় তরুণ দেবতার মত যুবক, হাতে-বোনা খাটো মোটা কাপড় পরণে, এক হাতে তীর ধনু, অন্য হাতে একটা পুঁটুলিতে কি বাঁধা—মাথায় লম্বা লম্বা কালো চুলে কাঠের চিরুণী গোঁজা—ব্যস্ত ও চঞ্চলভাবে কোথায় চলেচে। আমরা ডাকলুম ওকে। সে বল্লে, গির্জ্জায় যাচ্চে, বড় ব্যস্ত। হো ভাষায় বল্লে—মিঃ গুপ্ত তার সঙ্গে কথা বল্লেন এবং সে কি বলচে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। নাম তার মসি, কি তার হাসি, কি তার

মুখের সুন্দর ভঙ্গি। তাকে না দেখলে এই গভীর আরণ্য-প্রদেশ যেন জীবন্ত হয়ে উঠতো না। প্রাচীন দিনের মৌন অরণ্য যেন মুখর হয়ে উঠলো ওর মুখের ভাষায়। ভাল লেগেচে সেই বন্য যুবকের আনন্দ চঞ্চল গতি, হাসিমাখা মুখ, সরল চোখের চাহনি। নিকটেই কুন্তী বলে একটা গ্রাম আছে বোনাই স্টেটের। পথে টেঁতী নায়েক বল্লে—গাছের লোককে বাঘে মেরেচে, পাঁচ বছর আগে সে নাকি দেখেচে। এক বৃদ্ধ লোককে আমরা মোটরে উঠিয়ে নিলাম, তার নাম শামো, তার ভাইয়ের নাম কামো। উড়িয়া ভাষায় কথা বল্লে।

তারপর রাত্রে ও-বেলার সেই কুইনা নদীর সুন্দর জায়গাটাতে এসেচি। ঘন বনের মধ্যে চাঁদ উঠেচে, আমরা মোটরে এসে পৌঁছুলাম। শামো (কামোর ভাই—সে নিজের পরিচয় দিতে গেলে সর্ব্বদাই ভাইয়ের উল্লেখ করে।) এবং কয়েকটি লোক এই বনের মধ্যে আগুণ করে বসে আছে। আমাদের জন্যে তাদের এখানে থাকতে বলা হয়েছিল।

জ্যোৎস্না-প্লাবিত বনভূমি। রাত্রি দেড়টা। বিশাল সারেণ্ডা অরণ্যের মধ্যে পার্ব্বত্য কুইনা নদীর কলতানের মধ্যে বসে আছি, কৃষ্ণাদ্বিতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর এসেচে। মহামৌন অরণ্যানী যেন এই জল কলতানের মধ্যে দিয়ে কথা বলচে! কি সে অদ্ভুত, রহস্যময় সৌন্দর্য্য—এর বর্ণনার কি ভাষা আছে? যে কখনো এমন হাজার বর্গ মাইল নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে বন্য-নদীর পাষাণ-তটে জ্যোৎস্নালোকিত গভীর নিশীথে না বসে থেকেচে, তাকে এ গম্ভীর সৌন্দর্য্য বোঝাবার উপায় নেই। এই বন্যহস্তী-ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত অরণ্যের মধ্যে এই কোইনা নদী হাজার হাজার বছর এমনি বয়ে চলেচে, হাজার হাজার বছর ধরে প্রতি পূর্ণিমায়, প্রতি শুক্লপক্ষে, চাঁদ এমনি উঠে বনভূমি পরিপ্লাবিত করেচে, এই কোইনা নদীর এই সুন্দর

স্থানটিতে আলো-ছায়ার জাল বুনেচে, এমনি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেচে—কিন্তু কেউ দেখতে আসেনি এ অদ্ভুত রূপ। নদীর মধ্যে ক্ষুদ্র যে একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েচে, সেই জলটি অনবরত পড়ে পড়ে এক ক্ষুদ্র সরোবরের মত হয়েচে—ওপারের বিরাট বনস্পতি শ্রেণীর ছায়া এখনও তার ওপর থেকে অপসারিত হয় নি—যদিও চাঁদ মাথার ওপরে, জলপ্রপাতের জলধারা চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করচে, শিকররাশি গভীর শীতের রাত্রের ঠাণ্ডায় জমে ধোঁয়ার মত উড়চে—ওর পাষাণময় তটে বসে মনে হোল, বনের মাথায় ওই দুচারটি নক্ষত্র দেখা যায়, ওই নক্ষত্রলোক থেকে অপরিচিত রূপসী দেববালাগণ অদৃশ্য চরণে নেমে আসেন এমনি জ্যোৎস্নাশুভ্র নিশীথে রাত্রে এই গভীর অরণ্যানী মধ্যস্থ সরোবরে জলকেলি করতে ইতর চক্ষুর অন্তরালে। মহাকাল এখানে অচঞ্চল, স্তব্ধ, মৌন বনস্পতিশ্রেণীর মত ধ্যান সমাহিত। এই আকাশ, এই নির্জ্জন জ্যোৎস্না, এই নিশীথ রাত্রি, এই গভীর অরণ্য যেন কি কথা বলচে—সে শব্দহীন বাণী ওই বন্য নদীর চঞ্চল কলগীতিতে মুখর হয়ে উঠচে প্রতি ক্ষণে—কিংবা গভীর অরণ্য নিঃশব্দতার সুরে সুর মিলিয়ে অন্তরাত্মার কানে তার সুগোপন বাণীটি পৌঁছে দিচ্চে। চুপ করে বসে জলের ধারে আকাশের দিকে চেয়ে, চাঁদের দিকে চেয়ে, বনস্পতি শ্রেণীর জ্যোৎস্নালোকিত শীর্ষদেশের দিকে চেয়ে সে বাণীর জন্য চোখ বুজে অপেক্ষা করো—শুনতে পাবে। সে বাণী নৈঃশব্দ্যের বটে, কিন্তু অমরতার বার্ত্তা বহন করে আনচে। এই অরণ্যই ভারতের আসল রূপ, সভ্যতার জন্ম হয়েচে এই আরণ্য-শান্তির মধ্যে, বেদ, আরণ্যক, উপনিষদ জন্ম নিয়েচে এখানে—এই সমাহিত স্তব্ধতায়—নগরীর কলকোলাহলের মধ্যে নয়। আজ এখানে এসে মনে হচ্চে, অশোকের সময়েও এই কোইনা নদী ঠিক এমনি বয়ে

চলতো এই গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে—এই অরণ্য আরও গভীরতর ছিল—তারও পূর্ব্বে আর্য্যদের ভারতবর্ষ প্রবেশের দিনেও এই নদী এখানে এমনি চঞ্চল কলোচ্ছ্বাসে নৃত্যশীলা বালিকার নূপুরবাজানো পা-দুটির মত নৃত্য ভঙ্গিতে ছুটে চলতো, উদাসীন প্রকৃতি এমনি সাজিয়েছিল এ বনভূমিকে কিন্তু কেউ কখনো দেখুক না দেখুক—প্রশ্নও করেনি। আজ আমরা এসেচি, করুণাময় বিশ্বশিল্পী যেন প্রসন্ননেত্রে হাস্যিমুখে নীরবতার মধ্যে দিয়ে ওই জলকলতানের মধ্যে দিয়ে বলচেন—কেউ দেখে না, কত যুগ-যুগান্তর থেকে এমনি সাজিয়ে দিই, প্রতি দিনে, প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি রজনীতে—আজ এলে তোমরা এতদিনে? বড় আনন্দ হচ্চে আমার। দেখ, ভাল করে দেখ।

জয় হোক তাঁর, জয় হোক সে মহাদেবতার!

তারপর শামোর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি। ওর ভাই কামো কেমন আছে? সত্তর বছরের বৃদ্ধ, এই করমপদা নামক বন্য গ্রামেই তার জন্ম, আর কোথাও যায়নি—যাবেও না। পঞ্চাশ বছর আগে একবার চাঁইবাসা গিয়েছিল—রেলগাড়ী জীবনে কখনো চড়েনি। তাকে আমরা মোটরে জাতি সিয়াং পর্য্যন্ত নিয়ে এলুম।

তারপর সেই নিবিড় অরণ্যের শিশিরসিক্ত গাছপালায় গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নালোক পড়েচে—সে কি চমৎকার রূপ। মোটরে ফিরবার সময় চেয়ে দেখি কত গাছ, কত পাথর, কত নিবিড় বনঝোপ—আমার ঠাকুরদা সেদিন ছেলেমানুষ ছিলেন—এসব বনে তখনও ঠিক এমনি জ্যোৎস্না পড়তো—হে প্রাচীন অরণ্যানী, এই অঞ্চলের যে ইতিহাস তুমি জানো, কেউ তা জানে না।

পরদিন সকালে চা পান করে মোটরে বেরুলাম আমি ও মিঃ সিন্‌হা। সুন্দর পাহাড় ও বনের পথে খুব উঁচু পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা।

একজায়গায় বনের মধ্যে O.T.T. কোম্পানী রেলওয়ে স্লিপার চেরাই করেচে। আজই সকালে একদল ময়ুর দেখেছিলুম থলকোবাদ বাংলা থেকে। লৌহপ্রস্তর ছড়িয়ে পড়ে আছে বনের মধ্যে, কোনো-কোনোটি বেশ ভারী, প্রায় ৫০ ভাগ লোহা আছে শতকরা। ওখান থেকে আর এক জায়গায় এসে শৈলচূড়ার ওপারের রাস্তা দিয়ে যাচ্চি—দূরে দূরে আরও পাহাড় দেখতে পেলাম। কিন্তু নেমে দূর পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে গিয়ে আর কিছুই দেখতে পাইনে, বড় বড় গাছে চোখের দৃষ্টি আটকেচে। কমলা লেবু খেলুম বসে। একটা পাইথনের খোলস পড়ে আছে পথে, মুড়ে দিলেন কাগজে মিঃ গুপ্ত। তারপর দূর দূর পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে, পাশের চওড়া বনাবৃত উপত্যকাভূমির দিকে চোখ রেখে নামচি—ওপর থেকে দেখতে পাচ্চি পথ নেমে নেমে চলেচে এঁকে বেঁকে পর্ব্বতের গা দিয়ে। হঠাৎ একটি সুন্দর স্থানে এলুম, বাংকিগাড়া বা ওরেপুরা বলে একটি নদী বয়ে চলেচে সংকীর্ণ উপত্যকা-পথে। ওপরের টিলার বড় বড় শাল গাছের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি কুটির। পথে একটা শালগাছ দেখেছিলুম একশ পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোনো, দশ ফুট বেড় গুঁড়ির। আমার ঠাকুরদাদা যখন জন্মাননি, প্রপিতামহ ঠাকুর যখন যুবক, তখন এই শাল ছিল ক্ষুদ্র চারা, কি শক্তি ছিল ওর মধ্যে যে এই ক্ষুদ্র ২ ইঞ্চি চারা এই বিশাল বনস্পতিতে পরিণত হয়েচে, এখনও নাকি বাড়চে। ব্রহ্মশক্তি রয়েচে বিশ্বের সব তাতে। এই সব না দেখলে শুধু 'যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু' আওড়ালে কি হবে? উপলব্ধি করা চাই। ব্রহ্মশক্তিকে উপলব্ধি করা চাই। বাবুডেরাতে চা পান করে আমরা রওনা হলুম—বেলা সাড়ে তিনটা। তারপরেই ঘনবনের পথ, নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানী যেন, ডিকেনড্রাম ফুল ফুটে আছে—ফুল নয় কচি পাতা, দেখতে ফুলের মত।

হে অরণ্য কথা কও

একদিকে ওয়েবুরা বয়ে চলেচে সংকীর্ণ উপত্যকা পথে-নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে। আসাম অঞ্চলের মত অরণ্য। ধনেশ পাখী ডাকচে বনে। একস্থানে মোটরের পথে আবার এই সুন্দরী পর্ব্বতদুহিতা আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। কুলুকুলু-তানে ওর সানুনয় অনুরোধ, আমাকে ভাল করে দেখ। চলে যেও না। এই স্থানটিতে একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত, নদীর মধ্যেই। সুনিবিড় বনস্পতি-শ্রেণীর ছায়ায় ছায়ায় নদী বয়ে চলেচে, এক পাড়ে দুটি তিনটি কুটির বনের মধ্যে। সাবাই ঘাস বিছানো। তার ওপর বসে ভগবানের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি মনে মনে উপভোগ করলুম। চমৎকার স্থান বটে। পেছনের বড় বড় গাছে অপরাহ্নের রাঙা রোদ। যেন মুনিঋষিদের আশ্রম, মনে হয় পুরাকালে কোনো উপনিষদের কবি ও দার্শনিক ঋষি এমন সুন্দর, নিভৃত, শান্ত বনঝর্ণার তীরের কুটিরে পার্ব্বত্য অরণ্যের ঘন ছায়ায় বন কুসুমের সুগন্ধ, চঞ্চল উচ্ছ্বাসময়ী বন্য নদীর নৃত্যছন্দের নুপুর-ধ্বনি ও বিহঙ্গের কলতানের মধ্যে বসে সমাহিত মনে উপনিষদ রচনা করেছিলেন, বিশ্বদেবের উপসনা আপনা আপনি সরল ও সহজ আনন্দের মধ্যে দিয়েই এখানে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তাঁর উদ্দেশে মনের কৃতজ্ঞতাই তাঁর পূজার অর্ঘ্য। এই স্থানটির নাম দিলুম বনশ্রী।

জেরাইকেলা থেকে আট মাইল এ স্থান, সোজা রাস্তা, চলেচে জেরাইকেলা স্টেশান।

আবার চলেচি, পথে জেরাইকেলা থেকে পাঁচ মাইলে পড়লো সাম্‌টা নালা। এমন চমৎকার নদীগুলির নাম এদেশে মোটেই সুন্দর নয়—বড় কর্কশ নাম দেয় হো ভাষায়। আমাদের বাংলা দেশের অনেক বাজে নদীরও নাম এদের চেয়ে কত ভাল। এই সাম্‌টা নালা পার হয়েই এক রাস্তার মোড়—এক রাস্তা গিয়েচে থলকোবাদ তিরিলথোসি হয়ে।

সামটা নালা বেয়ে কিছুদূর এসে গাছপালার প্রকৃতি যেন বাংলা দেশের মত। ঘন নিবিড় বনানী, বনকল' গাছ, ঝোপঝাপ লতাপাতা, ঠিক যেন বাংলা দেশ। আমার ভিটেতে বারাকপুরে যে গাছ আছে, যার চটি জুতোর মত ফল হয়, এখানে ছোটনাগপুর ইন্ডাস্ট্রিস থেকে যেখানে গাছ কেটেচে সেখানে অবিকল এমনি গাছপালা। শালগাছ নেই, বাংলার মত অরণ্য গাছ। দশ মাইল দূরে একটি অতি সুন্দর উচ্চ স্থান থেকে ঠিক যেন হিমালয়ের দৃশ্য—সামনে সংকীর্ণ উপত্যকায় সামটা সাপের মত দুটি কুণ্ডলী দিয়ে বেঁধে কুণ্ডলীর বেষ্টনীর মধ্যে সবুজ একটি দ্বীপ সৃষ্টি করেচে—সামনে স্তরে স্তরে পাহাড় উঠেচে, তার ওপর দিয়ে রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেচে—দূরে একটি কুটির দেখা যাচ্চে উপত্যকার ওপারে সবুজ বনানীর মধ্যে ডুবে আছে। শুনলুম নিকটেই কোথায় বনের মধ্যে একটি জলপ্রপাত ও একটি গুহা আছে। 'In the mountain fastnesses of Hazaribag' ভাগলপুরের সেই উকীল বাবুর কথা মনে পড়লো। সে পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখবার বাসনা ১৯২৬ সাল থেকেই আছে। তহশিলদারের ভাইয়ের মুখে সাতনামা পাহাড়ের বর্ণনা শুনে যা দেখবার বাসনা জেগেছিল। ভগবানের সৃষ্টি দেখে বেড়াবো, এই তো চাই। তারপর আমার মুক্তি হোক না হোক, আমি স্বর্গে যাই না যাই—এসব ভাবনা আমার নেই। আমি না থাকলেই বা কি? সেই অপূর্ব্ব শিল্পী যিনি এই দৃশ্য সৃষ্টি করেচেন—যুগে যুগে তিনি থাকুন, তাঁর সৃষ্টি চলুক এমনি সুন্দর ভাবে কল্প থেকে কল্পান্তরে, কত শত বিশ্বে, কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ডে, রূপে রূপে তিনি লোক লোকান্তর পূর্ণ করে মহাকালের পথহীন পথে অনন্তকাল একা চলুন, চঞ্চল বালকের মত সরল, চপল, আনন্দোজ্জ্বল নৃত্যচ্ছন্দে হেসে গেয়ে। তিনি দীর্ঘজীবি হোন, চিরজীবি হোন।

ফরেষ্টার বুড়ীউলি হো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—ওই হেন্দেকুলী B.T.T. কোম্পানীর কুলীর তাঁবু। আমরা চলে এলুম পাহাড়ের পথ ঘুরে ঘুরে শুধু বনফুলের শোভা দেখতে দেখতে হেন্দেকুলী তাঁবুতে। এখানে বনবিভাগের একটা ছোট্ট বাংলা আছে পথের পাশের উঁচু টিলাতে। নিচেকার জমিতে সামটা নালার ধারে অনেক কুলি মেয়েপুরুষ সন্ধ্যায় সারি সারি আগুন জেলে ভাত রাঁধচে। ওরা গাঙপুর ষ্টেট থেকে এসে 'আরাকাশি' অর্থাৎ কাঠ চেরাইয়ের কুলীর কাজ করচে। সেই বনের মধ্যে সন্ধ্যাব ঘন ছায়ায় জন কুড়ি-ত্রিশ মেয়েপুরুষকে ভাত রেঁধে খেতে দেখে এমন ভাল লাগলো। ওদের পাতা-ছাওয়া কুঁড়ে ঘরে বসে ওদের সঙ্গে গল্প করি আগুনের পাশে বসে। ওপরে টিলার বাংলা থেকে সামনের পাহাড়ের ও চারিপাশের বনের দৃশ্য অতি গম্ভীর। এই হেন্দেকুলি ক্যাম্প জেরাইকেলা ষ্টেশন থেকে দশ মাইল। বেড়াতে এসে এখানেও একদিন থাকা যায়। হেন্দেকুলি ছাড়িয়ে জঙ্গল আবার নিবিড়তর, সামটা নালার দিকে পথ ঘুরে ঘুরে নামতে লাগলো হেন্দেকুলী থেকে—ক্রমেই ঘন জঙ্গল, এখানে দুটি তিনটি রঙীন্ বন মোরগকে পথের এপাশ থেকে ওপারে জঙ্গলের মধ্যে উড়ে যেতে দেখলুম—তখন সন্ধ্যা হয়ে আসচে, অন্ধকারে অরণ্যপথ নিবিড় হয়ে গম্ভীর শোভা ধরচে। ফরেষ্টার বলচে, এ পথে বড় বাঘ আর হাতীর ভয়। গাড়োয়ানদের গরু প্রায়ই বাঘে মারে। হাতী তো এখন এই সন্ধ্যায় বার হয়। বাঘও এই সময় পাওয়া যায়। দুদিকের কালো অন্ধকারে ঢাকা বন যেন চেপে ধরচে ক্ষুদ্র মোটরখানা। ভয় করচে দস্তুর মত। আমরা অবিশ্যি থলকোবাদ পৌঁছাবার আগে একটা barking deer (কোৎরা) ছাড়া আর কিছুই দেখলুম না। চা খেয়ে বাংলোতে আগুনের ধারে বসে গল্প করলুম তারপর আমরা বাংলোর কাছেই

অন্ধকারে একটু বেড়িয়েও এলুম। কাল সারারাত্রি কেটেচে জাতি সিরাং-এ কোইনা নদীর পাষাণময় গর্ভে। আজ ঘুমুতে হবে সকাল সকাল। কোৎরা ডাকচে গভীর বনে। ভাঙা চাঁদ উঠেচে বনের মাথায়। রাত ভোর হোল ঘুমিয়ে।

পরদিন সকালে উঠলুম। খুব ভোর। অদূরবর্ত্তী শৈলচূড়ার বনানী শীর্ষে এখনও প্রাতঃসূর্য্যের আলো পড়েনি। যেখানে জল গরম করা হচ্চে, সেখানে আগুণ পোয়াতে গেলুম। Ada Cambridge-এর 'The Retrospect' বইখানা পড়লুম রোদে বসে। আজ এখুনি থলকোবাদ থেকে চলে যাবো তিরিলপোসি। কল্যাণীকে ও মন্মথদাকে পত্র দিয়েছি। কল্যাণীর জন্যে মন কেমন করচে।

ভাবলুম, ওকে আনলে হোত। এই দৃশ্য দেখে কি খুশিই হোত!

বারাকপুরের লোক এখন কি করচে? আমাদের মোটর বারান্দার সামনে এনে জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। দুপুরবেলা। ১২॥টা হবে, সামনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল পার্ব্বত্য অরণ্যের পটভূমিতে শুভ্রকাণ্ড সিমুল গাছটার দিকে চেয়ে কত কথাই মনে হয়। বারাকপুর, সেই ইছামতী তীরের বনঝোপ থেকে এ সময় বন মরচে ফুলের সুগন্ধ উঠচে—কত দিন দেখিনি। বিরাট সারাণ্ডা অরণ্যানীর মধ্যে বসে প্রকৃতির মনোহর রূপ, অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য, এই বনানী, এই শৈলমালা দেখতে দেখতে বহুদূরের সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামটির সেয়াকুল-ঝোপের কথা কেন বার বার মনে পড়চে। কেন পড়ে, কে বলবে?

থলকোবাদ বাংলো থেকে বের হয়ে বাংলোর সামনে পয়োপ্রণালী দেখতে ঢুকলুম জঙ্গলের মধ্যে। এমন জঙ্গল যে ভয় হোল এই দুপুরেই বুঝি বাঘে ধরে। মোটর ছেড়ে গিয়েছিলুম, আবার চলে এলুম গাড়ীতে।

ছোট্ট যে পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্চে থলকোবাদের সামনে, জেলার গেজে-টিয়ারে তার উল্লেখ আছে। সারেণ্ডার ও সাধারণতঃ সিংভূমের সব পার্ব্বত্য নদী ও ঝর্ণা সম্বন্ধেই কর্ণেল ডাল্টনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :—"In the reserved forests the wooded glens and valleys, traversed by river and hill streams, have a peculiar charm. Here will be found pools, shaded and rock-bound in which Diana and her nymphs might have deported themselves."

থলকোবাদ বাংলোর নিকটে যে ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি কুলুকুলু শব্দে বনের নীরবতা ভগ্ন করে আপন মনে নেচে চলেচে, তার সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। যদিও ওয়েবুরা ও সামটা নালা সম্বন্ধে এবং কোইনা নদী সম্বন্ধে একথা বেশি খাটে।

কর্ণেল ডাল্টনের উক্তি আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে বসে পড়ি বোধ হয় ১৯৩৪ সালে। তখন থেকেই সারেণ্ডা ফরেষ্ট দেখবার ইচ্ছে ছিল। কে জানতো তা এভাবে পূর্ণ হবে একদিন, ন বছর পরে সারেণ্ডা অরণ্যের মধ্যে তিরিলপোসি বন্য গ্রামের বনবিভাগের বাংলোতে বসে একথা লিখবো।

আরও কিছুদূর এসে একজায়গায় বনের মধ্যে ঢুকে আমরা শিশিরদা বলে একটা জলাভূমি দেখতে গেলুম। সুনিবিড় বনানী, ঢুকতে যাচ্চি এমন সময় ভীষণ চীৎকারে বনভূমি কাঁপিয়ে কি জানোয়ার ডেকে উঠলো। সঙ্গের ফরেষ্টার বল্লে—কোৎরা অর্থাৎ barking deer—কিন্তু সামান্য হরিণে যে এত শব্দ করতে পারে প্রথমে এ বিশ্বাস হচ্ছিল না। বনের চেহারা দেখে ভয় হয়ে গেল। ডানদিকে পাহাড়ের সানুদেশে নিবিড় অরণ্য, বাঁয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা জলাভূমি, শুধু দাম দলে পূর্ণ, জল দেখা যায় না—অজস্র কাশফুল ফুটেচে—এই পাহাড়ী

পাথরের দেশে এমন জলাভূমি আর কোথাও দেখিনি—সারা সিংভূমে আছে কিনা সন্দেহ। সারাণ্ডাতে তো নেইই।

আমরা পাঁচ ছ'জন যাচ্চি—মি. সিংহ, তিরিলপোসির ফরেষ্টার একজন হো, দুজন গার্ড। কিন্তু ওরাই বলচে বুনো হাতীর বড় ভয় এখানে, যেতে যেতে জলার ধারে হাতীর পায়ের চিহ্ন দেখলাম অনেক জায়গায়। একটা প্রকাণ্ড আমগাছকে কি একটা শক্ত লতায় এমনি জড়িয়ে ধরেচে যে দেখে কেমন যেন বিস্ময় বোধ হোল। কখনো দেখিনি এমন, আমগাছের পাতা দেখা যায় না নীচের দিকে, যা কিছু পাতা সবই সেই লতাটার। তারপর একটা নরম মাটি-ওয়ালা জমি পড়লো। সেখানকার বড় গাছগুলো কাটা হয়েচে বনবিভাগ থেকে—ফলে এক-প্রকার কাঁটাওয়ালা ফলের গাছ হয়েচে আমাদের দেশের ওকূড়া ফলের মত। পা রাখবার স্থান নেই এতটুকু।

ফরেষ্টার বল্লে—এই জায়গায় একটা 'খো' আছে পাহাড়ের গায়ে।

—'খো' কি?

—কেভ্।

আমরা তো তখনি কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। দেখতেই হবে গুহা। মিঃ সিংহ একবার বল্লেন—চলুন, বেলা যাচ্ছে, জায়গাটা ভাল নয়। ফরেষ্ট গার্ড কিছুক্ষণ আগে হাতীর গল্প বলছিল। একজন ফরেষ্টারকে কি ভাবে বেলা চারটার সময় তিরিলপোসি থেকে আসবার সময় হাতীতে তাড়া করেছিল, কি ভাবে সে সাইকেল ফেলে পালালো। এই বনের মধ্যে এ গল্প সাহসপ্রদ নয় একথা বলাই বাহুল্য। তবে বুনো-হাতীর ও বাঘের গল্প সারেণ্ডার সর্ব্বত্র এ ক'দিন শুনে শুনে খানিকটা অভ্যস্তও হয়ে গিয়েছি।

বল্লুম—চলুন, দেখেই আসা যাক একবার।

সেই কাঁটাওয়ালা ফলগুলো কাঁটার মত কাপড়ের ও জামায় বিশ্রী ভাবে বিঁধে যেতে লাগলো। এক জায়গার সামান্য একটু ফাঁকা জায়গায় নরম মাটিতে কি দেখে ফরেষ্টার হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। বল্লে—বাঘের পায়ের দাগ। বড় বাঘ।

—ঠিক তো?

—একেবারে ভুল নেই—

ফরেষ্ট গার্ডও বল্লে—বড় বাঘের পায়ের দাগ। আর দেখুন হুজুর, এগুলো বাইসনের—

তা বলে তো ফেরা যায় না। বল্লুম।

এক জায়গায় বন্য অশ্বগন্ধার পাতা তুলে দেখালে ফরেষ্টার। আর একটা পরিস্কার স্থান দেখিয়ে বল্লে—সম্বর এখানে রোদ পোয়ায়। সম্বরের পায়ের দাগ দেখুন কত—

সত্যি, অনেক জানোয়ারের পায়ের দাগ বটে। সম্বর কিনা জানি না, গরু বা মহিষের পায়ের দাগের মত—তবে তার চেয়ে কিছু ছোট। বাইসনের পায়ের দাগ ঠিক মহিষের মত।

ফাঁকা জায়গা পার হতে পনেরো মিনিট সময় লাগলো। স্থানটি অতীব wild—তিনদিকে বনাবৃত পাহাড়ে গোল করে ঘিরেচে, জলভূমির দিকে সংকীর্ণ ফাঁক। লোহা-চোঁয়ানো রাঙা জলের একটা ঝর্ণা ফাঁকা মাঠ দিয়ে জলাভূমির দামদলের মধ্যে প্রবেশ করলো। রাস্তা থেকে অনেক-দূর, প্রায় এক মাইলের বেশি। লোকালয়ের তো চিহ্নই নেই এসব অঞ্চলে। তার ওপর কাঁটাওয়ালা ফলের নীচু আগাছার জঙ্গলের মধ্যে বাইসন, হাতী ও বাঘের পায়ের দাগ। বেলা পড়ে এসেচে। জানোয়ারে তাড়া করলে পালাবার পথ নেই।

কিন্তু গুহা না দেখে ফিরচি না। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম মাঠ

পেরিয়ে – সামনে যে পাহাড় তারই নীচে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড গুহা, মুখের দিকে প্রায় মাটি থেকে ন' ফুট উঁচু, লম্বায় পঁচাত্তর ফুট। গুহার মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ওপর দিক থেকে ক্ষুদ্র একটি লোহা-চোঁয়ানি রাঙা জলের ঝর্ণা বেরুচ্চে। ভেতরের দিকে উচ্চতা ক্রমশঃ কমে কমে এক-ফুট দেড়-ফুট দাঁড়িয়েচে, যেখান থেকে রাঙা ঝর্ণা বেরুচ্চে সেখানে।

কি গম্ভীর দৃশ্য!

ঘন ছায়া বনে, ঘন অন্ধকার গুহার ভেতরের দিকে। গুহা ওখানে শেষ হোল না, ভেতরের দিকে আরও আছে, দেখাই যায় না। গুহার সামনে ঠিক গুহার ছাদ ছুঁয়ে মোটা মোটা প্রাচীন ধওড়া ও আমগাছ। আমগাছ ও ধওড়া গাছে কাছির মত লতা উঠেচে জড়িয়ে জড়িয়ে—গুহার মধ্যে বসে শুধু দেখা যাচ্চে সামনের নিবিড় সুপ্রাচীন জঙ্গল। অন্ধকার নামচে বনস্পতির ভিড়ে। রামায়ণে আরণ্যকাণ্ডের বনবর্ণনায় কবি বাল্মীকি প্রাচীন ভারতবর্ষের বনের যে চিত্র দিয়েচেন, সেই বর্ব্বর আরণ্য-প্রকৃতি এই গুহার সামনে, আশে পাশে, সর্ব্বত্র বহু মাইল নিয়ে। দেখলে ভয় হয়, কৌতূহল হয়, বিস্ময় হয়—আবার কি জানি কেন শ্রদ্ধাও হয়।

হঠাৎ ফরেষ্টার বল্লে—পাশে আর একটা গুহা আছে—

—কতদূরে?

—এই পাশেই হুজুর।

দুর্গম লৌহপ্রস্তরের boulder ও জলা, নরম মাটি ঘন জঙ্গলে। জমি উপরের দিকে উঠচে। পাশের পাহাড়ের ছাদটা ক্রমনিম্ন হয়ে এসে এই গুহা তৈরি করেচে বেশ বোঝা যাচ্চে। কিন্তু ক্ষইয়ে গুহা তৈরি হোল কি ভাবে? ঐ লোহা-চোয়ানো ঝর্ণা কি এর হাতিয়ার?

পাশেই সে গুহা দেখলুম। ঢুকলাম তার মধ্যে। এটা আরও বড়, বাঁদিকে উঁচু ঢিবি-মত, লোহা-চোঁয়ানি জল রাঙা পলি ফেলে আন্দাজ লক্ষ বৎসরে এই মাটির স্তূপ তৈরি করেচে। ফরেষ্টার দেখালে—আবার একটা বাঘের দাগ দেখুন হুজুর—

সত্যি, ঠিক গুহার মুখে লোহা-চোঁয়ানো রাঙা মাটিতে।

—আরও দেখুন, শাহী আর হরিণের পায়ের দাগ—বহুৎ।

—শাহী কি?

মিঃ সিংহ বল্লেন—পর্কুপাইন—

ভাবলুম বাঘ আর অন্যান্য বন্য-জন্তুর আড্ডা তো হবেই এমন গুহাতে। এরও সামনে তেমনি ঘন জঙ্গল, খুব মোটা একটা জংলি আমগাছ। নিবিড়, দুর্ভেদ্য জঙ্গল চারিপাশে।

কত কথা মনে আসে।

প্রাগৈতিহাসিক মানব কি এ গুহায় বাস করতো? মেজের মাটি খুঁড়লে বোধহয় তাদের চিহ্ন পাওয়া যায়। কত লক্ষ বছরের মৌন ইতিহাস এই গুহার মেজেতে আঁকা আছে—ওই সব বন্য জন্তু-জানোয়ারের মত। কতকাল আগে, পৃথিবীর কোন্ আদিম শৈশবে এ গুহা তৈরী হয়েচে আপনা আপনি—কোন্ আদিম মানব বংশ প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম অরণ্যানীর মধ্যে এখানে বাস করতো, কত লক্ষ লক্ষ বৎসর দূরে মন চলে যায় মহাকালের বীথি-পথ বেয়ে। বিস্ময়ে মন স্তব্ধ হয়ে যায়।

বেশি ভাবতে পারা যায় না। ঐ বনানী-শীর্ষে রাঙা রোদ যেমন আজ, তেমনি কত লক্ষ কোটি, লক্ষ কোটি সূর্য্যাস্ত, সূর্য্যোদয়, লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি পূর্ণিমা অমাবস্যা দেখেচে এই সুপ্রাচীন পার্ব্বত্য-গুহা—যার তুলনায় বেদ-গাথা রচয়িতা ঋষিরা, উপনিষদের কবিদার্শ-

নিকেরা, বেদব্যাস, বাল্মীকি, বুদ্ধ, কপিলাবাস্তু, অশোক, কলিঙ্গযুদ্ধ—কালকার কথা।

আচ্ছা, কেউ থাকতে পারে এখানে রাত্রে একা? উপনিষদের ঋষিরা কি এমনি নিবিড় বনের গুহায় একা থাকতেন? এখনও কি সাধু সন্ন্যাসীরা ঠিক এমনি নির্জ্জন অরণ্যে এমনি গুহায় একা থাকেন?

এসবের উত্তর কে দেবে? মাথা ঘুরে ওঠে যেন ভাবলে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা মনে জাগে। মানুষের গতায়াত নেই এ গুহায়, তাই এত অদ্ভুত লাগচে, ভয় হচ্চে। এস্থান যদি লোকালয়ের মধ্যে হোত, রেল স্টেশন থেকে এক মাইল হোত, সাধু সন্নিসিরা ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতেন, দেওঘরের তপোবনের গুহার মত—তবে কি এমন অদ্ভুত লাগতো? মোটেই না।

ফরেষ্টার বল্লে—চলিয়ে হুজুর। বহুৎ জানোয়ার রহ্‌তা হ্যায় হিঁয়া—চলিয়ে হিঁয়াসে—

মিঃ সিংহ বল্লেন—বেলা প্রায় চারটা, চলুন, এখানে আর থাকা ঠিক হবে না—

আবার সেই কাঁটাওয়ালা ফলের জঙ্গলের মাঠ ও নিবিড় বন পার হয়ে তিরিলপোসি—থলকোবাদ রোডে গাড়ীর কাছে এলুম। আসবার সময় আবার হাতীর গল্প উঠলো—কে যেন বল্লে—এখানে হাতী তাড়া করলে পালাবার পথ নেই—সত্যিই বটে। একদিকে জলা, অন্যদিকে পাহাড়ী ঢাল, বনে ভরা। পেছনে সেই কাঁটাওয়ালা বীচির জঙ্গল। কি একটা বোটকা গন্ধ পেলুম এক জায়গায়।

ফরেষ্টার বল্লে—সেও পেয়েচে বটে। যাবার সময় এত ভয় হয়নি, আসবার সময় বোধ হয় বাঘ আর হাতীর পায়ের দাগ দেখবার দরুণই মনের মধ্যে এই ছায়ানিবিড় অপরাহ্ণে বিশেষ সাহস খুঁজে পাচ্ছিলাম

না। বেলা সাড়ে পাঁচটায় তিরিলপোসি বাংলায় পৌঁছে গেলুম।

আজ সকালে চা খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে অনেকদূরে গেলুম পায়ে হেঁটে। সিংলুম নালা বলে একটি অতি চমৎকার ঝর্ণা বা পাহাড়ী নদী থেকে খানা কেটে জল আনা হচ্চে তিরিলপোসি গ্রামের শস্য-ক্ষেত্রে। সেটা দেখতে গেলুম আমরা। সিংভূম বা সারাণ্ডাতে যেখানে বনের মধ্যে পাহাড়ী ঝর্ণা সেখানেই সৌন্দর্য্য—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুন্দর পাথর বিছানো ঠাণ্ডা জায়গায় জলে পা ডুবিয়ে নিবিড় বনছায়ায় বসে ঝর্ণার মর্ম্মর-ধ্বনি শুনতে লাগলুম একা একা। চোখে পড়চে শুধু গভীর নিঃস্তব্ধ অরণ্য, যেদিকে চাই। বেলা বারটায় ফিরে এলুম। বিকেলে বোনাই স্টেটের বালজুড়ির দিকে যে রাস্তা গিয়েচে পর্ব্বত ও অরণ্য ভেদ করে সেদিকে চললুম। সামনে ঘোর জঙ্গলের দিকে রাস্তা নেমে গিয়েচে দেখে মিঃ সিংহ বল্লেন—সন্দে হয়েচে, আর এখন জঙ্গলে যাওয়া ঠিক হবে না। এই তো জানোয়ারদের বেরুবার সময়। যদি হাতী তাড়া করে ওপরের দিকে উঠে পালাতে গেলেই হাতীতে ধরবে, বড় বিপজ্জনক। মাকড়সার জাল বনে সর্ব্বত্র।

সুতরাং ফিরলুম। একটা বড় পাথর বিছানো স্থানে গাছের তলায় বসলুম। সন্ধ্যা হয়ে আসচে, সামনের জমি ঢালু হয়ে গিয়ে সিংলুম নালার খাতের দিকে চলেচে। তার ওধারে ঘোর বনে সমাচ্ছন্ন শৈলমালা, অন্ধকার দেখাচ্ছে। একটা গাছের ডাল মাথার অনেক ওপরে নত হয়ে আছে। মন এ সব স্থানে সম্পূর্ণ অন্যদিকে যায়। কত ধরনের চিন্তা মনে আসে। জীবনের রহস্যের গভীরতার দিকে আপনা আপনি ছুটে চলে।

হে অরণ্য কথা কও

কল্যাণীর কথা আজ সারাদিন মাঝে মাঝে মনে হচ্চে। হয়তো আমার চিঠি ও পাবে কাল।

ঠিক সন্ধ্যায় হয়তো বনগাঁ লিচুতলা ক্লাবে যতীন দা, মন্মথ দা, সুবোধ দা সব বসে গল্প করচে, আজ বিশ বছর রোজ যে ভাবে গল্প করে, তার ব্যতিক্রম নেই।

•

খুব ভোরে উঠেছিলুম, বেশ জ্যোৎস্নায় নীরব সামনে পর্ব্বত ও অরণ্য। শুকতারা জ্বল জ্বল করচে পূবদিকের আকাশে। থলকোবাদ থেকে কাঠ বোঝাই গরুর গাড়ীর দল শেষ রাত্রি আড়াইটায় উঠে চলেচে জেরাইকেলা। এখন পাঁচটা হবে। সকালে বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে বসি, বড় বড় শালগাছ, ওদিকে বনাবৃত পর্ব্বত, চারিদিকেই পাহাড় ও বন, মাঝে ফাঁকা ক্রমনিম্ন একটু মাঠমত—সেখানে মোটা মোটা শালগাছ ও শালচারা। ঘন বনে ঘেরা পর্ব্বতের পটভূমিতে শৈলচূড়ার একটি বড় গাছ ছোট্ট দেখাচ্ছে। বিশ্বদেবের উপাসনা এখানেই সার্থক ও সম্পূর্ণ।

চা পানান্তে অপূর্ব্ব বনপথে গাংপুর স্টেট্ ও সারাণ্ডার সীমানায় অবস্থিত টিকালিমারা নামক গ্রামে চললুম। এ পথ তৈরী হয়ে পর্য্যন্ত বোধ হয় কখনো মোটর আসেনি, গরুর গাড়ীও চলে না, সবুজ ঘাসবনে ঢেকে রাস্তা কোন্‌টা বন কোন্‌টা চিনবার যো নেই। মনে হচ্চে যেন মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চলেচে। দুধারে নিবিড় বন, অনেক ভাল দৃশ্য থলকোবাদ থেকে জেরাইকেলা রাস্তার চেয়ে। গরুর গাড়ীর চাকার দাগ নেই পথে, জন নেই, প্রাণী নেই, সকালের আলো এসে পড়েচে সুদীর্ঘ ও প্রাচীন শাল, আমলকী, পাঠডুমুর, ধওড়া গাছের শীর্ষভাগে—কোথাও মোটা মোটা লতায় জড়াজড়ি করে বেঁধেচে ডালে

ডালে, শুঁড়িতে শুঁড়িতে, দেবকাঞ্চন ফুল ফুটেচে সর্ব্বত্র, শিউলি গাছের তো জঙ্গল, এত শিউলি গাছ এদিকের বনে যে এমন অন্য কোথাও দেখিনি, কোথাও ফলে ভরা আমলকীর ডাল পথিপার্শ্বের বিশাল গাছ থেকে রাস্তার ওপর নত হয়ে আছে ছবির মত, কোথাও পাহাড়ী ঝর্ণা বড় বড় শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে ছায়ানিবিড় সুঁড়ি-পথে কুলুকুলু বয়ে চলেচে, কোথাও বা একটা বন-মোরগ মোটরের শব্দে রাস্তার ওপর থেকে ওপাশের বনে উড়ে পালালো, কোথাও রাস্তা ক্রমেই নামচে, নামচে, সামনে উচ্চ বনাবৃত শৈলমালা—আমরা ঠিক্ যেন চলেচি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা মারবার জন্যে ব'লে মনে হচ্চে, কোথাও রাস্তা ও মোটর একেবারে ডুবে যাচ্চে গভীর বনের মধ্যে সমতল উপত্যকায়, সেখানে চারিদিকে বন ও পাহাড়ের সবুজ দেওয়াল, কিছু দেখা যায় না—আবার কোথাও পাহাড়ের গায়ে উঠে চলেচি, কোথাও সুদীর্ঘ বনস্পতি-শ্রেণী ছায়াভরা বনবীথির সৃষ্টি করেচে, গাছে গাছে চীহড়ের লতা দুলচে।

অবশেষে আমরা বিটকেলসোয়া গ্রামে পৌঁছে গেলুম। চারিদিকে উঁচু পাহাড়, ছোট ছোট ছেলে-পিলে মোটরের শব্দ শুনে ছুটে এল। প্রেমানন্দ নামে একজন মুণ্ডা খ্রীষ্টান আমাদের সব দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো। একটা কাঠের ও খোলার ঘরে গ্রাম্য গীর্জ্জা। শুনলাম এ গ্রামের বেশির ভাগ অধিবাসী মুণ্ডা খ্রীষ্টান! মনোহরপুর থেকে জন নামে এক 'প্রীষ্ট' (এখানে পাদ্রিকে এই বলে) এসে রবিবারে এদের উপাসনা করায়। প্রেমানন্দ এক সময়ে প্রচারকের কাজ করবার জন্যে এই গ্রামে এসে এখানেই রয়ে গিয়েচে। বেশ বড় খোলার বাড়ী করেচে, লাউ কুমড়া লতা উঠিয়েচে। একটি গৃহস্থের নাম ফিলিপ টোপনো। ঘন্‌শ্যা মুচির মত চেহারা। এত খ্রীষ্টান এখানে

কেন? একথার উত্তরে ফরেষ্টার খুন্টিয়া বল্লে—পালকোটের রাজা এক সময়ে হো-দের ওপর বড্ড অত্যাচার করে। তখন এরা খ্রীষ্টান হয় মিশনারীদের প্ররোচনায়।

বাঘের বড় অত্যাচার এই সব বন্য গ্রামে। তিনমাস আগে একজনকে বাঘে ধরেছিল। ওরা গরু চরাচ্ছিল বনের ধারে, বাঘে এসে ওকে ধরে। সঙ্গের লোকেরা টাঙি দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দেয়। বেলা বারোটার সময় ওকে বাঘে ধরে। লোকটার নাম সামুয়েল মান্‌কি। আমাদের বারাকপুরের গ্রামের বাসানে পাড়ার যে কোনো মুসলমান ছোকরার মত চেহারাটা। গাছের ছায়ায় বসে লোকটাকে ডেকে আমরা তাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস্ করলুম—কত বড় বাঘ রে?

—খুব বড় বাঘ হুজুর।

—তোর কোনো হুঁস ছিল!

—না আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

একটা বাড়ীতে মস্ত বড় একটা শুক্‌নো পাতার টোকা ঝুলচে। দেখতে চাইলাম, নিয়ে এসে দিলে। বোহিনিয়া ভ্যলাইয়ের বড় বড় পাতা দিয়ে করে।

এক স্ত্রীলোক পাতার কুঁড়ে ঘরে বসে কাঁদচে। তার স্বামী মারা গিয়েচে শুনলুম। তার কান্না দেখে বড় কষ্ট হোল। মানুষের দুঃখের প্রকাশ যেমন বাংলাদেশে, এখানেও এই সুদূর বন্য গ্রামেও তেমনি। কোনো তফাৎ নেই।

দক্ষিণ পশ্চিম দিকের পাহাড়ের ওপারে গাংপুর স্টেট্। দক্ষিণ-পূর্ব্বে বোনাই স্টেট্। যে রাস্তায় আমরা এলুম এই রাস্তা চলেচে বোনাই স্টেটের বালজুড়ি গ্রামে, এখান থেকে পাঁচ মাইল। নিভৃত বনের মধ্যে বালজুড়ির পথে এক জায়গায় খ্রীষ্টান মুণ্ডা কুলীরা কাজ করচে। তাদের হাজিরা

নেওয়া হোল ঘন বনের ছায়ায় বসে। এই পথে আজ মাস দুই আগে প্রকাণ্ড নরখাদক রয়েল বেঙ্গল ব্যাঘ্র একটি মানুষ মেরেচে।

কুলীদের নাম :—

নান্দী কুই

সুনি কুই

রাইমতী কুই

চাম্পু কুই

রাহিল কুই

ক্রিষ্টিনা কুই

যশোমনি কুই

বোবাস মুণ্ডা

ইলিসাবা কুই

বাইবেলের বহু চরিত্রই এই ঘন জঙ্গলে মাটি কাটচে, সবাই মেয়েছেলে। 'কুই' এদেশে হো ভাষায় কুমারী মেয়ের নামের শেষে বলে।

বর্ষাকালে দু'মাস গ্রামের লোক জংলী ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকে। এখানে বলে "কান্দা"। নানারকম মিষ্ট কন্দও নাকি আছে। তাছাড়া জংলি আম, বেল ও কাঠডুমুরের পাকা ফলও বনে মেলে। কাঠডুমুর (Ficus cunia) বাংলাদেশে নেই—এই অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র কোথাও দেখিনি। প্রেমানন্দ গ্রামের মুণ্ডারি বা সর্দার। বল্লে—এখানে চালের বড় কষ্ট, বোনাই ষ্টেটে ⁄৩ সের চা'ল টাকায়, কিন্তু এখানে আনতে দেয় না হুজুর। পথের মধ্যে বোনাই আর সারাণ্ডার সীমানায় সিপাই বসিয়ে রেখেচে।

চলে এলুম। একটা ঝর্ণা গ্রামের মধ্যে দিয়ে বইচে—এর নাম বিটকেল সোয়া নালা। আসলে এই গ্রামের নামই এর নাম। স্বচ্ছন্দ-

গতি নৃত্যপরায়ণা বন্য নদীর নাম আর কি ক'রে হবে! এই একমাত্র লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে আবার নাচতে নাচতে ঢুকে পড়লো বোনাই ষ্টেটের আরণ্য ভূমিতে। তাই এই নাম।

বেলা বারটা। আমরা ফিরলুম, চমৎকার শান্ত গ্রামখানি। এই ঘন বনের মধ্যে এর জন্ম ও মরণ। বিস্‌রার বাজার থেকে চিনি, আটা, তেল আনে। বিস্‌রা ষোল মাইল দূর এখান থেকে। মহুয়ার তেল খায়, ও নাকি ঘি'র মত, স্যামুয়েল মান্‌কি বল্লে। খ্রীষ্টান হয়েচে বটে কিন্তু অসুখ হোলে বনে গিয়ে লুকিয়ে বোংগা পূজো করে।

ফিরে এলুম বনের পথ দিয়ে। স্নান করে খেয়েই তখুনি আবার মোটরে বার হই টোয়েবু নামে একটি নিবিড় বনে অবস্থিত জলপ্রপাত দেখতে। তিরিলপোসি বাংলা থেকে থলকোবাদের পথে চার মাইল গিয়ে গাড়ী রেখে হেঁটে চল্লুম বনের মধ্যে। সঙ্গে ফরেষ্টার খুন্টিয়া, দুজন ফরেষ্ট গার্ড, মিঃ সিংহ। বনে অত্যন্ত আগাছা, বিশেষতঃ সেদিনকার সেই ওকড়া জাতীয় ফল। ক্রমশঃ নিবিড় থেকে নিবিড়তর বনে ঢুকে গেলুম। এমন বনের চেহারা এই সারাণ্ডাতেও আর দেখিনি। কিন্তু অদ্ভুত সৌন্দর্য্য সে ঘোর বনের। বিশাল বনস্পতি শীর্ষে কম্‌প্রিটাম ডিকেন্‌ড্রামের সাদা পাতা গজিয়ে ঠিক ফুলের মত দেখাচ্চে, এ লতা যে অত উঁচুতে উঠ্‌তে পারে তা জানতাম না। একস্থানে সুঁড়ি পথের দুধারে নদী কাঁঠান নামক এদেশী গাছের জঙ্গল, বড় বড় আমগাছ, শালগাছ, মোটা মোটা লতা ডালে পালায় জড়িয়ে দুর্ভেদ্য ও দুষ্প্রবেশ্য করে রেখেচে বনভূমি। ভয় হয় এ বনে ঢুকতে, বিশেষত যে রকম হাতী আর বাঘের ভয় বনে। এক এক স্থানে সুঁড়ি পথটুকু ছাড়া ডাইনে বাঁয়ে কিছুই দেখা যায় না। চলেচি, পথ আর ফুরোয় না। ওকড়া জাতীয় শুক্‌নো ফল সারা গা এমন কি মাথায় চুলে পর্য্যন্ত আটকে যাচ্চে।

কোথাও নিবিড় সেগুন বন, কোথাও জলাভূমি, কোথাও কাঁটাবন, পথ নেই বল্লেই হয়। এক স্থানে নরম মাটিতে মস্ত বড় বাঘের পায়ের থাবা আঁকা। হাতীর নাদ আর পায়ের দাগ তো সর্ব্বত্র। বাইসনের গায়ের দাগও আছে। এক জায়গায় ফরেস্ট গার্ড দুটি দাঁড়িয়ে বনের দিকে চেয়ে আপনাদের মধ্যে কি বলতে লাগলো। কি ব্যাপার? বাঘ দেখেচে নাকি, না হাতী? মিঃ সিংহ ধমক দিয়ে বল্লেন—আরে ক্যা হায় বোলো না? ওরা বল্লে—বানর, হুজুর।

ক্রমে একটা প্রস্তরময় স্থানে এলুম। একটি পাহাড়ী ঝর্ণা পাথরের ওপর দিয়ে চলেচে। আমি ভাবলুম, এই বুঝি সে জায়গা। কিন্তু ফরেস্ট গার্ড থামে না। চলেচে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, শুধু তার পৃষ্ঠদেশ দেখতে পাচ্চি। এই সরু বনপথ নাকি বোনাই স্টেট্ থেকে আসবার শর্ট কাট্—তাই ওদিকের বালাজোড় প্রভৃতি স্থান থেকে এ পথে পথিক লোক আসে। কিন্তু কেমন সে পথিক যে এই বন্যগজ- ও ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত নিবিড় ও দুর্ভেদ্য বনপথ দিয়ে শর্ট কাট্ করে সোজা সড়ক ছেড়ে, কত বড় তার বুকের পাটা তা বুঝতে পারলুম না। আবার কিছুদূর গিয়ে আর একটি প্রস্তরময় স্থান ও পাহাড়ী নদী। এখানে ক্ষুদ্র একটি cascade এর সৃষ্টি করে ঝর্ণাটি চলেচে বয়ে। বেশ জায়গাটি, ভাবলুম পৌঁছে গিয়েছি বুঝি—এই সেই টোয়েবু ঝর্ণা। দু-চারটি বন্যঘাসে ছাওয়া কুটির এখানে রয়েচে বনস্পতিদের ছায়ায়, বনবিভাগের কুলীরা গত বর্ষাকালে লতা কাটতে এসে এখানে ছিল। তারাই তৈরি করে রেখেচে—এখন কে আর থাকবে এখানে? শুনেছিলুম মাত্র দুমাইল, অথচ তিন মাইল এসে গিয়েচি আন্দাজে মনে হচ্চে, একঘণ্টা ধরে অনবরত হাঁটচি, অথচ টোয়েবু জলপ্রপাতের শব্দও তো শুনচিনে কোথাও। আবার পাহাড়ের মত উঁচুপথে পাথর ডিঙিয়ে চড়াইয়ের পথে উঠি,

আবার উৎরাইয়ের পথে নামি—একস্থানে ফণি-মনসার গাছ অনেক, কালো পাথরের রুক্ষ জমিতে যথেষ্ট জন্মেচে। এবার বাঁদিকে জলের শব্দ পেলুম—আমাদের হাত-পাঁচেক নীচে অনেকখানি স্থানে পাথর বেরিয়ে আছে, তার ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়চে। এ ছাড়িয়েও ফরেস্ট গার্ড চলে যাচ্চে।

আমরা বলি—আর কতদূর ?

—এই হুজুর, তবে নামতে হবে নীচে।

আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ওপরের পথটা ছেড়ে মালভূমির নীচের দিকে নামতে লাগলুম উপত্যকার সমতলে। কাঁটায় ও কণ্টকময় বনফলে এই চার মাইল আসতে পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে রি রি করে জ্বলচে। কিন্তু নেমে গিয়ে হঠাৎ যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যভরা দৃশ্য ক্লান্ত চক্ষুর সামনে খুলে গেল, তার বর্ণনা দেওয়া বড় কঠিন। সেই ছায়ানিবিড় অপরাহ্নে, সেই বাঘের পায়ের থাবা-আঁকা ঘোর জঙ্গলের পথে না হেঁটে এলে, সেই জনমানবের চিহ্নহীন বনানীর গোপন অন্তরালে লুকানো গম্ভীরদর্শন জলপ্রপাতের কথা কি করে বোঝাবো ?

অনেক বড় বড় চৌরস পাথরের বড় বড় boulder ঝর্ণার মুখে পড়ে আছে, তারই একটার ওপরে গিয়ে বসলুম। বেলা তিনটা বাজে, এখুনি সেখানে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে। আমার সামনে একটা জলাশয়, ঘন কালো ঈষৎ সবুজাভ তার জল। এই জলাশয় নাকি অত্যন্ত গভীর, জলের চেহারা দেখলে তা বোঝা যায় বটে—'টোরেবু' মানে 'মোচড়ানো ঘাড়'। এক হো জাতীয় লোক এখানে মাছ ধরতে এসেছিল স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। মাছ ধরে ধরে সে স্ত্রীকে ডাঙার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল, স্ত্রী লুপে লুপে নিচ্চে—একবার হঠাৎ বিস্মিতা স্ত্রীর হাতে এল তার স্বামীর সদ্য মোচড়ানো ঘাড়টা। সেই থেকে বন্য অপদেবতার

ভয়ে এখানে কেউ মাছ ধরতে আসে না। অথচ মাছ নাকি খুব আছে।

আমাদের সামনে জলাশয়ের ওপারে প্রায় ১০।৮০ ফুট লৌহ-প্রস্তরের (Hematite quartzite) অনাবৃত দেয়াল খাড়া উঠেচে, তার শীর্ষে অপরাহ্ণের হল্‌দে রোদ, তার গায়ে গাছের মোটা মোটা শেকড় ঝুলচে। বড় বড় ঝুলন্ত পাথরের চাঁই জায়গায় জায়গায় যেন মোটা শেকড়ের বাঁধনে আটকে আছে ফাটলের গায়ে। এই পাহাড়ের দেয়ালের বাঁদিকে প্রায় ৭।৮ ফুট চওড়া জলধারা ছুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে সশব্দে প্রায় ২৫ ফুট ওপর থেকে নীচের বন্য অপদেবতার লীলাভূমি সেই সরোবরটাতে পড়চে। এই স্থানটি নিবিড় বনে ঘেরা, একটা সংকীর্ণ গহ্বরের বা বড় ইঁদারার মত—যেন ইঁদারার মধ্যে বসে মাথার দিকে চেয়ে আছি। বড় বড় আম, গাচাকেন্দু বা গাবগাছ, বেত, ফার্ণ, লম্বা লম্বা তৃণ, লুদাম, করঞ্জ আরও অসংখ্য বন্য গাছে ছায়ানিবিড়। জলপতনধ্বনি দ্বারা বিখণ্ডিত সেই গম্ভীর আরণ্য-নিঃশব্দতা সুদূর অতীতের কথা, অন্তরের কথা, বিশ্বদেবের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কথাই কানে কানে বলে, সমাহিত মনে শুনতে হয়। এই রকম জলাশয় সম্বন্ধেই কর্ণেল ডালটনের সেই উক্তিটি খাটে ":—Pools, shaded and rock-bound in which Diana and her nymphs might have deported themselves."

অনন্তের মৌন ইতিহাস এখানে আঁকা আছে পাথরের দেওয়ালের স্তরে স্তরে। বৈদিক আর্য্য ঋষিদের আমলেও এই ঝর্ণা ঠিক এমনি পড়তো ঘোর বনের মধ্যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে এখানে লক্ষ লক্ষ পূর্ণিমার চাঁদ উঠেচে, লক্ষ লক্ষ অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার হয়েচে, বন্যজন্তুর বংশের পর বংশ নির্ভয়ে জলপান করেচে—রেল হবার আগে,

বন বিভাগের সৃষ্টি হওয়ার আগে বন্য লোক ছাড়া অন্য কারো চোখেই পড়েনি এ সৌন্দর্য্য ভূমি। কে আসবে মরতে পথহীন জঙ্গলে, জানেই বা কে, খোঁজই বা করত কে ? এই বিংশ শতাব্দীতেও এ স্থান নিকটবর্ত্তী রেলস্টেশন থেকে বনপথে একুশ মাইল। তার মধ্যে তেরো মাইল নিবিড় বনানী, শেষের চার মাইল নিবিড়তর বন, যার মধ্যে দিয়ে কোন সময়েই দলবদ্ধ না হয়ে বা উপযুক্ত পথপ্রদর্শক না নিয়ে কখনই আসা উচিত নয়। পথ হারিয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা, একবার পথ হারিয়ে গেলে জন মানবের চিহ্নহীন এই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে বন্যহস্তীর পদতলে, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখে প্রাণ হারাতে হবে। অথচ কি সৌন্দর্য্য-ভূমিই লুকিয়ে রেখেচে প্রকৃতি দেবী মানবচক্ষুর অন্তরালে। হলদে রোদ রাঙা হয়ে আসচে, আর থাকা ঠিক নয়। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। নিবিড় পথে চার মাইল গিয়ে মোটরে উঠতে হবে। এই পড়ন্ত বেলাতে হাতী বাঘ বেরিয়ে থাকে সাধারণতঃ। রওনা হয়ে ঝর্ণার ওপারের দিকটাতে চওড়া পাথরের ওপর অনেকটা বসলুম। কতদূর লৌহপ্রস্তরের তৈরী ঢালু পর্ব্বতগাত্র বেয়ে ঝর্ণাটা নীচে নেমে ওই জলপ্রপাতের ও ঝর্ণার সৃষ্টি করচে। এ আর একটি অপূর্ব্ব স্থান কিন্তু আর বসা চলে না। আবার সেই দুর্গম পথে রওনা হলাম। পথে সেই ঘাসের কুটিরগুলির স্থানে এসে মনে হোল বড় চমৎকার, এখানেই থেকে যাই। সেগুনের জঙ্গলের মধ্যে নরম মাটিতে আমি একটা নরম পায়ের দাগ দেখিয়ে বল্লাম—দেখুন আর একটা।

মিঃ সিংহ বল্লেন—বহুৎ বড় পায়ের দাগ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার—

তখন সন্ধ্যার আর দেরি নেই। বনানী অন্ধকার হয়ে এসেচে—হঠাৎ মনে পড়লো আজ আমাদের দেশে গোপালনগরের হাট,

পঞ্চামাষ্টার বেগুন বিক্রি করচে, মনো খুড়ো পানের দোকানে পান বিক্রি করচে। ওরা সেই ক্ষুদ্র স্থানে জন্মে চিরকাল ওখানেই আনন্দে আছে, জগতের কি-ই বা দেখলে ?

একজায়গায় বড় বড় আমগাছ, কি ফুলের সুগন্ধ বাতাসে, ঠাণ্ডা সন্ধ্যাবাতাসে বনানী থেকে বারাকপুরের পল্লী প্রান্তে এ সময় যেমন সুগন্ধ ওঠে তেমনি পাচ্চি। রাধালতার ফুল এখানেও দেখলাম ঝোপের মাথায়। ঝন্দী কাঁটালের কালো পাতার রাশি অন্ধকার আরও কৃষ্ণতর করে তুলেচে। ওই ফুটন্ত বনস্পতি-শীর্ষে কম্‌প্রিটাম ডিকেনড্রাম লতার ফুল শোভা পাচ্ছে। ঘন গম্ভীর দৃশ্য বনানীর। সন্ধ্যায় সারাণ্ডা ফরেষ্টের নিভৃত বনপথ দিয়ে যাওয়ার এ অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না।

ফরেষ্টার এক জায়গায় এসে বল্লে—ঠিক এখানে মল্লিক বাবু ফরেষ্ট রেন্‌জার মস্ত বড় রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখেছিল—রাস্তা পার হয়ে বনের দিক থেকে ওদিকেই যাচ্ছিল, মল্লিক বাবু বলে—চাকরী ছেড়ে দেবো, সারাণ্ডার আর চাকরী করবো না।

প্রতিপদে ভয় হচ্ছে। একবার ফরেষ্ট গার্ড বনের দিক চেয়ে থমকে দাঁড়ালো। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠলো—কি রে! দাঁড়ালি কেন ? সে বল্লে—জংলি মোরগ হুজুর।

ধড়ে প্রাণ এল যেন—চলো বাপু। বন মোরগ দেখে আর এখন কাজ নেই। এই সুনিবিড় অরণ্যে হাতী ও বাঘ হায়েনা চলাফেরা করচে, মানুষ মারচে—তার গল্প থলকোবাদে শুনেচি, কুমড়িতে শুনেচি, বনগাঁয়ে শুনেচি আবার আজ বিটকেলসোরাতেও শুনেচি। নিজের চোখে দু তিন দিন বড় বাঘের থাবার দাগ দেখলুম মাটিতে—এবং তা হয়তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের। আজই দেখেচি একজায়গায় হাতী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েচে তার দাগ। হাতীর বাইসনের ও

সম্বরের পায়ের দাগ তো সর্ব্বত্র—ওর হিসেব কে রাখে। সুতরাং বন পেরিয়ে যাওয়াই ভালো।

ফরেষ্টার বলচে—কা'ছই এসেচি মোটরের। দু'রশি আছে। তখন একবার বনের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে নিলুম। কি গম্ভীর দৃশ্য অরণ্যানীর, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কত উঁচুতে রাধালতা আর কম্‌প্রিটাম লতার কচি পাতা। ঘন বনে অন্ধকার হয়ে এসেচে। লোকালয় থেকে বহুদূরে সারেণ্ডা ফরেষ্টের অভ্যন্তর ভাগে দাঁড়িয়ে গোপালনগর হাটের কথা ভাবচি।

বাড়ী এসে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে এই ডায়েরী লিখচি। খেয়ে দেয়ে একবার বাইরে গেলুম, কি ঝক্ ঝক্ করচে নক্ষত্রগুলি পাহাড়ের মাথায়, অনন্ত ব্যোমে মহারুদ্রের জ্যোতিত্রিশূলের মত Orion জ্বলচে—এখানে ওখানে কত তারা, বিরাট ছায়াপথ জ্বল জ্বল করচে—বিশ্বদেবের ভাণ্ডারে কত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটি beauty spot—তাঁর অনন্ত দৃষ্টি কি করে আমরা বুঝব—শুধু মনে মনে তাঁর জয়গান করেই বিস্ময়ের অবসান করি।

রাত সাড়ে চারটায় উঠলুম, বাইরে গেলুম। জ্যোৎস্না উঠেচে, কালকের মত শুকতারা জ্বলজ্বল করচে, দূরের পাহাড়ের মাথার দিকে চেয়ে বাল্যের বারাকপুরের বাঁশবনে বাড়ী, বাবা মার কথা মনে এল। শৈশবের সমস্ত অবস্থা—আমাদের দারিদ্র্য, বালক হয়ে আমার সমস্ত মনের ভাব যেন আমাকে পেয়ে বসলো শেষ রাত্রে। জীবন কি অপূর্ব্ব! কি অমৃতময়—জন্মে জন্মে শত শত বারাকপুরের মধ্যে দিয়ে শত বৈচিত্র্য, পিতামাতার কোলে বার বার আসি যাই ক্ষতি কি? শুধু যেন বিশ্বদেবকে মনে রাখি, তাঁর অনন্ত রূপের অনন্ত বৈচিত্র্য দেখবার চোখ যেন পাই।

সকালে শালবনে বেড়াতে গেলুম। দূরে পাহাড়ের মাথায় কাল

যেমন দেখেছিলুম একটা গাছ—বড় বড় বনস্পতি চারিধারে, বনের শান্ত শ্যামল সমারোহ। প্রাণ ভরে দেখি। চেয়ে থাকি।

শেষ রাত্রে কালীর বোন পুঁটিদিদিকে স্বপ্ন দেখলুম, আশ্চর্য্য! পুঁটি দিদি যেন মার মত স্নেহে আমায় কি খেতে দিলেন। অল্প বয়সের পুঁটি দিদি।

আজ সকাল ন'টায় তিরিলপোসি থেকে স্নানাহার করে বার হয়েচি। সারাণ্ডা অরণ্যে ফাঁক কোথাও নেই—শুধুই চলেচে জঙ্গল। একজায়গায় নেমে আমরা পাৎলা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম, সেখানে কাঠ কয়লার ভাঁটা করে কয়লা পুড়ুচ্চে। তারপর কিছুদূর এসে একজায়গায় দীঘা নামক বন্যগ্রাম। তার প্রান্তভাগে 'বিরহোর' নামক যাযাবর বন্য জাতির আবাস, নেমে দেখতে গেলুম। অনেক ছেলেমেয়ে ও পুরুষ রোদে বসে চীহড় লতার দড়ি পাকাচ্চে। এই ওদের উপজীবিকা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেচে দড়ি, শিকা—সব তৈরি করে চীহড়ের বাকল থেকে। খুব শক্ত দড়ি হয়। এক গ্রামে সপ্তাহ দুই থাকে, তারপর অন্য গ্রামে চলে যায়। কোথাও নির্দ্দিষ্ট জায়গা নেই থাকবার। একটি রূপী বাঁদর নিয়ে এল বিক্রি করতে। আমরা নিলাম না। বেশ সুন্দর পাথরে কোঁদা চেহারা ওদের।

দীঘা ছেড়ে সামটা গ্রামের পথে আমরা চললুম। আবার জঙ্গল, পাশে একটা ঝর্ণা ও গভীর খাদ। এক এক সময় মনে হয় সরু পথে গাড়ীগুলি উল্‌টে যাবে। তেমনি গভীর অরণ্য। এপথে অনেক বন্য বাঁশ দেখলুম পহাড়ী ঢালুর জঙ্গলে, এক জায়গায় বন্যকদলীও দেখা গেল।

সামটা গ্রাম বনের বাইরে। খ্রীষ্টান ও হিন্দুর বাস, তবে হো-দের

বাসই বেশী। একটি ছেলে নাম বল্লে, চন্দন তাঁতি। একটু সভ্য কাপড় পরা ওরই মধ্যে। বল্লাম—তুমি খ্রীষ্টান ?

—না, আমি হিন্দু।

—কালি দুর্গা পূজা কর, না বোঙ্গা পূজা কর—

—বোঙ্গা পূজো করি।

একটা গাছের নীচে এরা মুরগী বলি দেয় ও আতপ চাউল নৈবেদ্য হিসেবে দেয়। সিং বোঙ্গা এদের পরম দেবতা—সূর্য্যদেব। আরও বিভিন্ন বোঙ্গা আছে—এক এক রোগের এক এক বোঙ্গা।

সামটা থেকে এলুম জেরাইকেলা। এখানে এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হোল Range আপিসে। বাড়ী খুলনায়, এখন এখানেই দু-তিন বৎসর জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করে বাস করচে। রেঞ্জ্ আপিসে দেখা করতে এল—শুনলাম এখানে বেশ ম্যালেরিয়া।

জেরাইকেলা থেকে রওনা হয়ে তিন মাইল যেতে গভীর অরণ্য সুরু হোল। একদিকে গভীর অরণ্যভরা নদীখাত, অন্যদিকে পাহাড়ের দেওয়াল। পোঙ্গা পর্য্যন্ত সমানই অরণ্য। Export নাকা নামক বনবিভাগের কর্ম্মচারীর আবাসস্থানের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, একজন লোককে ডুলি করে নিয়ে যাচ্চে, জঙ্গলে B. T. T. কোম্পানীর কাজ করছিল, ম্যালেরিয়া ধরেচে।

আবার জঙ্গল। পোঙ্গা এলুম বেলা আড়াইটাতে। আগে এখানে B T. T. কোম্পানীর আপিস ছিল, এখন কিছু নেই। পোঙ্গা থেকে মনোহরপুরের পথে রওনা হই—মিঃ সিংহ ১৯২৫ সালে নভেম্বর মাসে বনবিভাগের শিক্ষানবীশি করতে এই পথে একা সাইকেলে আসেন, অতি দুরারোহ ও জঙ্গলাকীর্ণ পথ—এর আগে বনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না তাঁর। কি ভাবে একা এখানে এলেন, আজ তাঁর মুখে

শোনা পর্য্যন্ত এই পথ দেখবার বড় ইচ্ছা ছিল—এবার সে পথও দেখলুম এবং কোল বোংগা নামক গ্রামে যে কুটিরে তিনি রাত্রি কাটিয়েছিলেন, সেটাও দেখলুম। কুলিরা সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছে আর তাঁর জিনিষ নিয়ে যেতে চাইল না। এখন সে কুটীরের অনেক পরিবর্তন হয়েচে, পূর্ব্বে আঠারো বছর আগে বন এখানে ঘনতর ছিল। কোলবোং-গার প্রান্তে এক পাহাড়ের ওপর একটি ছোট্ট কুটীরে এক গোঁসাই জাতীয় কৃষক বাস করে। বৃদ্ধ গোঁসাই ধান ঝাড়চে পাহাড়ের ওপরে খামারে। সেখান থেকে সুন্দর দৃশ্য চারিদিকে এবং খুব কাছে উঁচু পর্ব্বতমালা ও শিখরদেশ। সভ্যতার চিহ্ন কিছু কিছু দেখা গেল এর পরে, ঘিনড়ুং নামক স্থানে—এক্সপোর্ট নাকার আপিসের সামনে কয়েকটি বালক স্কুল থেকে আসচে। তাদের কাছে ডাকলুম, ওরা মনোহরপুর ইউ, পি স্কুলে পড়ে, ছ' মাইল দূরবর্ত্তী কোলবোংগা গ্রাম থেকে রোজ মনোহরপুরে পড়তে যায়।

মনোহরপুর এলুম—দূর থেকে রেলের ধোঁয়া দেখ মনে আনন্দ হোল। কোইনা নদী পার হয়ে মনোহরপুর বাজারে এলাম—চায়ের দোকান, খাবারের দোকান—কি আশ্চর্য্য জিনিষ যেন। চোখে চশমা ভদ্রলোক ছড়ি হাতে বেড়াচ্ছে, এ যেন এক নতুন দৃশ্য আজ আটন' দিনের জঙ্গলের গভীর নির্জ্জনতার পরে। দোকান বলে জিনিষ আছে দুনিয়ায়, সেখানে পয়সা দিলে তুমি সিগারেট, খাবার, চা কিনে খেতে পারো—ডাকঘর আছে, ইচ্ছামত চিঠি লিখে ফেলতে পারো, এ যেন নতুন অভিজ্ঞতা।

মনোহরপুর বাংলা স্টেশনের কাছে একটি পাহাড়ের ওপরে। বেলা পাঁচটায় সেখানে পৌঁছে গেলাম। চারিদিকের দৃশ্য ও দূরের শৈলশ্রেণী দেখা যায় এই পাহাড়ের ওপরে বসে। সূর্য্য অস্ত যাচ্চে, আমি বাংলার কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে ভাবচি ঐ ঘন শৈলারণ্য থেকে এসেচি, ওরই মধ্যে কোথায় সেই শিশির-দা জলভূমি, গুহা, ওরই দুর্গম

প্রদেশে সেই অপূর্ব্ব সুন্দর টোয়েবু জলপ্রপাত, জাতিসিরাং, বাঘের থাবা আঁকা সেগুন বন।

বনের দেবতা মারাং বোংগাকে প্রণাম।

আজ সকালে উঠে একটু বেড়াতে গেলুম। বাঙালীর মুখ অনেকদিন দেখিনি। মনোহরপুর বাজারের পথে সুধীর ঘোষ বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়ে উঠলুম। তাঁর বাড়ী খুলনায়। আনন্দ হওয়াতে তিনি চা খাওয়ালেন, ভাত খেতে বল্লেন। বড় ভদ্রলোক। সেখানে বসে সারেণ্ডা ফরেষ্টের গল্প করলুম। এসে চা খেয়ে 'দেবযান' লিখতে বসি। মিঃ সিন্‌হা আপিস তদারক করতে গেলেন। রেন্‌জ্‌ অফিসারের নাম সুলেমান কারকাট্টা, হো খ্রীষ্টান। রোদ পিঠে দিয়ে বসে লিখলাম অনেকক্ষণ। তারপর তেল মাখলুম রোদে বসে। মনে পড়চে নদীর ধারের কথা বারাকপুরের, হয়তো ছোট এড়াঞ্চির ফুল ফুটেচে এতদিন। ফণিকাকা তামাক খেতে খেতে গল্প করচে বারিকের সঙ্গে। সামান্য বিশ্রাম করলাম খাওয়ার পরে, তারপর ঘুম ভেঙে গেল। সেদিন শ্যামাচরণ দা'র বোন পুঁটি দিদিকে স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন মায়ের মত যত্ন করচে। কল্যাণীর কথা ভাবচি, এতক্ষণে সে কি করচে?

বাইরে চেয়ে দেখচি, রোদ পড়েচে পাহাড়ের শালগাছের গায়ে। বিকেলের রোদ, হঠাৎ মনে পড়লো বাগান গাঁয়ে মোহিনী কাকার চণ্ডীমণ্ডপের কথা। কে আছে সেখানে এখন? কি করচে তারা? মুরাতিপুরে আমার মামার বাড়ীর সেই ছাদটি, সেই শৈশবের লীলাভূমি কলামোচা আমতলা—এত স্থান বেড়ালুম, এখনও যেন মামার বাড়ীর পিছনের বাঁশবন রহস্যময় মনে হচ্ছে। শৈশবের মতই। বারাকপুরের তেঁতুলগাছটার তলায়, আমাদের বাড়ীর পাঁচীলের পিছনে কখনো

যাইনি, বাগানে পাড়ার বহুস্থানে কখনো যাইনি আমাদের গাঁয়ে। উঠে পাহাড়ের ওপরে রোদে একটা পাথরে বসলুম। বাংলোর ঠিক পিছনেই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ অংশ। তার একটু নীচের অংশে আমাদের বাংলো। এক মিনিটেই পাহাড়ের মাথায় গিয়ে বসলুম। আমার সামনে বিস্তৃত সারেণ্ডা ও কোল্‌হাণ শৈলমালা, আংকুয়া লৌহখনি বহুদূর থেকে লাল দেখাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের মাথায়। সারেণ্ডা পর্ব্বতমালা ও ছোটনাগপুর মালভূমির সংযোগস্থলে সারেণ্ডা টানেলের মধ্যে দিয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ চলে গিয়েচে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। ঐ পর্ব্বতমালার ওপারে বহুদূরে ঘাটশিলা, যেখানে কল্যাণী রয়েচে। তারও বহুদূরে ওধারে বারাকপুর, আমার উঠানে ছায়া পড়েচে, কুঠীর মাঠের সেই জলাভূমিটি, তিনু যেখানে ধান করেচে যার ধারে জেলেরা জমি চষেচে এবার দেখে এলাম—ওদের কথা মনে পড়ে গেল। ঐ পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে ঐদিকে কোথায় সেই বনমধ্যস্থ গুহা, ঐদিকে কোথায় সেই অতি সুন্দর টোয়েবু জলপ্রপাত, কোথায় সেই বাঘের পায়ের থাবা আঁকা সেগুনবন, কোইনা নদীর গর্ভস্থ পাষাণময় স্থান জাতিসিরাং, দেবকাঞ্চনফুলের মেলা। বিশ্বদেবের উপাসনা এমন স্থানেই সম্ভব ও সার্থক।

চা খেয়ে বেড়াতে বার হই। গিরিন বাবুর সঙ্গে দেখা, দেবী বাবুর শ্বশুর। অনেকদিন আগে পোসোইতা স্টেশনে দেখা হয়েছিল। ইনি আমায় জঙ্গল দেখাবেন, এক সময় ধারণা ছিল। হরজীবন পাঠক এখানকার একজন লক্ষপতি কাষ্ঠব্যবসায়ী। মোটা মোটা শাল কাঠ পড়ে আছে বহুদুর পর্য্যন্ত স্টেশন ইয়ার্ডে। বনস্পতি উচ্ছেদ করে এ ব্যবসা আমার পোষাবে না। যিনি বনস্পতিতে আছেন, আমি তাঁকে মানি। মনে হবে প্রণীহত্যা করচি। অরণ্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট করচি। তবে

কথা এই—B. T. T. কোম্পানী জঙ্গল উজাড় করে পয়সা লুঠে ইংলণ্ডে পাঠাচ্চে। আমাদের দে' র লোক হরজীবন পাঠক কিছু খায় তো ভালই।

কোইনা ও কোয়েল নদীর সঙ্গমস্থান দেখতে গিয়ে বেলা গেল। প্রকাণ্ড বড় খ্রীষ্টান মিশন নদীর ধারে। তারপর নৃসিংহ দাস সাধুজীর আশ্রমে গিয়ে বসলুম; বেশ শান্তিপূর্ণ স্থান, দক্ষিণ কোয়েল নদীর তীরে। নৃসিংহ দেবের মূর্ত্তি আছে মন্দিরে, সাধুজীর এক চেলা এখন মোহান্ত, উনি মারা গিয়েছেন এক দেড় বৎসর। আরা জেলার এক পণ্ডিতজী—বড় দীন, বিনয়ী—হরজীবন পাঠককে খুব খাতির করলে। জী সরকার, বৈঠিয়ে, জী সরকার দেখিয়ে।

এত ভাল লাগলো কেন পণ্ডিতজীকে ? বল্লে—সাধুজী যব রহতে তব মেজাজ একদম গদ্ গদ্ হো যাতা। বহুৎ রঙ্গিলা সাধু থে। পণ্ডিতজী খোসামোদ করচে পুনপুন লক্ষপতি ধনী হরজীবন পাঠক ও মোহান্তজী দুজনকেই। রোজ সন্ধ্যাবেলা পণ্ডিত সম্ভবতঃ আশ্রমে এসে বসে, গল্প করে, প্রসাদ ট্রসাদ পায়।

নৃসিংহ দাস সাধুর ইষ্টদেবতা এক ক্ষুদ্র শিলামূর্ত্তি। তিনি নাকি সব বাড়ী বাগান তাকে করে দিয়েচেন। সুন্দর ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে বাগানে। চাঁপা, মল্লিকা, আম, হেনা, দারুচিনি, এলাচ—সব গাছ আছে এ বাগানে। সাধুজী আমাদের পানজেরি ও কলা দিলেন প্রসাদ-স্বরূপ। পানজেরি কখনো খাইনি, দেখলুম ধনের গুঁড়ো আর চিনি। আশ্রমটি সত্যিই ভাল লাগলো।

বাড়ী এসে উঠলুম, রাত আটটা। মন্মথ দা আজ আমার চিঠি পেয়েচে, কল্যাণীও পেয়েচে। মন্মথদার বাইরের ঘরে দরজা বন্ধ করে নিশ্চয়ই সব বসে গল্প করচে, আমার চিঠি-খানাও পড়চে।

হে অরণ্য কথা কও

আজ সকালে উঠে রোদে বসে খানিকটা লিখি 'দেবযান'। তারপর কোল বোংগার পথে যেতে পাক্কেমগুটু বলে একটি গ্রামে পাহাড়ের ওপর কিছুক্ষণ বসলুম। সুলেমান কারকাট্টা ও মিঃ সিন্‌হা বস্তী তদারক করছিলেন, সেই সময় আমি পাশের পাহাড়টাতে গাছের ছায়ায় বসি। সামনে বেশ সুন্দর দৃশ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়। একটা গাছ ঠিক চাঁপাগাছের মত, কিন্তু একটি ছেলে বল্লে ওতে ফুল হয় না, ছোট ছোট বীচিমত হয়—অর্থাৎ mendcandia exerta, এই গাছই এ দেশে সর্ব্বত্র, দেখতে চাঁপা গাছের মত। ছেলেটির নাম দিবাকর দাস, হিন্দীতে কথা বলে, জাতে তাঁতি। এদেশে হিন্দু হোলেই তাঁতি হবে, নয়তো গোঁসাই হবে। বাকী সব হো আর মুণ্ডা। ভাষা হো ছাড়া আর কিছু নেই—তবে একটু শিক্ষিত লোকে হিন্দী জানে। ছোকরা চাকুরী চায় export নাকার গার্ড। বলে দিলুম চাকুরীর জন্যে। যদি ওর হয় বড় আনন্দ হবে আমার।

কোল বোংগা গ্রামে সেই গোঁসাই-এর বাড়ীটা ওই পাহাড়ের মাথায়। তারপর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অনেকদূর গেলুম। সেদিন যে নদীগর্ভে বসে চা খেয়েছিলুম পাথরের ওপর, তার নামটি বেশ ভাল—'মহাদেব শাল'। ওটা পার হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে ঘন লতা-দোলানো নিবিড় জঙ্গলের পথে আবার দুটি নদী পার হলুম—বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে গভীর বনচ্ছায়ায় কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেচে। সকালে কত কি পাখী ডাকচে বনে বনে। নিস্তব্ধ বনানী, একই দৃশ্য সারেণ্ডার ঘনজঙ্গলে। সাড়ে পাঁচ মাইল মাত্র দূর মনোহরপুর স্টেশন থেকে অথচ কি নিবিড় বন! ধলভূমে এমন বন নেই কোথাও।

ফিরে আসতে কোইনা নদীর ধারে এক্‌স্‌পোর্ট নাকার আপিসে তদারক করতে দেরি হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে স্নান করে কিছু বিশ্রাম

করলুম। পাহাড়ের ওপর বাংলার পিছনে গিয়ে বসি রাঙা রোদভরা বিকেলে। চারিদিকে স্তরে স্তরে বননীল শৈলশ্রেণী, একটার পেছনে আর একটা, তার পেছনে আর একটা, থৈ থৈ করচে শুধুই পাহাড়। ডাইনে খুব উঁচু একটা পাহাড়ের গায়ে রাঙা লৌহপ্রস্তর বার হয়ে আছে—ঐ হোল চিড়িয়া খনি। বেঙ্গল ষ্টীল কোম্পানী ওখান থেকে লৌহপ্রস্তর কেটে এনে ছোট রেলযোগে মনোহরপুর এনে ফেলচে স্টেশনের পাশে। কত কথা মনে পড়লো পড়ন্ত রোদে দূরের শৈলশ্রেণীর দিকে চেয়ে। কল্যাণী রয়েচে কতদূরে, কি এখন করচে, ওর জন্যে মন হয়েচে ব্যস্ত। আর পাঁচদিন কোনোরকমে কাটালে হয়। গৌরীর কথা—আজ ২১ শে নভেম্বর, সেই ২০ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে এই সময় প্রথম গিয়েচি, সেই উদ্বেগ, 'যতবার আলো জ্বালাইতে যাই' সেই গানটার কথা। এই সময়েই সে মারা যায়। জাহ্নবীর কথা—সেও এই সময়, বোধ হয় আজই হবে। আজই আবার গোপালনগরের হাট, এতক্ষণে পঞ্চামাষ্টার বেগুন বিক্রী করচে, মনো খুড়োর দোকানে লেগেচে ভিড়। সেই ছায়াভরা বনপথে ছোট এড়াঞ্চির ফুল ফুটেচে হয় তো। ১৯৩৫ সালে আজকার দিনে আশুতোষ হলে কবি নোগুচির বক্তৃতা শুনেছিলুম আর ভেবেছিলুম গ্রামে নাজন হয়তো নদীর ধারে মাঠে কলা বেগুনের ক্ষেতে গরু চরাচ্ছে। আজও তাই ভাবচি, দূরে গেলেই দেশের কথা আমার মনে পড়ে। কল্যাণী দেশে যেতে চায়, ওকে নিয়ে যাবো।

বিকেলে মিঃ সিংহ, আমি ও হরজীবন পাঠক আশ্রমে বেড়াতে গেলুম। সুন্দর লতাবিতান, কত ফুল ফলের গাছ। নদীর ধারে নিভৃত কুটির-মধ্যে বিশ্রামের জন্য বেদী, হেনা ফুলের সৌরভ। পবিত্র পুরোনো তপোবনের শান্ত পরিবেশ। খাঁটি ভারতীয় সভ্যতা ও

আবহাওয়া। নৃসিংহ দাস বাবাজির সমাধি ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেচে, সেখানে তার চেলা বসে গাঁজা খাচ্চে সন্ধ্যায়। নদীর ধারে লতাকুঞ্জ মধ্যে ক্ষুদ্র শিবমন্দির। মন আপনিই অন্তর্মুখী হয়ে যায় এই জায়গায় এসে। সাধুজির কাছে বসলুম, তিনি আসনে বসে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়চেন, ধুনি জ্বলচে সামনে। ইনিই বর্ত্তমান মোহান্ত।

ওখান থেকে বেরিয়ে সুধীর চাটুয্যের বাড়ী এলুম আমরা সবাই। সুধীর বাবু অতি বিনয়ী, আমরা গিয়েচি বলে বড় খুসি। চা এনে দিলেন, ঘন ঘন পান ও সিগারেট দিলেন। সরল, অমায়িক ভদ্রলোক—আমাদের দেশের মত কথার টান।—বল্লেন—একসঙ্গে বসে দুটি খাবো বড্ড ইচ্ছে ছিল, তা হোল না। আপনি দয়া করে আমার এখানে এসেচেন।

অনেকদূর পর্য্যন্ত উনি আর হরজীবন বাবু আর একটি ছোকরা সঙ্গে এলেন। সুধীর বাবু পানিতরের কথাও জানেন, আমার প্রথম শ্বশুর-বাড়ী। বল্লেন—'পান্‌তর', বাবা যেমন বলতেন। কতকাল পরে ঐ গ্রামের ঐ উচ্চারণ শুনলুম এতদূরে বসে।

বিশ্বদেবের জয় হোক।

সকালে মনোহরপুর থেকে এখানে আসবো, হরজীবন পাঠক ও সুধীর বাবু এসে খুব গল্পগুজব করলেন। আমি আর কখনো মনোহরপুর আসি না আসি, বাংলোর পেছনের পাহাড়টাতে উঠে বসে রইলুম পূর্বদিকে চেয়ে।

খেয়ে বেলা দুপুরের পর মোটরে উঠে কোল বোংলার পথে পোংগা আসবো, একজায়গায় ফরেস্ট গার্ড আমাদের অতি দুর্গম ও ভীষণ কাঁটা জঙ্গলের পথে বাঁশবন দেখাতে নিয়ে গেল পাহাড়ের ওপারে লুবড়া নালা ভ্যালিতে। অতি কষ্টে সেখানে গিয়ে পৌঁছে আমি বনের

মধ্যে উপত্যকার দিকে মুখ করে বসলুম, মিঃ সিংহ, রেন্‌জার সুলেমান কারকাট্টা ও ফরেস্টার—ওরা সব নীচে চলে গেল। সুলেমান বল্লে—বহুত steep নালা, আপ তো উতারনে নেহি সকেঙ্গে—

আমি বসে দূরের পাহাড়শ্রেণীর শোভা দেখচি সামনের গাছপালার ফাঁক দিয়ে। এমন সময় ওরা ফিরে এল, আমার জেদ ধরে গেল যে ওরা যা কোরেচে আমিও তা পারবো। এই জেদ থেকেই সারেণ্ডা পর্ব্বতারণ্যের মধ্যে একটি সুন্দর এমন কি সুন্দরতম স্থানের আবিষ্কার করা সম্ভব হোল।

মিঃ সিংহ বল্লেন—আসুন, আসুন—দেখুন কেমন সিনারি। আমি গিয়ে চেয়ে অবাক হয়ে গেলুম। মাত্র ৪০ ফুট নেমেচি যেখানে বসে ছিলুম সেখান থেকে। একখানা চওড়া পাথর যেন শূন্যে ঝুলচে, তার নীচে আরও কয়েক থাক প্রস্তরের সোপান, মাত্র হাত ছ'সাত—তারপরই প্রায় ন'শো ফুট খাড়া নীচু উৎরাই—পাথর ফেলে দেখলুম চার পাঁচ সেকেণ্ড পরে তবে প্রথম পতনের শব্দ পাওয়া যায় তারপরে গুরুগম্ভীর শব্দে গড়াতে গড়াতে যেন কোন অতলস্পর্শ গহ্বরে গিয়ে পড়ে। মাথা নীচু করে গিয়ে দাঁড়াতে ভরসা হয় না, মাথা ঘুরে পড়ে যাবো ঐ অত্যন্ত নীচে উপত্যকার মেজেতে, যেখানে বন্য বাঁশ ঝাড়, আরও কত কি গাছের মাথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের মত দেখা যাচ্ছে। আমাদের এই পাহাড়টার উচ্চতা ২২২৬ ফুট, ১৫০ ফুট আর উঠতে হয়তো বাকী সবটুকুই উঠেচি তা ছাড়া। সামনে ৯০০ ফুট খাড়া নীচু উৎরাই সরল রেখায় নেমে গিয়েচে। আমাদের সামনে ১৬৫৬ ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের মাথা—আমাদের নীচে একটু ডানদিকে ঘেঁসে। সামনের উপত্যকাভূমি নিবিড় সবুজ, মেষলোমের মত বৃক্ষশীর্ষে ভর্ত্তি। তার ওপারে স্তরে স্তরে উঠচে শৈলশ্রেণীর পেছনে শৈলশ্রেণী, সমুদ্রের

তরঙ্গমালার মত। আমাদের এই Vantage pointটি একটী খাঁজে অবস্থিত, দুদিকে চলে গিয়েচে বনাবৃত দুই শৈলবাহু বহুদূর পর্য্যন্ত। বাঁদিকের বাহুতে অনাবৃত পাথর বেরিয়ে আছে বহু স্থানে, একটা বটগাছ হয়েচে, আরও অনেক বড় বড় গাছ থাকে থাকে নেমে হঠাৎ যেন শূন্যে ঝুলচে। ঐ একটা শিববৃক্ষ আমাদের কত নীচে ডান দিকে, ঐ মনোহরপুর টাউনের অস্পষ্ট সাদা সাদা বাড়ীগুলি দেশলাইয়ের বাক্সের মত দেখাচ্ছে, কোল বোংগার পাহাড়টা সমতলভূমির সঙ্গে মিলে সমান হয়ে গিয়েচে এতদূর থেকে। বনভূমি নিনাদিত হচ্চে ময়ূরের কেকারবে, নিম্নের উপত্যকার জঙ্গলে। এই নির্জন গহনারণ্যে ময়ূরের কেকারব ওপরে দ্বিপ্রহরের নীলাকাশ, বহু বহু নিম্নে সংকীর্ণ উপত্যকায় পার্ব্বত্য ঝর্ণা লুবড়া নালার কালো খাত—আমাদের আশে পাশে বিশাল বনস্পতিশ্রেণী, আমলকী গাছ, বাঁশঝাড়, পাহাড়ের অনাবৃত প্রস্তরময় অংশ, চীহড় লতা, রামদাঁতনের কাঁটা লতা, শূন্যে ঝোলা একটি কি গাছ আমাদের সামনে—এক ধরনের লজ্জাবতী ফুলের মত বনফুল—পর্ব্বত সানুতে, যেন এক বিরাট চিত্রকরের বিরাট ছবি। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখের সামনে মুক্ত হল! না দেখলে এ দৃশ্যের বিরাট মহনীয়তা, গাম্ভীর্য্য, ভয়, বিস্ময়, সৌন্দর্য্য কিছুই বোঝানো যাবে না। আমাদের কত নীচে বাঁশবনে পাখী উড়ছে একদল। ন' মাইল এ স্থান মনোহরপুর থেকে। তারপর অতি কষ্টে বহু দুর্গম কাঁটাবন ভেঙে আবার মোটরের কাছে এসে পৌছলাম। পথ প্রদর্শক না থাকলে অসম্ভব নামা পুনরায় পথে। ফরেষ্ট রেন্‌জার পথ হারিয়ে গেল। আমরা অন্যদলে অন্যপথে ভুলে চলে গেলুম। নামচি, নামচি—রাস্তা আর আসে না। তেমনি রামদাঁতনের কাঁটালতা সর্ব্বত্র—পা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল কাঁটায়। এই স্থানে কখনো কেউ আসেনি আমি বলতে পারি।

মিঃ সিংহ এ পথে এসেছিলেন ১৯২২ সালে নভেম্বর মাসে—ঠিক এমনি সময় কোল বোংগা থেকে সাইকেলে। যতই অগ্রসর হই বোংগার দিকে, সেই ঘোর জঙ্গলের মূর্ত্তি দেখে মনে হয় এ দেখচি ট্রপিক্যাল ফরেস্ট। এই পথে একটি তরুণ যুবক একা কি ভাবে এসেছিল তাই ভাবি। তিনি তখন নব বিবাহিত, পথের চেহারা দেখে ভয়ে উইল করতে চাইলেন, এক এক স্থানে এমন জঙ্গল, যে চারিধার থেকে চেপে ধরচে ঘোর জঙ্গলে। ঝর্ণার জল খেতে খেতে অগ্রসর হয়ে এই পোংগায় এসে পৌঁছোন। এক দিকে একটা ঝর্ণা, বড় বড় পাথর—অবশেষে আমরা পৌঁছে গেলুম একটা খোলা জায়গায়। সুরগুঁজার ক্ষেতে ফুল ফুটে আছে দেখে মনে হোল লোকের বাস দেখ্‌চি রয়েচে এখানে। এইখানে B.T.T. কোম্পানীর করাতের কারখানা ছিল আগে। জায়গাটার নাম হোল পোংগা। এই ব্রিটিশ কোম্পানী সিংভূমের এ অঞ্চলের বনভূমির যাবতীয় কাঠ কেটে চালান দিচ্চে আজ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে। এদের শেয়ার হোল্‌ডারদের মধ্যে পার্লিয়া-মেণ্টের মেম্বার পর্য্যন্ত আছে। একটা খুব বড় চালাঘরে এদের ফরেষ্ট ম্যানেজার মিঃ লক্‌নার থাকে। কেরানীদের থাকবার জন্য একটা ধাওড়া ঘর আছে। দু একজন বাঙালী মেয়েকে যেন দেখলাম, তবে ঠিক বলতে পারি না।

তারপর মাইল খানেক এগিয়ে এসে আমরা উসুরিয়া বলে একটা জায়গায়, মিঃ সিংহ যে ঘরে থাকতেন ১৯২৫ সালে, তাই দেখতে গিয়ে দেখি সেখানে বসবাস নেই। কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দর স্থান। উসুরিয়া বলে একটি পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে খুব শব্দ করে, বেশ চওড়া নদী—অসংখ্য পাথর ছড়ানো। একদিকে কি সুন্দর বনের বড় বড় গাছ ও পাষাণময় উচ্চ তীর। অপরাহ্ণের ছায়া পড়ে এসেচে, রোদ হলদে

হয়েচে—পানিতরের তেতালা বাড়ীর ছোট্ট ঘরটা যেন এখান থেকে দেখা যাচ্চে। অনেকক্ষণ নদীর ধারে বসে রইলুম, কুলুকুলু শব্দ যেন এই বনশ্রীর অনন্ত সঙ্গীত। যেদিন ভারতে প্রথম বেদগাথার উদাত্ত সুর ধ্বনিত হয় উস্রুরিয়া ঝর্ণা তখন বহু, বহু প্রাচীন। বেদপারগ ও রচয়িতা ঋষিদের অতি অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহদের শৈশবেও এ এমনি বয়ে চলতো ঘনতর বনানীর মধ্যে আপনাতে আপনি মত্ত, চপল খুশিতে ভরা বন্য মেয়ের মত প্রাণোচ্ছল নৃত্যচ্ছন্দে ছুটে ছুটে, আজকার দিনের মত তখনও তার দুধারে ফুটতো দেবকাঞ্চনের ফুল, বন্য শেফালি, পাষাণের তটে কত শরৎ ও হেমন্ত সকালে ঝরা ফুলের রাশি ছড়িয়ে দিত আজও যেমন দেয়, কত চাঁদ উঠেচে, কত পাখী গেয়েচে ওর দুধারের শৈলারণ্যে। সে কি প্রাণ-মাতানো কুহুকুহু ধ্বনি, বাঁদিকের বাঁকে বড় বড় গাছের মাথায় কম্‌প্রিটাম ডিকেনড্রাম লতার কচি পাতায় হলদে রোদ মাখা সে কি সৌন্দর্য্য, কি শান্তি, কি নিস্তব্ধতা—কাদা নেই, ধুলো নেই—শুধু পাষাণময় তীর, উপলবিছানো নদীগর্ভ। এইসব স্থানে প্রাচীন দিনে তপোবন ছিল, নইলে আর কোথায় থাকবে ?

এরই কাছে ঘন বনের মধ্যে বনবিভাগের সংরক্ষিত অঞ্চলে (preservation plot) ১৮০।২০০ বছরের পুরনো শালগাছ দেখলুম। আমার ঠাকুরদাদা যখন বালক, তার আগে থেকেও এগাছ এখানে রয়েচে—তবে তখন ছিল চারা মাত্র। বনস্পতিদের যারা দেখেনি, তারা উপনিষদের ঋষিদের মন্ত্র 'যো ওষধিষু, যো বনস্পতিষু' একথার মর্ম্ম বুঝবে না।

সন্ধ্যার আগে আমরা অপূর্ব্ব সুন্দর বনপথে ছোটানাগরা এলুম। সামনে গুয়ার উঁচু পাহাড়, আগে ভেবেছিলুম সলাইয়ের চিড়িয়া খনির। রাঙা পাথর বার করা জায়গাটা যেমন মনোহরপুর বাংলোর পাহাড়

থেকে দেখা যায় তেমনি। সুন্দর জায়গাটি—স্টেশন থেকে কুড়ি-বাইশ মাইল দূরে, চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা বনে ঘেরা স্থানটি—তবে একটা বন্য গ্রাম আছে তারা বাজরা সরগুঁজা ইত্যাদি বুনেচে ক্ষেতে। পোংগা থেকে ছোট নাগরার এই রাস্তাটির অত্যন্ত সুন্দর দৃশ্য, একদিকে বড় বড় পাথর ও নির্জ্জন ঘন বনের মধ্যে দিয়ে পদে পদে সৌন্দর্য্যভূমি সৃষ্টি করতে করতে ছুটে চলেচে উস্থুরিয়া নদীটি—বাঁদিকে ঘন বন, কম্‌প্রিটাম ডিকেনড্রামের মোটা মোটা লতা গাছের মাথায় ঠেলে উঠে এদিকে ওদিকে নিরালম্ব অবস্থায় শূন্যে দুলচে, যেমন উস্থুরিয়া নদীর দুধারে উঁচু মাস্তুল-সমান বনস্পতিদের মাথায় এমনি লতা দুল্‌ছিল, শাদা শাদা কচি পাতার সম্ভার নিয়ে, যেন সাদা ফুল ফুটেচে ঝোপের মাথায়। রোদ রাঙা হয়ে এসেচে গুয়া পাহাড়ের মাথায়। আমরা ওদিক দিয়ে ঘুরে আবার এদিকে এসে পড়েচি! এই পাহাড়ের ওপারে গুয়া, steep রাস্তা দিয়ে উঠে বনের মধ্যের পথে সাড়ে ছ' মাইল মাত্র কিন্তু মোটরের রোড দিয়ে বাইশ মাইল।

আমি বললুম—তবে শশাংদাবুরু এখান থেকে কেন দেখা যাবে না? তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়—সেদিন শশাংদাবুরুর মাথা থেকে আমরা ছোটনাগরা দেখেছিলুম—ওখান থেকে কেন শশাংদাবুরু দেখা যাবে না?

গুয়ার সমশ্রেণীতে যে পাহাড় টানা চলে গিয়েচে—তারই এক জায়গায় শশাংদাবুরু, খুব উঁচু—আমরা ঠিক করলুম।

সন্ধ্যায় একটি ঝর্ণার ধারে নিবিড় অন্ধকার বনে, গ্রাম থেকে কিছুদূরে বসি। সারেণ্ডার সব স্থানই ভাল, কত সহস্র beauty spot যে এর মধ্যে ইতঃস্ততঃ ছড়ানো—তা কে বলবে? আমার আবার সব জায়গাই ভাল বলে মনে হয়, সুতরাং চারিদিকেই beauty spot-এর ভিড়ে দিশাহারা হয়ে আছি। নক্ষত্র উঠেচে অন্ধকারে আকাশে

বনস্পতি শীর্ষে। চলে এলুম তাড়াতাড়ি, কি জানি হাতীটাতী আসতে পারে।

বড় শীত। আগুনের পাশে বসে সারদানন্দের 'রামকৃষ্ণদেবের জীবনী' পড়ি।

আজ সকালে উঠেচি খুব ভোরে। সূর্য্য তখনও ওঠেনি। বেশ শীত। চা খেয়ে বসে লিখচি। তার পরে সালাইয়ের পথে পাঁচ মাইল গিয়ে বাঁদিকে জঙ্গলের গায়ে হেন্দেসিরি পাঠকজির saw-mill দেখতে গেলুম। কাছেই একটি ঝর্ণা বয়ে যাচ্চে, নির্জ্জন বনে ঘেরা beauty spot, তার মধ্যে ছোট্ট কারখানাটি। একটা পাহাড়ের ওপরে মালিকের জন্যে এক ছোট্ট বাংলো করে রেখেচে, মাটির মেজে গোবর দিয়ে রেখেচে। এখানে বসে লেখাপড়ার কাজ বেশ চলে।

বেলা একটার সময় ফিরে তেন্‌তারি ঘাটে গিয়ে কোইনা নদীতে পার হওয়া যায় কিনা দেখে এলুম। কোইনা নদীর সঙ্গে বার বার দেখা হচ্চে, প্রত্যেক বাংলোতে থাকতে। কেবল দেখা হয়নি তিরিল পোসি থাকতে। অপূর্ব্ব শোভা এই বন্য নদীর, তেন্‌তারি ঘাটেও তাই, বড় বড় পাথর বাঁধানো তটভূমি বনস্পতি শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেচে। এক জায়গায় চুপ করে বসে রইলুম।

Range Officer বল্লে, 'ছোট নাগরা' নামের অর্থ এখানে একটা লোহার নাগরা বা ঢোল আছে বনের মধ্যে পড়ে, প্রাচীন দিনে মানুষের চামড়া দিয়ে তা ঢাকা হোত এবং বাজানো হোত।

পথে আসতে মোটরের স্প্রিং ভেঙে গেল, বেলা তখন দু'টো। এসে স্নানাহার করে কিছু বিশ্রাম করলুম। 'দেবযান' লিখি।

তারপর বেলা পড়লো—পশ্চিম দিকের পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্যদেব

অস্ত গেলেন, চারিধারে পাহাড়ে-ঘেরা জায়গাটার কি চমৎকার শোভা হোল। আমরা একটু বেড়িয়ে এলুম পথ দিয়ে। একটা ঘাস-ওয়ালা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে কাপড়ে ঘাসের বীচি লেগে গেল।

বাংলোর পেছনে ছোট্ট টিলাটার পাথরের ওপরে বসলুম সন্ধ্যায়। আকাশে নক্ষত্র উঠেচে, বনের মাথায়, পূবদিকে একটা গাছের আড়ালে পড়েচে সেই জ্বলজ্বলে নক্ষত্রটা, ফুলডুংরি থেকে সেদিন রাত্রে যেটা দেখেছিলুম। পশ্চিম আকাশে বনের পাথরে পাহাড়ের মাথায় অস্ত দিগন্তের রাঙা আভা।

অসীম নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত সৃষ্টি। একমনে বসে যোগাসনে সেই বিশ্বস্রষ্টার কথা যাঁরা চিন্তা করেন, এইসব সন্ধ্যায়, এই সব বনানীর শান্ত পবিত্রতায়—তাঁরা সাধু, যোগী। তাঁদের কথা জানি না, তবে চারিদিকে চেয়ে এই সন্ধ্যায় মন ভরে উঠলো বটে। বিশ্বদেবের উদ্দেশে আপনিই মাথা নত হয়ে আসে। দূরের ক্ষুদ্র বারাকপুর গ্রামে এখন নদীতীরে ছায়া পড়েচে, দূরের মাঠে পড়েচে, লিচুতলা ক্লাবে মন্মথ কা ও যতীনদা বসে গল্প জুড়েচে—কল্যাণী ঘাটশিলায় সন্ধ্যাদীপ দেখাচ্চে, কতদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

জীবনের কত অদ্ভুত রহস্য—অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! এমন স্থানে এমন সময়ে জীবনটাকে ভেবে দেখবার অবকাশ পায় ক'জন? কর্ম্মকোলাহল-মুখর শহুরে মানুষ নিজেকে বুঝতে জানতে পায় না। এই নিস্তব্ধ গভীর বনপ্রান্ত, ঐ শৈলমালা, অগণ্য নক্ষত্রদল মাথার ওপরে, সন্ধ্যার মায়া—আলো-মাখানো দিগন্ত, বনশীর্ষ, শৈলচূড়া, ঝিঁঝিঁর ডাক—সবই মনকে অন্তর্মুখী হতে সাহায্য করে।

আজ শীত কম। অনেকক্ষণ বসে রইলুম পাহাড়টাতে। তারপর অন্ধকার ঘনীভূত হোল। মিঃ সিংহ বাংলোর টেবিলে বসে লিখচেন,

দেখতে পাচ্চি, হাতীর বা বাঘের ভয়টা তত নেই এখানে।

উনি ডাকলেন—দাদা—

আমি বল্লাম—যাই—

আজ সকালে উঠে আমরা মোটরে সলাই বাংলোতে এলুম। পথে ছোটনাগ্‌রা গ্রাম ছাড়িয়ে একটা লতা-ঝোপের মধ্যে দুটি লোহার ঢোল পড়ে আছে। একটা ছোট, এক ফুট ব্যাস বিশিষ্ট, অন্যটি আড়াই ফুট ব্যাস বিশিষ্ট। এই জঙ্গলে এক রাজা ছিল—তার নাম অভিরাম টং। তার আমলে এখানে বাড়ী ছিল। ছোট ঢোলটা মানুষের চামড়া দিয়ে ছাওয়া হোত ও বাজানো হোত।

সলাই বাংলোটি বড় চমৎকার স্থানে অবস্থিত। বামে, সম্মুখে, অতি নিকটেই ঘন বনাবৃত পর্ব্বতমালা দু'হাজার ফুট উঁচু। পর্ব্বতের পটভূমিতে সামনেই খুব বড় মোটা প্রায় দশ ফুট ব্যাস যুক্ত গুঁড়িওয়ালা এক শিমুলগাছ। তার পেছনে অসংখ্য বনপাদপ, নটরাজের মত তাণ্ডব নৃত্যের ভঙ্গীতে শাখা বাহু ছড়িয়ে কি একটা গাছ বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে শোভা আরও বাড়িয়ে দিয়েচে। প্রভাতের শিশিরসিক্ত নিস্তব্ধ বনস্থলীতে কতপ্রকার বন্যবিহঙ্গের অদ্ভুত কূজন। বারান্দায় চেয়ার পেতে শুনচি একটা পাখী টুং টুং টুং টুং করে ডাকচে, আর একটা পোকা টিয়ার মত যেন বুলি বলচে, চোখ বুজে কান পেতে শুনচি এ পক্ষীকুলের কলতান। বাম দিকের খুব উচ্চ পাহাড়ের এক জায়গায় অনেকখানি অনাবৃত পাথর বেরিয়ে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে। ঈষৎ কুয়াসা লেগে আছে সামনের পর্ব্বতগাত্রে—যেন মনে হচ্চে নীচেকার বনে বুঝি কেউ আগুন দিয়েচে, তারই ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠচে পাহাড়ের গায়ে। বাঁদিকে পাহাড়ের নীচে কোইনা নদী

বইচে পদে পদে সৌন্দর্য্যভূমি রচনা করে। ট্রলি করে লো যেতে যেতে ঘন বনের ডান দিকে দু জায়গায় এমন সুন্দর চওড়া পাষাণময় নদীগর্ভ বনের ফাঁকে চোখে পড়লো। তার ওপারে কম্‌প্রিটাম লতার ফুল-ফোটা বিশাল শৈলসানুর অরণ্যানী। কি গম্ভীর শোভা! সিংভূমের ও সারাণ্ডার বনান্তরালে কত স্থানে কত সৌন্দর্য্যভূমি ভগবান যে ছড়িয়ে রেখেচেন, কৃপণের মত দু একটাকে গুনে গেঁথে রাখেন নি—ধনী দাতার মত দুহাত পুরে ছড়িয়েছেন হাজারে হাজারে। এই পথ দিয়ে ট্রলিতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরবার সময় রাঙা রোদ মাখানো পর্ব্বত ও বনানীশীর্ষে সামনের দুইয়া লৌহখনির অনাবৃত রক্তবর্ণ লৌহপ্রস্তরের পর্ব্বতগাত্রে বহু উচ্চ শৈলশিখরে মোটা মোটা লতা-দোলানো, অসংখ্য দেবকাঞ্চন ফুল-ফোটা, ময়ুর ও ধনেশ পাখীর ডাকে মুখর অরণ্যানী দেখতে দেখতে ওই কথাই বার বার মনে পড়ছিল। সন্ধ্যায় ফিরবার পথে ঘন ছায়া পড়েচে বনে বনে, চারিধারে পাহাড়ের ছায়া—কোনো অজানা বনপুষ্পের সুবাস অপরাহ্ণের শীতল বাতাসে। আমি মিঃ সিংহকে বল্লুম—কিসের বেশ গন্ধ পেয়েচেন? Range Officer সুলেমান কারকাট্টা ছিল ট্রলিতে, সেও কিছু বুঝতে পারলে না। আংকুয়া জংসন থেকে চিড়িয়া মাইন্‌স্ পর্য্যন্ত একটা লাইন গিয়েচে, একটা গিয়েচে দুইয়া মাইন্‌সে। এ দুটিই বেঙ্গল আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানীর খনি। মনোহরপুর থেকে এই পনেরো মাইল এরা ঘন বন পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ছোট লাইন পেতেচে এ দুই লৌহপ্রস্তরের পর্ব্বত থেকে ore নিয়ে যাবার জন্যে, মনোহরপুর রেলওয়ে সাইডিং-এ। কলকাতার ক'জন এই সুন্দর রেলপথটির খবর রাখে? আংকুয়া জংসনে একটা সেলুন পেলুম, তাতে চিড়িয়া মাইন্‌সের বড় সাহেব মিঃ মেরিডিথ যাচ্ছে। তার সঙ্গে গল্প করতে করতে গেলুম। সে বল্লে চিড়িয়াতে ফুটবল

আছে, টেনিস আছে, রেডিও আছে। আবার চলেচি ছোট্ট ট্রেণে বনপথে, বাঁদিকে হামশাদা নদী বনের পথে মর্ম্মর শব্দে বয়ে গিয়ে কোইনাতে মিশেচে। চিড়িয়াতে পৌঁছে দেখি সামনের বহু উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে খাড়া রেলপথ উঠেচে পর্ব্বতশিখরে। Skip উঠেচে মোটা তারের বন্ধনে—রাঙা ধুলোমাখা হো কুলী মেয়েরা সর্ব্বত্র কাজ করচে। আমাদের skip দিয়ে ওপরে উঠবার সময়ে বেশ লাগলো, কখনো উঠিনি—কিন্তু ভয়ও করলো খুব। কল্যাণী কখনো উঠতে পারতো না এ পথে—ও যা ভীতু! ওপরের শিখরে উঠে নীচে চেয়ে সমতলভূমির অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়লো। ১৪৩০ ফুট ওপর থেকে নীচের দিকে দেখচি এমন ভাবে, ঠিক যেন একটা উঁচু বাড়ীর ছাদের কার্নিসে ঝুঁকে আছি। এ সব দৃশ্য চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না।

এই লৌহপ্রস্তরের বিরাট শৈলমালা লেদাবুরু, অজিতাবুরু ও বুদ্ধাবুরু এই তিনটি নামে অভিহিত। এর সর্ব্বোচ্চ শিখর হোল বুদ্ধাবুরু, ২৭০০ ফুট উঁচু। অনাবৃত লৌহপ্রস্তরের বিরাট শৈলগাত্র সেদিন পনেরো মাইল দূর মনোহরপুর বাংলো থেকে দেখেছিলুম। সৃষ্টির আদিম যুগে এত লোহা পৃথিবীর উষ্ণ গলিত ধাতুস্রাব থেকে তৈরি হয়েছিল কিংবা ফুটন্ত গর্ভকেন্দ্র থেকে ঠেলে উঠেছিল—কে বলবে! মাথা ঘুরে যায় এই বিরাট বস্তুপুঞ্জ একজায়গায় পর্ব্বতাকারে জমাট বাঁধা অবস্থায় দেখলে। কি সে মহাশক্তি, কোন সে মহাদেবতা—এই সব বস্তুপিণ্ড যিনি লীলাচ্ছলে সাজিয়ে গিয়েচেন, কোন্ প্রচণ্ড শক্তির বলে এই বিশাল লৌহপর্ব্বত পৃথিবীগর্ভ থেকে উত্থিত হয়েচে, এসব ভূতত্ত্ববিদেরা বলবেন, আমরা শুধু বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়েই আছি।

আমরা চলেচি আসলে 'আংকুয়া ২৯' নামক বনবিভাগের চিহ্নিত

অংশে একটি নাকি জলপ্রপাত আছে, তাই দেখতে। খনির খাদ হচ্চে পাহাড়ের ওপারে, আমাদের সামনে আবার প্রায় ৪০০।৫০০ ফুট উঁচু খাড়া রেলপথে Skip উঠেচে আরও উচ্চতর পর্ব্বত শিখরাঞ্চলে। রাঙা লৌহপ্রস্তরের ধুলি মাখা হো কুলি মেয়েরা হাসিমুখে কাজ করচে। এদের মধ্যে অনেকে দেখতে বেশ সুন্দর।

মাইল. দেড় খনির করা workings-এর মধ্যে দিয়ে হাঁটবার পরে আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করলুম—এসব রিজার্ভ ফরেস্ট। ধনেশপাখী ডাকচে বনে। সেই যে একপ্রকার কাঁটাওয়ালাফল, ওকড়া ফলের মত, যা কাপড়ে লেগে সেদিন টোয়েবু যাবার পথে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তা এখানেও লাগতে লাগলো। অতি দুর্গম পথ—একটি নালা ধরে নালার খাতের পাষাণ বাঁধানো—একদম লৌহপ্রস্তর বাঁধানো —গর্ভ দিয়ে বড় ছোট পাথর ডিঙিয়ে নামচি, নামচি, নামচি। ফরেস্ট গার্ডকে বলচি আমরা, ও Falls কেৎনা দূর?

সে প্রথমে বল্লে—এক মাইল। এখন বলচে দেড় মাইল। তারপর পথ যতই দুর্গম হয়ে আসে, ও ততই বলে, দু' ফার্লং।

কিন্তু একবারে বিরাট wilderness-এর মধ্যে দিয়ে ক্রমনিম্ন পাহাড়ী ঝরণার পাষাণময় গতিপথ বেয়ে নামচি, নামচি—আসে পাশে চেয়ে দেখচি তৃণ, পান্‌জন, বট, আসন, শিববৃক্ষ (sterculia urens) পান আরও কত মোটা মোটা লতা, কমপ্রিটাম লতা, বন্যকন্দ, বন্য অশ্বগন্ধা—কত কি গাছপালা। এক জায়গায় বড় বড় পাথর বেরিয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে, ঝর্ণার জল পড়ে একটা গর্ত-মত সৃষ্টি করেচে পাথরের ওপর। ছোট্ট একটি গুহাও।

ফরেস্ট গার্ড একটা জায়গায় এসে বল্লে—আওর তিন ফারলং।

সেখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েচে। নালাটা হঠাৎ চল্লিশ ফুট

ওপর থেকে নিচে পড়ে একটা গভীর খাতের সৃষ্টি করেচে এবং গভীর থেকে গভীরতর খড্ কেটে ক্রমনিম্ন খাড়া ঢালুপথে বহু, বহুদূরে নেমে গিয়েচে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে—দূরে জলপতন ধ্বনি শুনতে পেলুম বটে।

অদ্ভুত, গম্ভীর এই স্থানের দৃশ্য। বর্ণনা করা যায় না, আমরা দেখলুম আরও তিন ফার্লং গিয়ে আজ আর ফিরতে পারবো না। চিড়িয়া খনির Skip বন্ধ হয়ে যাবে। তখন দুর্গম ঢালুপথে হেঁটে নিচে নামবে কে?

ফরেস্ট গার্ড বল্লে—জলপ্রপাত ওখান থেকে দেখা যাবে না। ঢালুপথে অনেকটা নামতে হবে—তিন ফার্লং গিয়ে, তবে দেখা যাবে।

তিনটে বেজেচে। 'আংকুয়া ২৯' Falls মাথায় থাকুক্। ১৭৬০ ফুট পর্ব্বত শিখর যেখানে বসে আছে, পার্ব্বত্য ঝর্ণা সেই গভীর খাতের একেবারে প্রান্তে। সুলেমান কারকাট্টা বল্লে ম্যাপ দেখে—এ জায়গাটা ১৭৬০ ফুট উঁচু।

সেখানে বসে টিফিন বক্স্ থেকে বার করে পুরী, কাটলেট, কলা ইত্যাদি খেলুম। ফরেস্ট গার্ড দুটি খড়কুটো জ্বালিয়ে চা করলে। মহিষের দুধের মাখন জমে গিয়েচে শীতে, মাখন চা হোল।

খেয়ে সেই বনের পথে আবার ফিরলুম। কি ভীষণ নিস্তব্ধ জনহীন wilderness! যে এসব না দেখেচে, তাকে এর গাম্ভীর্য্য কিছুই বোঝানো যাবে না। সারাণ্ডা অরণ্যের অন্তরালে হাজারো সৌন্দর্য্যভূমি ছড়ানো—আমি আফ্রিকায় যেতে চেয়েছিলুম বন দেখতে! আবার সেই কাঁটা-ওয়ালা ফল—এদেশী নাম 'মিন্‌ডো জোটো' কাপড়ে জামায় লেগে ভারি হয়ে গেল। উঠচি, উঠচি—চড়াইয়ের দুর্গম পার্ব্বত্যপথ। অতি কষ্টে চলেচি, ঘন ঘন হাঁপাচ্চি। কক্ কক্ শব্দ করে বিচিত্র বর্ণের বন মোরগ পালিয়ে গেল।

খনিতে এলুম বেলা পড়েচে, কি সুন্দর সমতলের দৃশ্য। অনাবৃত লৌহ প্রস্তরের শৈলগাত্রেরই বা কি ভীমদর্শন চেহারা। এক জায়গায় অনেকখানি কোয়ার্টজাইট পাথর বেরিয়ে আছে অনেক ওপরে—যেমন নীচের ঝর্ণার দুধারে অনেক জায়গায় অতি অদ্ভুত ভাবে ছিল। Skip দিয়ে একটি তরুণী হো মেয়ে উঠে এল বেশ শান্ত ভাবে। যারা কখনো Skip-এ ওঠেনি, তাদের মূর্চ্ছা যাওয়ার কথা। আমরা নামচি, অনেকগুলি রাঙা ধূলি মাখা কুলী মেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে দেখচে, এঞ্জিন ড্রাইভারকে বলচে—ঠারো, ঠারো।

নামবার সময়ে ঢালুর দিকে চেয়ে ভয় করলো—যেন কোন্ নরকে নেমে চলেচি। যদি শেকল ছিঁড়ে যায়, তবে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে হবে। ট্রেনে এলুম আংকুয়া জংসন—ট্রলিতে সেই অপূর্ব্ব বনপথে এলুম সবাই। বড্ড ঠাণ্ডা বাতাস লাগচে সামনে থেকে ট্রলির বেগে, বনপুষ্পের সুবাস বাতাসে, দুপাশে বনে বনে অজস্র দেবকাঞ্চন (bohinia purpuria) ফুল ফুটে। ধনেশ পাখী ডাকচে বনে। বাঁদিকে কোইনা নদীর ওপারে পর্ব্বত শীর্ষে ও বনস্পতি-শীর্ষে রাঙা রোদ। সলাই বাংলো তিন মাইল, এখানে আমাদের মোটর আছে।

ওই সামনে দুইয়া খনির শিখরদেশ দেখা যাচ্চে রাঙা দগ্‌দগে ঘার মত সবুজ শৈলগাত্রে—ঠিক সবুজ নয়, ধূসর শৈল গাত্রে।

এ বনে যজ্ঞডুমুর ও শিমুল, আম ও পানজন গাছ অনেক, আলোক-লতা ও চটিজুতোর মত ফল বিশিষ্ট সেই গাছটাও যথেষ্ট। শেষোক্ত গাছটা আমাদের বারাকপুরের ভিটেতে আছে।

মনেও পড়লো বারাকপুরের কথা—কুঠীর মাঠে শীতের অপরাহ্ন নেমেচে, আলকুশীর লতা দুলচে বনে ঝোপে, ইন্দু রায় তার বাড়ীতে বসে ফণিকাকার সঙ্গে গল্প করচে—বেশ দেখতে পাচ্চি।

সলাই থেকে তখনি মোটর ছাড়া হোল। সুলেমান কারকাট্টাকে আমরা মোটরে উঠিয়ে নিলুম—নতুবা সাইকেলে এই সন্ধ্যায় সলাই থেকে ছোটনাগরা সাড়ে সাত মাইল ভীষণ বনের পথে যেতে হবে। হাতীর বড় ভয় এ সময়। বাঁদিকে সেই সুউচ্চ প্রায় ২০০০ ফুট উঁচু পর্ব্বত-মালার দিকে চেয়ে আছি। মোটর ছুটেচে বেগে, কখনো ঘন বনে ঢুকচে কম্‌প্রিটাম লতার শাদা কচি পাতা দোলানো ঝোপের মধ্য দিয়ে, কখনো উঠচে, কখনো নেমে পার্ব্বত্য নদী পার হচ্চে। আমি দেখচি বাঁদিকের পাহাড়ে কোথাও খানিকটা অনাবৃত পর্ব্বতগাত্র, কোথাও একটা গাছ। এই সন্ধ্যায় কল্যাণীর কথা বড় মনে হচ্চে, ওকে হয়তো কাল দেখবো।

অনেক দূরে ইছামতীর পারে একটি তেতলা বাড়ীর ওপরের ঘরটিতে—সেখানে এখন কেউ থাকে না—যে ছিল, অনেক কাল আগে সে কোথায় চলে গিয়েচে। গৌরী—তার কথা মনে হচ্চে আজ সন্ধ্যায়। এই সময় সে মারা গিয়েছিল আজ বিশ বৎসর আগে।

ভগবান তার মঙ্গল করুন।

দুদিকের বন সন্ধ্যার অন্ধকারে নিবিড়তর দেখাচ্চে, সেদিনকার সেই ছোট্ট ঝর্ণাটি পার হলুম, যার ধারে লতাকুঞ্জে রাজা অভিরাম টুংয়ের ঢোল পড়ে আছে।

অনেক রাত্রে একবার আমি বাইরে এলুম, আকাশের দিকে চেয়ে দেখি নক্ষত্র সমূহ ঠিক হীরকখণ্ডের মত জ্বলচে, গুয়ার পাহাড়ের মাথায় একটা নক্ষত্র দপ্‌ দপ্‌ করচে, একবার নিবচে আবার জ্বলচে যেন। আকাশে নক্ষত্র সমূহের এমন দীপ্তি বাংলা দেশে তো দেখিই নি, এমন কি মনে হয় ঘাটশিলাতেও দেখিনি।

একটা সারেণ্ডা বা সিংভূম দর্শনেই আমি মুগ্ধ, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে

অমন কত অনন্ত কোটি beauty spot ছাড়ানো রয়েচে, ঐ সব নক্ষত্রে নক্ষত্রে কি বিচিত্র জীবনধারা, আত্মার অনন্ত গতিপথে ওদের নিয়েও তাঁর লীলা, বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। বন পাহাড়ের মাথার ওপরে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের লীলা, শুধু তাঁর কথাই মনে আনে।

সকালে উঠে দেখি খুব কুয়াসা হয়েচে, সাদা ধোঁয়ার মত কুয়াসার রাশি উপত্যকা থেকে উঠচে ওপরে, শুয়ার পাহাড় ঢেকে দিলে। বড্ড শীত। পাহাড়ের নিচে বনশ্রেণী কুয়াসায় ঢাকা, ধীরে ধীরে সূর্য্য উঠলো। সূর্য্যদেবকে প্রণাম করলুম।

আজ এখান থেকে চলে যাবো। সারেণ্ডা অরণ্যের কাছে বিদায় নিলুম, হে সুপ্রাচীন অরণ্য, তোমায় প্রণাম করি। শত বিস্ময়ের সৌন্দর্য্যভূমি তোমার মধ্যে হাজার বৎসর ধরে লুকানো ছিল, কেউ আসেনি দেখতে—এতদিনে দেখে ধন্য হয়ে গেলাম। আজ ষোল দিন ধরে বনপুষ্প সুবাস উপভোগ করেচি তোমার বনে বনে, তোমার বন বিহঙ্গের কলগীতি শুনে কান জুড়িয়েচি সহরের কলকোলাহলের পরে, তোমাকে প্রণাম করি। কত দেবকাঞ্চন ফুল, কত লুদাম, কত অপরিচিত নাম না-জানা ফুল, কেকাধ্বনি, জলপ্রপাতের জলপতনধ্বনি জনহীন গহন বনে, সেই গুহা দুটি, কত বন্যলতার অদ্ভুত মনোরম ভঙ্গি, ধনেশ পাখীর কর্কশ চীৎকার, ক্ষুদ্র barking deer এর ঘেউ ঘেউ শব্দ, বন্য বানরের ডাক (যেমন কাল ডাকছিল আংকুয়া জলপ্রপাতের বনে), অপূর্ব্বদর্শন বনাবৃত শৈলমালা, লৌহপ্রস্তরের বিশালকায় খনি—এ সব দেখবার শুনবার, উপভোগ করবার অভিজ্ঞতা যে কত দুর্লভ তা আমি জানি। সেইজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিই, যিনি আমাকে এখানে এনেচেন।

আজ সকালে চা খেয়ে মোটরে রওনা হই গুয়াতে। গাড়ীর স্প্রিং ভেঙে গিয়েচে বলে জিনিসপত্র কুলির মাথায় পাঠানো হোল গুয়াতে। মোটর ছেড়ে আসচি, পথে ঝর্ণার কিছুদূরে আমাদের পাচক বিরশা চলেচে হেঁটে। কার্ডিনাল উল্‌সির কথা মনে হোল ওকে দেখে। আজ বনের পথে মোটর চলেচে, আমি ভাবচি প্রায় চারশো মাইল পথ অতিক্রম করে চাঁইবাসা গিয়ে ট্রেণ ধরে আজই হয় তো রাত একটা-দেড়টায় বাড়ী পৌঁছে যাবো। খুব আনন্দ হচ্চে আজ সারা পথটি। তেন্‌তারি ঘাটে কোইনা নদী পার হলুম। এখানে সাত-আট জন কুলি আমাদের গাড়ী ঠেলবার জন্যে অপেক্ষা করচে।

ঘন জঙ্গলের পথে যাবার দিনের সেই কুমডি রাস্তার মোড়ে এলুম। বরাইবুরু বলে যে গ্রামটি কারো নদীর ধারে সেটি ছাড়ালুম। গুয়া এলুম মিঃ রাসবিহারী গুপ্তের বাড়ী, সেখানে মহিলা সমিতির সভানেত্রী আশাদেবী ও আরও কয়েকটি মহিলা দেখা করতে এলেন আমার সঙ্গে। মিসেস্ গুপ্ত পরিতোষ করে আমাদের খাওয়ালেন। অনেকদিন পরে যেন সভ্যজগতে এসেচি বলে মনে হচ্চে। আমরা তিনটার সময়ে মোটরে রওনা হই, বরাইবুরুতে কারো নদী পার হয়ে জামদার পথে চল্লুম হাটগামারিয়া। আজ হাটবার গোপালনগরের, জগন্নাথপুরের হাট দেখে আমার সেকথা মনে পড়লো। পঞ্চামাষ্টার বেগুন বিক্রি করচে ইঁদারার ওপরে বসে। রোদ রাঙা হয়ে আসচে। পিছনে দেখা যাচ্চে কেউন্‌ঝর রাজ্যের পাহাড় ও বন, বামে কোলহান ও সারাণ্ডার শৈলমালা। হাটগামারিয়া এসে পরেশ বাবুর আপিসে আমরা চা খেলুম—তারপর কেদ্‌পোসি স্টেশনে এলুম ট্রেণ ধরতে। আমি এখান থেকেই যাবো ঘাটশিলায়। আজই যাবার জন্যে মন উদ্বিগ্ন। মণীন্দ্র নন্দীর নাতি আলাপ করলেন। তিনি এখানে চীনা

মাটির খনির ম্যানেজার। আদর্শ হিন্দু হোটেল নাকি তাঁর খুব ভাল লেগেচে।

ট্রেণে উঠলুম, লেখা আছে ইণ্টার ক্লাস, কিন্তু কাজে সেকেন্ ক্লাস। বেশ আরামে বিবেকানন্দের 'ভক্তিযোগ' পড়তে পড়তে এলুম—মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে ধূসর দিগন্তের দিকে চেয়ে ভাবি। এতক্ষণ হাট শেষ হয়ে গেল, লোকেরা সব বাড়ী ফিরচে। লিচুতলায় আড্ডা বসেচে। বিরশার সঙ্গে আবার দেখা চাঁইবাসা ষ্টেশনে। ডাক-আরদালি কামরায় এসে সেলাম করে বখশিস্ চাইলে।

বড্ড দেরি করে ট্রেণ টাটায় এল। রাঁচী এক্সপ্রেস ছেড়ে গিয়েচে—সারা রাত্রি ওয়েটিং রুমে চেয়ারে বসে কাটালুম। নৈহাটির এক গার্ড এখানে কি করচে, তার সঙ্গে সারারাত গল্প করি। দুজন ছোকরা ওয়েটিং রুমে আমায় চিনতে পেয়ে বসবার জায়গা করে দিলে।

রাত শেষ হয়ে গেল। ৬টায় ট্রেণ এল, ভীষণ শীত। ঝিমুতে ঝিমুতে ঘাটশিলায় এলুম। মনে খুব আনন্দ। ষোল দিন পরে বাড়ী ফিরচি, ঘি ও ধুনো হাতে ঝুলিয়ে চলেচি। শান্ত এসেচে বম্বে থেকে, প্ল্যাটফর্ম্মে দেখা। ও গেল পুটুর কাছে। কল্যাণীরা ঘি দেখে খুব খুসি। বাড়ী আসতে সবাই খুসি।

উষা চিঠি দিয়েচে কাশ্মীর থেকে, অজিত বাবু চিঠি দিয়েচেন রাঙামাটি (চট্টগ্রাম) থেকে—বাড়ী এসে গেলুম।

পরের দিন সন্ধ্যায় শচীন ও ফণির সঙ্গে বসে বসে চালভাজা খাচ্ছিলাম। সারাণ্ডাতে কত ভাল জায়গা দেখেচি তার একটি তালিকা ওদের কাছে বল্লাম। প্রথমে ধরি কুম্ডির পাশে কোইনা নদী। ২য়, শশাংদাবুরু, ৩য়, থলকোবাদ বাংলো, ৪র্থ, জাতি-সিরাং (Mat-Rock) ৫ম, ভানগাঁও ও বোনাই সীমান্ত, ৬ষ্ঠ, বাবুডেরা, ৭ম, বনশ্রী ও বাবুডেরা

থেকে সামটার তেমাথার পথ, ৮ম, হেন্দেকুলি ক্যাম্প ও তৎপূর্ব্বে সামটা নালার loop, ৯ম, লিপিরদা জলা ও গুহাদ্বয়, ১০ম, ধলকোবাদ বাংলো থেকে বনপথে কোইনা নদী ও তীরবর্ত্তী বনভূমিতে কোইনা নদীর loop, ১১শ, টোয়েবু জলপ্রপাত ও সেখানে যাবার বনপথটি, ১২শ, বিট্‌কেলসোয়া গ্রাম ও সেখানে যাওয়ার পথটি, ১৩শ, মহাদেব-শাল ঝর্ণা ও কোল বোংগা গ্রাম, ১৪শ, নৃসিংহদাস বাবাজির আশ্রম, মনোহরপুর, ১৬শ. হেন্দেসিরি, ১৭শ, ছোটনাগরা বাংলো, ১৮শ, সলাই বাংলো ১৯শ, মলাই থেকে আংকুয়া যাবার পথ ও পাশে কোইনা নদীর পাষাণময় গর্ভ ২০শ, চিড়িয়া খনি, ২১শ, Lyall's look out, রামদাঁতনের কাঁটালতা ভেঙে যেখানে গিয়েছিলুম, ২২শ, উম্বুরিয়া ঝর্ণা, ২৩শ, বড় বড় শালের preservation plot, ২৪শ, আংকুয়া জলপ্রপাত, ২৫শ, সেচনের পয়োপ্রণালী, ২৬শ, বড় নাগরা ও ছোট নাগরা (ঢোল দুটি ও অভিরাম টুং রাজার ভগ্ন মন্দির), ২৭শ, কোদলীবাদে যে কুটিরে মিঃ সিংহ ১৯২৫ সালে ছিলেন।

•

অনেকদিন লিখিনি। কাল সন্ধ্যায় ইন্দু বাবুর গাড়ীতে ধলভূমগড় থেকে ফিরে এসেচি। ৫ই জানুয়ারী তারিখেও একবার গিয়েছিলুম। বড় ভাল লাগে ও জায়গাটা। মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে এখানে ওখানে খড়ের ঘরের সারি—এরোড্রোমের লোকদের বাসস্থান। শাল, মহুল, হরিতকী ছাড়া বিদেশী কোনো রোপিত ফুল ফলের বৃক্ষ নেই, কোঠাবাড়ী এক আধখানা ছাড়া বেশি নেই। বাঁদিকে দূরে চারচাকীর জঙ্গল দেখা যায়। শুকনো শালপাতার বেড়ার গন্ধ রোদ ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে ইসমাইলপুরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চারচাকার বনটি অতি চমৎকার, সেদিন যখন জ্যোৎস্না উঠলো—আর কোনো বাড়ী

ঘর দেখা যায় না—অত বড় বিরাট মুক্ত space যেন মায়াময় হয়ে উঠলো। যে কোনো সময় ঘরে বা বারান্দাতে বসে সামনে চোখে পড়ে ভালকী পাহাড় ও তার পটভূমিতে ঋজু ঋজু সুদীর্ঘ শাল তরুশ্রেণী—কাল আবার মেঘ করাতে দৃশ্যটি এত সুন্দর হয়েছিল! নীল হয়ে উঠেচে শৈলমালা। এখানে যদি কলকাতার সৌখীন লোকেরা বাড়ী করে টাউন বানাতো, বাড়ীর নাম দিতো 'সন্ধ্যানিবাস' 'অলকা' 'বনবীথি' 'Hill-view', 'অমুক নিলয়', 'Forest side' ইত্যাদি বালীগঞ্জী ফ্যাসানে সামনে ঢাকা টানা বারান্দা করতো কাঁচের প্যানেল বসানো লম্বা জানালায় ফ্রেম বসানো, লতাপাতা আকারের লোহার রেলিং বসানো গেট্ বসাতো—তাহোলেই এই শালবন ও শৈলশ্রেণী, লাল মাটি ও কাঁকরের উচ্চাবচ ঢিবির সঙ্গে, এই রৌদ্রস্নাত দূর দিগন্তের সঙ্গে, এই লাল ধুলো মাখা সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে আর কোনো যোগ থাকতো না। সে হয়ে উঠতো একটা টাউন—বালিগঞ্জের অক্ষম ও সক্ষম অনুকরণে। যেমন নষ্ট হয়েচে দেওঘর বা মধুপুর বা শিমুলতলায়। এবং নষ্ট হয়েচে খানিকটা ঝাড়গ্রামও।

বারাকপুর গিয়েছিলুম ধান চাল গোছাতে। গেলুম সেদিন গুট্কের সঙ্গে রাঁচী প্যাসেঞ্জারে। যাবার পূর্ব্বে দ্বিজু বাবুর বাড়ীতে বেদান্ত ও ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে কত আলোচনা করি—ফিরে এসে আর দেখা হয়নি। কলকাতার যাবার বুকিং বন্ধ, অতি কষ্টে ব্রেক্ভ্যানে একটু জায়গা করে নিলুম। সকালে কলকাতায় পৌঁছে—রমেশ ঘোষালের বাড়ী গিয়ে 'তাল নবমী' পুস্তকের contract হোল। সেখানে দেখলুম Indian Arts and Letters বলে পত্রিকা যাতে আমার কথা লিখেচে। সেদিনই বনগ্রামে গিয়ে তিনটার ট্রেণে বন্ধুর বাসায় থাকি। টক্ল আছে এখানেই।

কতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, পা আর ওঠে না। ফিরে এসে ইন্দুর সঙ্গে আবার বারিকের বাড়ী গেলুম চালকীতে। সূর্য্য অস্ত যাচ্চে, আমি ওর উঠোনে গরুর গাড়ীর ওপর বসে তামাক খাচ্চি কল্কে হাতে। তারপরে পাকা রাস্তার ওপরে মুচিপাড়ায় সজনে সাঁকোতে গিয়ে বসে আমডোবের গল্প শুনি ইন্দুর মুখে। তৃতীয় ঘটনা এইটিই। কোথায় টাটানগরের সভা সেদিনকার, কোথায় সারাণ্ডা বন কান্তারের শৈলমালা—আর কোথায় চালকী গ্রামে আমার প্রজা বারিকের বাড়ীতে গরুর গাড়ীর ওপর বসে তামাক খাওয়া!—

পরদিনও বিকেলে বারিকের বাড়ী যাবার আগে প্রমোদের বাবার সঙ্গে কথা বলি। তিনি তামাক খাওয়ালেন। অন্ন বলে মেয়েটির শ্বশুর। কত নিন্দে করলেন কুটুম্ব বাড়ীর। উনি জ্বরে পড়ে আছেন, ওঁকে দেখে না—ইত্যাদি। বারিকের বাড়ী গিয়ে খুব বকাবকি করলুম ধান দিচ্চে না বলে। ওখান থেকে সোজা চলে এলুম কুঠীর মাঠে অপূর্ব্ব বনপথে, কণ্টক-লতার পুষ্পের সুগন্ধের মধ্যে। আগে বসলুম নদীর তীরে নিবারণ ঘোষের বেগুন ক্ষেতের জমিতে, যেখানে আর বছর আমি আর কল্যাণী নতি শাক তুলতে আসতুম। তারপর এখান থেকে মাঠের মধ্যে জলার ধারে। রোদ একেবারে রাঙা হয়ে এসেচে, সিমুল গাছে মুকুল দেখা দিয়েচে, শীত আজ অনেক কম। কুল পেকেচে গাছে গাছে—অনেক পেড়ে খেলুম—কিছু নিয়ে এলুম ইন্দু রায়ের ছেলে মেয়ের জন্যে। ফিরবার পথে অন্ধকার সন্ধ্যায় আমাদের ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালুম—ওপারে একটি মাত্র তারা জ্বল্ জ্বল্ করচে সন্ধ্যা আকাশে। যেন আমি ১৯৩৭ সালের বড় দিনের ছুটিতে বারাকপুর এসেচি, খুকু রোজ সন্ধ্যায় আমার কাছে শ্লেট্ পেন্সিল বই নিয়ে পড়তে আসে—আমি বসে বসে মেটে প্রদীপের আলোয় 'দৃষ্টি প্রদীপ' লিখতুম।

শ্যামচরণ দা'র বাড়ী বসে গল্প করে এদিন ওদের বাড়ীর খিড়কীর পথে আমাদের পুরোনো ভিটের সামনে দিয়ে ফিরি। যেমন ফিরতুম বাল্যকালে, যখন মা ছিলেন, বাবা ছিলেন—আমাদের পুরোনো ভিটের বাড়ীটা বজায় ছিল। সে সব কত কালের কথা!

পরদিন আবার সকালে বড় চারা আমতলায় বসলুম বনের মধ্যে শুষ্ক পাতার রাশির ওপর গামছা পেতে। এই বনের মধ্যে নিভৃতে চুপ করে বসে বন-বিহঙ্গের কাকলী শুনতে আমার যে কি ভাল লাগে। জীবনকে গভীর ভাবে অনুভব করি এই নির্জ্জন বনতলে একা বসে। "আনন্দাদ্ধ্যেব ইমানি সর্ব্বাণি ভূতাণি জায়ন্তে"—উপনিষদের বাণীর সার্থকতা ও সত্যতা এখানে বসে বুঝতে পারি।

হাটে গিয়ে পাটালি কিনলাম। ফিরে এসে একদিন সন্ধ্যায় যে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হোল—তা এ ক'দিনের সব অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে গেল। সন্ধ্যায় বনভূমিপ্রান্তে ক্ষীরফুলি গাছের পেছনটাতে একা বসেচি চুপ করে—সামনে ছোট এড়াঞ্চি ফুলে ভরা ঝোপ-ঝাপ, সাঁই বাবলা গাছের পত্রশীর্ষ, বনপুষ্পসুবাস, পাখীর ডাক—সন্ধ্যায় অন্ধকার নেমে আসচে, বনভূমি আজও তেমনি স্বপ্নমাখা—কি সুন্দর মধুমাখা সন্ধ্যা! কল্যাণী আমায় বলতো—মানুকু, এখানে বসবো!

এই মাঠে।

সেকথা মনে পড়লো এই সন্ধ্যায়। তার চোখে অসীম নির্ভরতার দৃষ্টি। কলকাতায় এলুম পরদিন গরুর গাড়ীতে। তিনু আমার সঙ্গে এল রাণাঘাট স্টেশনে কচু কুমড়ো নিয়ে ওর দাদার শ্বশুর বাড়ীর জন্যে। মাঝের গাঁয়ে মহীতোষ দার সঙ্গে স্টেশনে দেখা অনেকদিন পরে।

কলকতা থেকে আমতায় গেলুম শ্বশুর বাড়ী। সেই জাঙ্গিপাড়া স্কুলে যখন কাজ করতুম, গৌরী মারা গিয়েছিল—সেই সব শোকাচ্ছন্ন

দিনের ছাপ আছে এই সব লাইনের গাছে পালায় মাঠে। সেই পথ দিয়েই আবার শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি এতকাল পরে। খুব আশ্চর্য্য না ?

কলকাতায় এবার দুজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল বহুকাল পরে। খেলাত স্কুলের পুরোনো হেড্ মাষ্টার ক্ল্যারিজ সাহেব—আজকাল সে একজন ইহুদী স্কুলের হেড্ মাষ্টার বউবাজারে। একেই নিয়ে ক্লার্ক ওয়েল সাহেবের সৃষ্টি 'অনুবর্ত্তন' এ। আর ভাগলপুরের অম্বিকা ঘোষ, যার সঙ্গে অনেকদিন আগে ভাগলপুর থেকে দেওঘর হেঁটে গিয়েছিল। 'অভিযাত্রিক'এ এ ঘটনার উল্লেখ করেছি। অম্বিকাকে একখণ্ড 'অভিযাত্রিক' উপহার দিলুম। ওর সঙ্গে ১৪।১৫ বছর পরে দেখা হোল—ও দেখতে তেমনিই আছে।

আজ সবাই মিলে চার খানা গরুর গাড়ী করে বনের পথে ধারাগিরি যাওয়া গিয়েছিল। সারাপথ এমন enjoy করেছি কি বলবো। কাশিদা ছাড়িয়ে লাল শালুক ফোটা সেই বড় বিলটা, যেখানটার নাম ঢ্যাং জোড়া, সেটা ছাড়িয়ে ধবলীর বন, তারপর বুরুডি গ্রাম, তা ছাড়িয়ে বুরুডি ঘাট অর্থাৎ পাস্, তারপর বাসাডেরা গ্রাম--একেবারে চতুর্দ্দিকে বন সমাচ্ছন্ন উপত্যকায় ঘেরা, সেখানে মুকুল বাবুর কর্ম্মকর্ত্তা শিরিশ বেশ চমৎকার একটি ঘর বানিয়েচে দেখলুম, দেখলে থাকতে লোভ হয় এই নির্জ্জন বনাবৃত উপত্যকায়। এই ঘরের সামনে দিয়ে মুকুল বাবুর তৈরি রাস্তা পাহাড়ের ওপর চলে গিয়েচে, নিশ্চয়ই জ্যোৎস্নারাত্রে বা ছায়াস্নিগ্ধ বৈকালে এই পথের বন্য আমলকী, আম, পিয়াল ও তেঁতুল তলায় বেড়ানো বড় মনোরম হবে। একদিন যাবো ওখানে ও রাত কাটাবো রমাপ্রসন্ন ও গৌর এখানে এলে।

আমরা ঘাট অর্থাৎ পাস্ পার হয়ে গেলুম পদব্রজে। সবাইকে

গরুর গাড়ী থেকে নামতে বাধ্য করলুম। এই রাস্তাটার একটা নিবিড় বন্য সৌন্দর্য্য আছে, বাঁদিকে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল উঠেচে, ডাইনে ৬০০।৭০০ ফুট গভীর খাদ, তার তলা দিয়ে খরস্রোতা (নদীর নাম, বিশেষণ নয়) নদী উপলাস্তৃত বন্ধুর পথে বয়ে চলেচে, চারিধারে কত রকমের গাছপালা, কত মোটা মোটা লতা, বনফুলের মধ্যে এক রকমের কুচো কুচো নীল ফুল আর ছুটবা (Indigofera Pulchera) ফুটেচে। বাঁদিকের পাথরের দেওয়ালের গায়ে—বনবিহঙ্গের কাকলী বনের শাখায় শাখায়, ঘাট অতিক্রম করে বাসাডেরা উপত্যকায় এসেই মুকুল চক্কত্তি কনট্রাক্টরের ওই ছোট্ট খড়ের ঘরটা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। এমন সুন্দর শান্ত, নিভৃত শৈলমালা ও বনানী বেষ্টিত উপত্যকায় থাকে কিনা মুকুল চক্কত্তির কর্ম্মচারী শিরিশ? শিরিশকে আমি জানি, সে কি বুঝবে এই বনভূমির সৌন্দর্য্য? সে সকালে উঠে বনের মধ্যে চলে যায় কাঠ কাটানোর জন্যে, কাঠ চেরাই করবার জন্যে—তারপর গাড়ী বোঝাই দিয়ে শাল বল্লা পাঠায় ঘাটশিলা ষ্টেশনে—যে বনের গাছ কেটে ব্যবসা করে, বনলক্ষ্মী কি তার সামনে মুখাবগুণ্ঠণ অপসারিত করেন?

বেলা দেড়টার সময় আমরা ধারাগিরি পৌঁছে গেলুম। সঙ্গে এতগুলো মেয়েমানুষ ছিল, সবাই বড় লোকের বাড়ীর বৌঝি, একবার কি কেউ বল্লে—জায়গাটা বেশ ভালো, কি বেশ, কি চমৎকার! কিছু না, পয়সাই আছে, কিন্তু চোখ নেই। মেয়েমানুষগুলোর হাতে এক গোছা করে সোনার চুড়ি, কানে কানপাশা, কত রকমের সেজেছে —কিন্তু এসেই 'ওরে, অমুক ওদিকে যাস্‌নি' 'অমুক তোর ঠাণ্ডা লাগাবে'—হৈ চৈ চীৎকার, গোলমাল—"বকা কোথায় গেল দ্যাখ্ দ্যাখ্ (কুকুরের নাম)"—এই সব ব্যাপার। অমন চমৎকার বনপাহাড়ের

সৌন্দর্যের দিকে কেউ চেয়েও দেখলে না, কেবল আমি আর প্রভাত দুজনে মুগ্ধ হয়ে বসে রইলুম কতক্ষণ। তারপর খিচুড়ি রান্না হোল, বটতলায় বসে ডাঃ রক্ষিত আমি ও প্রভাত কিরণ—তিনজনে খিচুড়ি খাওয়া গেল, তাস খেলা গেল, গল্পগুজব করা গেল। তারপর বেলা পড়লে ছায়াভরা বিকেলে সবাই পাহাড় থেকে ফিরলুম।

. .

কাল বিকেলে দুবলাবেড়া এলুম হলুদপুকুর থেকে। রাত্রে টাটানগরে ছিলুম, মিঃ ভর্ম্মার বাড়ীতে। অনেকে দেখা করতে এল। রাত দেড়টা পর্য্যন্ত 'দেবযান' সম্বন্ধে গল্প। সুশীল বাবুর মোটরে স্টেশনে এলুম ভোর ৬ টাতে। হলুদপুকুর স্টেশনে নেমে এক মাড়োয়াড়ির দোকানে চা ও খাবার খেয়ে বারোজ সাহেবের মোটর লরির জন্যে অপেক্ষা করলুম। বারোজ সাহেবের লোক বল্লে—রাত্রে যা বৃষ্টি হয়েচে, ও রাস্তায় গাড়ী আসা মুস্কিল। শোনা গেল দুবলাবেড়া এখান থেকে ষোল মাইল। দিনটি মেঘাচ্ছন্ন ও ঠাণ্ডা। হেঁটে বেরিয়ে পড়ি আমি ও মিঃ ভর্ম্মা। কেমন কাঁকরের পথটি এঁকে বেঁকে আমাদের সামনে দূর থেকে বহুদূরে সুদূর নীল শৈলমালা ও বন প্রান্তরের দিকে চলে গিয়েচে। ঐ হোল রাইরক্ষপুরের পথ—এ পথ চলে গেল বারিপদা হয়ে বালেশ্বর ও কটক। আমরা বনের দিকে অগ্রসর হচ্চি—ঐ শৈলমালার মধ্যে কোনো এক বনাবৃত ছায়াভরা উপত্যকায় দুবলাবেড়া গ্রাম। সেখান থেকে ভ্যালেডিয়ম ore আসচে।

প্রথমে পড়লো নড়সা নদী। পথের দুধারে কালো পাথরের পাহাড়, যেন পাথুরে কয়লার স্তূপ, এসব পাহাড় প্রায়ই অনুর্ব্বর, বৃক্ষলতাহীন—কচিৎ কোনো পাহাড়ে এক আধটা শিববৃক্ষ দণ্ডায়মান। হাঁড়িয়ালি বলে একটা গ্রামে এক বাড়ী থেকে শাঁকের আওয়াজ শুনে এক

ছোকরাকে বল্লুম—এদের বাড়ীতে শাঁক বাজচে কেন?

—সত্যনারাণ পুজো হচ্ছে।

—কি জাত এরা?

—মহারাণা।

—সে কি?

—জ্যোতিষ।

—ব্রাহ্মণ?

—ওই।

এদেশে হাঁ বলতে জানে না, বলে—'ওই'।

এ গ্রামের নিচেই হাঁড়িয়ালি বলে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী। হেঁটে পার হয়ে গেলুম। রাস্তা হাঁটতে কি আনন্দই হচ্চে সকাল বেলাটা। ধূ ধূ করচে মুক্ত উচ্চাবচ ভূমিভাগ, যেন space-এর সমুদ্র, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, ছোট বড় কালো পাথরের পাহাড়, পলাশ, শিববৃক্ষ মহুল ও আসন। শালগাছ বেশী চোখে পড়লো না। এক স্থানে পথের ধারে বড় গাছের তলায় একটা চওড়া পাথরে বাংলা অক্ষরে লেখা আছে—

মৃতু বাসেয়া সর্দ্দার

সাং চাকড়ি সন ১৯৪৯।

অর্থাৎ উক্ত গ্রামের ৺ বাসেয়া সর্দ্দারকে অমর করবার চেষ্টা। এই গ্রাম পার হয়ে একটা পার্ব্বত্য নদী—নদীর নাম লুপুং, কিছুদূরে এই নামের একটা গ্রাম। পথের দুধারে আমের গাছ—এমন অদ্ভুত ধরণের বউল ধরেচে, আর তার কি ভরপুর সুবাস! একটা চারা আমগাছ দেখে মনে হোল গাছটাতে ফুল ধরেচে। নদীটার ধারে এক বিশাল সুপ্রাচীন অর্জ্জুন গাছের শাখা প্রশাখার তলে আম্রমুকুলের সৌরভের

মধ্যে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। বেলা হয়েচে, পথ হেঁটে খিদেও পেয়েচে। কয়রাসাই গ্রামের পাশে একটা কালো পাথরের পাহাড়ের নিচে একটা কুলগাছ, অনেক কুল পেকেচে দেখে সেখানে কুল কুড়তে গেলাম। পথে কতকগুলি ছেলে স্কুলে যাচ্ছে, কয়রাসাই গ্রামে একটা পাঠশালা দেখে এসেচি বটে পথের ধারে। আমরা ছেলেদের নাম জিজ্ঞেস করলুম। একজন বল্লে—তার নাম দিবাকর তাঁতি। একজনের নাম ধনুধর বাস্কে।

—কি জাত?

—বাস্কে জাত।

এই সময়ে একটু একটু বৃষ্টি পড়তে লাগলো। আমাদের সামনে ডানদিকে জোজুড়ি শিখরদেশ (২০০০ ফুট) দেখা যাচ্ছে, দূরে নারদা (১৭০৬ ফুট) শিখর। সামনের শৈলমালার ওপারেই ময়ূরভঞ্জ, অগণ্য বন্যহস্তী ঐ সব পাহাড়ে। দিন থাকতে থাকতে দুবলাবেড়া পৌছুলে বাঁচি। কোয়ালি গ্রামে পৌঁছে গেলুম তখন বেলা একটা। এক কুম্ভকারের বাড়িতে আশ্রয় নিলুম বৃষ্টির সময়। তাদের খোলার চালা, মাটির দেওয়াল। মেয়েদের হাতে রূপোর অলংকার। কপালে সিঁদুর। কথা বাংলাই—তবে বড্ড বাঁকা বাঁকা এবং একটু উড়িয়া ঘেঁষা। ওরা মুড়ি খাওয়ালে তেলনুন দিয়ে মেখে এনে। হঠাৎ এক বৃদ্ধ উড়িয়া ব্রাহ্মণ এসে ভিক্ষা চাইলো। তার নাম বাইধর মিশ্র, বাড়ী পুরীর কাছে মালতীপাতপুর। ওর বারো বছরের ছেলে বাড়ী থেকে আজ দু'-তিন মাস ভিক্ষে করতে বেরিয়েচে এবং খবর পাওয়া গিয়েচে ছোকরা সিংভূমে এসেচে। তাই বাইধর খুঁজতে বেরিয়েচে ছেলেকে। হলুদপুকুর স্টেশনে নেমে গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়াচ্চে। উড়িয়া ভাষায় বল্লে—কাল রাতে এক মণ্ডলের বাড়ী উঠেছিলাম, এমন ঝড়বৃষ্টি এল, ভাত রান্না

করতে পারলুম না। কিছু খাইনি রাত্রে। ওকে আমরা কিছু পয়সা ও মুড়ি দিলাম। একটু তেল দিলাম, ও একটা ফাঁপা বাঁশের লাঠির মধ্যে তেলটুকু পুরে নিলে। কি সুন্দর সরল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ! হেসে বল্লে—বাবু, বাড়িকে বাড়ি, চুঙ্গাকে চুঙ্গা। খুব খুসি।

আমরা কোয়ালি থেকে বৃষ্টি থামলে বেরিয়ে গুররা নদী পার হলুম। (রাখা মাইনসের সেই গুররা নদী, এখানে ছাৎনাপাহাড় থেকে বেরিয়েচে) তারপর বন ও জঙ্গলের পথে এলুম হরিনা গ্রামের মহাদেব স্থানে। এই বনের মধ্যে এক ভাঙা মন্দির, চারিদিকে বট, আমলকী, পলাশ, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষরাজি, মানুষের হাতের নয়, স্বাভাবিক বন। দেবস্থান বলে লোকে কাটেনি। ওখানে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে আবার পথে বেরুই। পথ চলার আনন্দ এমন একটা নেশা আনে মনে, ছোট্ট একটা বন দেখলেও মনে হয় অদ্ভুত জিনিষ দেখচি। বাহ্যজগৎকে গ্রহণ করে যে মন, সে শুধু উপভোগ করে ক্ষান্ত থাকে না, সৃষ্টিও করে। গুররা নদী পার হবার পরে আর একটা ক্ষুদ্র নদী পেলুম, সেটা পার হয়ে বেগ্‌নাড়ি গ্রাম। সামনের পাহাড়ে খারিয়া জাতিরা জুম্ চাষ করচে বন কেটে, বোধহয় সে বাঁকা জায়গাতে খড় হয়েচে, শুষ্ক খড়ের ক্ষেত রাঙা রাঙা দেখাচ্চে, বেগনাড়ি গ্রামের পাশ দিয়ে পথটি, অনেকগুলো বড় বড় গাছ পথের ধারে, বাঁশঝাড়, তেঁতুল, মহুয়া, অর্জ্জুন। এতক্ষণ দেখছিলুম মেয়েদের সিঁথিতে সিঁদুর, পরণে শাড়ী—এখানে দেখলুম মেয়েদের মোটা হাতে-বোনা কাপড় দু' টুকরো জড়ানো—হো বা সাঁওতালদের ধরণে। অনেক টোমোটো ক্ষেত পথের পাশে।

একটি বৃদ্ধ মহিষ চরাচ্চে, তাকে বল্লাম—দুবলাবেড়া কতদূর?

সে বল্লে—সামনে মাগুরু আর নেংগাম লাগালাগি, নেংগাম আর দুবলাবেড়া ভিড়াভিড়ি।

নতুন ভাষা শিখলাম। 'ভিড়াভিড়ি' মানে কাছাকাছি, কিন্তু এখানেই গোলমাল। ১৪ মাইল পথ তখন হাঁটা হয়ে গিয়েচে, ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্তও বটে—সে অবস্থায় এ দেশের লোকের মুখে 'ভিড়াভিড়ি' শুনে খুব আশ্বস্ত হলুম না। এরা তিন মাইলকেও কাছাকাছি বলতে পারে। একটা পাহাড় দেখিয়ে বল্লে—ঐ পাহাড়টা দেখচিস্, ঐ পাহাড়টা ঘুরে যেতে হবেক্। এ জায়গাটি চেয়ে দেখি বড় চমৎকার। তিনদিকে শৈলমালা ও নিবিড় বন আমাদের পথকে ঘিরেচে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে, অবিশ্যি দূরে দূরে। জোজুড়ি শিখরদেশ আর দেখা যায় না, নাবদা peak ডাইনে বহু পিছনে অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে, রোদ ফুটেচে পশ্চিম গগনে, অথচ বাঁদিকের ছাৎনা ও আটকুশী শৈলমালা সাদা কুয়াসার মত মেঘে ঢাকা। যেন দার্জিলিংয়ের কুয়াশা। ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে সেদিক থেকে।

একদিকে শাল কেঁদবন পথের পাশেই। বড় বড় শিলাখণ্ড সর্ব্বত্র। পাহাড়টা খুব উঁচু, ঘুরে যাবার সময় বাঁ-পাশে পর্ব্বতসানুতে বনশোভা বেশ দেখালো পড়ন্ত রোদে। পাকা কুল খেতে খেতে যাচ্চে একদল বন্য মেয়ে। ঢুবলাবেড়া তাঁবুতে পৌছুলাম বেলা পাঁচটাতে। পাহাড়ের নিম্নসানুর বন যেখানে শেষ হয়েচে, সেখানেই তাঁবু পাতা। মিঃ বারোজ্ তাঁবুতে বসে মিঃ সিংহার সঙ্গে গল্প করচে। বল্লে—পথে বৃষ্টির জন্যে মোটর পাঠাতে পারিনি, এখন পাঠাচ্ছিলাম। চা ও খাবার খেয়ে ধড়ে প্রাণ এল।

রাত্রে একটু জ্যোৎস্না উঠলো। কি শোভাই হোল তাঁবুর পেছনের পর্ব্বতসানুর বনের। শালগাছ নেই এ বনে। কেঁদ, পড়াশি, শিবগাছ, কুল, কম্ব্রিটাম লতা, বড় বড় বিরাটকায় শিলাখণ্ডের ওপর টেরি লতা ও মোটা মোটা চীহড় লতার ঘন ঝোপ, আমলকী, নিম ইত্যাদি নিয়ে

জঙ্গলটা। বৈচিত্র্য আছে এ বনে, একঘেয়ে শালবন বড় খারাপ।

মিঠাই ঝর্ণার ওপারে লখাইডি গ্রামে খাড়িয়া জাতির বাস। তাদের মাদল বাজচে জ্যোৎস্না রাত্রে। এ একেবারে বন্য জায়গা, বারোজ, বল্লে বড় বুনো হাতীর উপদ্রব। গত বৎসর বন্যহস্তীতে নিকটের কেরু কোচা গ্রামের একটা লোককে মেরে ফেলেছিল। কি সুন্দর বনশোভা! জ্যোৎস্না পড়েচে উপত্যকার ওপারের আটকুশী শৈলশ্রেণীর এ দিকের ঢালুতে—এ যেন বনপরীর দেশটি। শিউলি গাছের জঙ্গল তাঁবুর পেছনে শৈলসানুতে। শরৎকাল হোলে প্রস্ফুটিত শেফালির সৌরভ ভেসে আসতো শীতল নৈশ বাতাসে।

এই যে লিখচি সামনে পাহাড়ের মাথায় বর্ষার সাদা মেঘপুঞ্জ জমেচে। তাঁবুর দোর থেকে বড় চমৎকার দেখাচ্চে গাছগুলোকে! গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের একটি কথা মনে পড়ে গেল, "A nation's history has three stages. Success, then as a consequence of success, arrogance and injustice; then as a consequence of these, downfall."

কাল সারাদিন বৃষ্টিতে তাঁবুতে বসে। কোথাও বেরুতে পারিনি। তাঁবুর পেছনে লুদাম, করম ও ধ গাছ, একটা ধাতুপ ফুল গাছে প্রথম বসন্তের রাঙা রাঙা ফুল ফুটেচে। পাহাড়ের সানুতে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় শিলাখণ্ড। যে কোনোটাতে আরাম করে বসে চিন্তা করা যায় বা লেখা যায়। কিন্তু বাদলাবৃষ্টিতে সব ভিজে। সন্ধ্যায় বারোজ সাহেবের বাংলোতে বেড়াতে গিয়ে বসলুম খানিকক্ষণ। পূর্ব্ব আকাশে পাহাড়ের ওপর দিয়ে ভাঙা মেঘের ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠলো। মিসেস্ বারোজ বন্য হস্তীর গল্প করলে। এক পেয়ালা কোকো পান

করে এই শীতে বেশ আরাম করে বুনো হাতী ও মাতাল ভালুকের গল্প শোনা গেল। আর বছর মাগডু গ্রামের নিকটবর্ত্তী পথে একটা ভালুক পেট ভরে মহুয়া ফুল খেয়ে যখন গাছ থেকে নামলো—তখন সে ঘোর মাতাল, টলতে টলতে চলেচে। রাত্রে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি সুরু হোল। সারারাত্রি বৃষ্টি।

আজ সকালেও বৃষ্টি পড়ছিল। বেলা হোলে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা বিকেলে মাগডু ও চেংশম গ্রামে বেড়াতে গেলুম। ডাইনের প্রকাণ্ড পাহাড় শ্রেণীর পাশ দিয়ে আসান পড়াশির বনের ছায়ায় পথ, বনে পিয়াল গাছে মুকুল ধরেচে, বাতাসে আম্র ও পিয়াল মুকুলের সৌরভ, কালো কালো পাথরের স্তূপের ওপর টেরির জঙ্গল, বামে পোটরী ও কুন্দরুকোটা পাহাড়—ওখানে নাকি একটা সোনার খনি ছিল, ৰিলিংহাম নামে এক সাহেবের। এখন খনির কাজ বন্ধ শুনলুম। ওই পাহাড়ের ওপর দিয়ে অস্ত আকাশের তলায় তলায় ময়ূরভঞ্জ যাবার পথ। আমরা যখন ফিরলুম তখন বেলা পড়ে এসেচে, বন্য কুক্কুট ডাকচে ডানদিকের শৈলসানুর গহন অরণ্যের মধ্যে।

রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠলো। আমরা তাঁবুর পিছনের শৈলশ্রেণীর ওপরে একটা পাথরের চাতালে রাত দুটো পর্য্যন্ত বসে আগুন জ্বালিয়ে গল্প করলুম। ভালুক ও বন্য হস্তীর ভয়ে (এবং শীতের জন্যেও বটে) আগুন জ্বালানোটা নিতান্ত দরকার। আজ বিকেলেই দেখে এসেচি মাগডু গ্রামে লাখন মাঝি বলে একটা সাঁওতাল যুবকের একটা চোখ ভালুকে একেবারে উপড়ে দিয়েছে—অবিশ্যি ঘটনাটা ঘটেছিল মাগরু থেকে দুবলাবেড়া যাবার পথে জঙ্গলের ধারে। লাখন টাঙি হাতে যাচ্ছিল দুবলাবেড়া, ভালুক মহুলগাছ থেকে নেমে ওর ওপর এসে পড়ে, উভয়ে জড়াজড়ি ও ধস্তাধস্তি হয়, তার ফলে লাখনকে একটা চক্ষুর মায়া

কাটাতে হয়েচে। পরশু রাত্রে বারোজ সাহেবের মুরগীর ঘরে বাঘ এসেছিল, সকালে আবার দাগ দেখা গিয়েচে। এই সব শুনে নির্জন পাহাড়ের ওপর গভীর রাত্রে আমরা তিনটি প্রাণী বসে থাকবার সময় যে খুব নিরাপদ ভাবছিলুম নিজেদের এমন কথা বল্লে মিথ্যে বলা হবে।

কিন্তু সব বিপদকে অগ্রাহ্য করা যায় সে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রির শোভা দেখবার জন্যে। পাহাড়ের ওপরে শুকনো শালগা, দোকা (odina wodier), অজস্র বন্য শিউলি, শিববৃক্ষ, গোলগোলি, পড়াশি, বন তুলসী, ও করম (Adina cordifolia) গাছের জঙ্গলে নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্না পড়েচে, সামনের উপত্যকা ও ওপারের আটকুশি ও পোটরা পাহাড় শ্রেণীতে বনে বনে সেই জ্যোৎস্না এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেচে—যেন এই জনহীন নিশীথে বনদেব ও দেবীরা এখানে নামেন নিঃশব্দ পাদক্ষেপে, তাঁদের মুখে মুখে ধ্বনিত হয় বিশ্বের অধিদেবতার নীরব জয় গান!

এই বনে (এ পাহাড়টি ছাড়া, এর ওপরে বেশির ভাগ শুধুই শেফালি গাছ) এ সব গাছ তো আছেই আরও আছে তুন, লতা পলাশ (Butea superba) বোংগা সর্জ্জম লতা শাল, আসান, পিয়াল, মলুয়া, অর্জ্জুন, বট কদম্ব, কুসুম, ধওড়া, রাজ জেহুল, কুজরি, রোহান (Soymida Febrifuga) বাঁশ, পিয়াসাল, চীহড়লতা, বেল প্রভৃতি গাছ আছে। অবিশ্যি কোনো একটা জায়গায় এত রকমের বৃক্ষ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকে না বা নেইও, মানুষের তৈরি বাগান ছাড়া। অরণ্যের প্রকৃতিই তেমন নয়, যেখানে যে গাছ আছে সেখানে সেটাই বেশি। শাল তো শালই, অর্জ্জুন তো অর্জ্জুনই—এমন রকম।

আজ সকালে তাঁবু থেকে বার হয়ে ডুবলাবেড়া গ্রামের মধ্যে দিয়ে

পাহাড়ে উঠলুম। সুন্দর বনপথে উঠলুম। ঘাটশিলা থেকে ষোল মাইল হবে। দূরে ভাল্‌কি পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্চে। এখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। এখানে বসে এই মাত্র চা ও খাবার খেয়েচি। দূরে দূরে শৈলশ্রেণী, সামনে সমতলভূমি নীল কুয়াসায় অস্পষ্ট। একটা শিলাখণ্ডে বসে থাকবার সময় গাছপালার ছায়ায় বসে মনে হোল হিমালয়ের পর্ব্বতারণ্যে বসে আছি। পড়াসি বাঁশ, সোঁদাল প্রভৃতি গাছ। কাল সকালে আমাদের তাঁবুর পেছনের পাহাড়টাতে বড় পাথরের চাতালটাতে কতক্ষণ কাটিয়েচি। আকাশ ছিল সুনীল, তার তলায় শুকনো শালগাছ ও দোকা গাছের আঁকা বাঁকা ডালপালার ভঙ্গি—সে একটা দেখবার জিনিস। একটা শিলাখণ্ডে রৌদ্রে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। রৌদ্রস্নাত দ্বিপ্রহরে চারিদিকের সে বন্য সৌন্দর্য্য আমাকে অভিভূত করে তুললে। সত্যিই এ সৌন্দর্য্য যেন সহ্য করা শক্ত। প্রাণভরে ভগবানের শিল্প রচনা দেখি। বিকেলে আমরা ঘটডুয়ার বলে একটী অতি চমৎকার স্থানে গেলুম, তাঁবু থেকে ৪ মাইল দূরে মুসাবনীর পথে। ছাতনাকোটা ও রাঙামাটিয়া নামে দুটি সাঁওতালি গ্রাম পথেই পড়ে—সাঁওতালদের মাটির ঘরগুলি দেখবার জিনিস বটে, পরিষ্কার ভাবে লেপা-মোছা, রাঙা ও কালো মাটি দিয়ে চিত্তির করা দেওয়ালের গায়ে আলপনার মত পাখি আঁকা, গাছপালা আঁকা। ঘাটকুলার জায়গাটাতে দুদিক থেকে দুটি শৈলমালা এসে ক্রমনিম্ন হয়ে শেষ হয়ে গিয়েচে—মধ্যে হাত পাঁচেক চওড়া সমতলভূমি, এক পাশে একটা পার্ব্বত্য নদী বড় বড় শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে বয়ে চলেচে। ঘন বন দু পাশে, ঝর্ণার ওপরে অনাবৃত শিলাস্তর থাকে থাকে কাৎ-ভাবে এসে পড়েচে—প্রায় একশো ফুট কি দেড়শো ফুট উঁচু। স্তরগুলো একটার ওপরে সাজানো, একটি থেকে আর একটি গুনে নেওয়া যায়। দুটি গুহা আছে জলের ওপরেই,

গত বৎসর নাকি এক খাড়িয়া পরিবার ওতে বাস করতো। আমরা যখন ফিরলুম, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে, সম্মুখে আঁধার রাত। বিভিন্ন পার্ব্বত্য নালার ওপরকার পাথর চোখে দেখা যায় না, কোনোরকমে হোঁচট খেতে খেতে পথ চলি। কিন্তু ঝক্‌ঝকে তারাভরা আকাশের মহিমময় রূপ দেখে সব কষ্ট ভুলে গেলুম। এদিকে বারোজ সাহেবের বাংলোতে ডিনার খাওয়ার কথা, রাত হোল প্রায় সাড়ে আটটা তাঁবুতে। ডিনার খেয়ে ফিরতে এগারোটা বেজে গেল। বারোজ বল্লে, সন্ধ্যাবেলা তোমরা বাঘের ডাক শুনতে পেলে না সামনের পাহাড়ে। সাড়ে ছ'টার সময়ে খুব ডাকছিল বাঘ।

আজ সকালে উঠে চা খেয়ে মিঠাই ঝর্ণার কাছে চুকলু বাগাল গ্রামে খাড়িয়া জাতি দেখতে গিয়েছিলুম। ডুবলাবেড়া ছাড়িয়ে খানিকটা গিয়ে পথ উঠেচে পাহাড়ের ওপরে। ঘন বনের মধ্য দিয়ে পথ, একটা কি গাছের ডালে দুটো চিল বসে আছে। ওপরে উঠতে উঠতে পা ধরে গেল—তখন একটা বড় পাথরের ওপরে বসলুম, একটা বড় মহুয়া গাছ সোজা উঠেচে দূরের পাহাড় ও সমতল ভূমির পটভূমিতে। ভগবানের নৈকট্য এসব জায়গায় যত অনুভব করা যায়, এত কি কলকাতা কি টাটানগরে বসে সম্ভব? টাটানগর কেন বললুম, সিংভূমের বনে বাস করে তাঁবুতে, টাটানগরের নাম করবো না এটা অন্যায়। আমরা চড়াই পথে চলেচি, বুনো বাঁশ, আমলকী, পাপড়া, কর্কট, পড়াশি, মহুয়া গাছের তলা দিয়ে, কোথাও পথের পাশে কুঁচ ফলে আছে ঝোপে, কোথাও এক রকম হল্‌দে ঘাসের ফুল ফুটে আছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইচে আকাশে কালো মেঘ।

পাহাড়ের ওপর উঠে দুজন খাড়িয়ার বাড়ি—তাদের মেয়েরা শুধু আছে, আমাদের দেখে সোজা পালালো। তারপর আমরা গেলুম চুকলু বাগালের

বাড়ী। খড়ের ছাউনি, নিচু মাটির ঘর, এমন চমৎকার দৃশ্য চারিদিকে,- শিলং কি কার্সিংয়ংএর বড় লোকের বাড়ীও এমন জায়গায় হোলে গর্বের বিষয় হতে পারে। টুকলুর ছেলে আনন্দপুর স্কুলে পড়ে। কাল রাত্রে টুক্লুর গরুটা নাকি বাঘে মেরেচে সামনের পাহাড়ে। সবটা খেয়েচে ? আমরা জিগ্যেস্ করি।

সে বলে—উয়াকার মুড়িটা নিয়ে গেছে। বাকিটা ডুংরিটাতে রাখি গেলো।

এটার নাম চরাই পাহাড়, ২১০৬ ফুট উঁচু। হিমালয়ের মত দৃশ্য চারিদিকে। একটা উঁচু ডুংরীর ওপর গিয়ে আমরা বসলুম, গ্রানাইটের স্থূক্ষাগ্র চূড়ার চারিপাশে ভাঙা ভাঙা গানাইটের boulder—ফাঁকে ফাঁকে খড়, দু চার ঝাড় বন্যবাঁশ, একটা সাথীহীন মহুয়া। সামনের সমতলভূমির দৃশ্য এত উঁচু থেকে বড় চমৎকার দেখাচ্চে।

একটি সাঁওতাল তীরধনুক হাতে এসে হঠাৎ হাজির। তার নাম জিগ্যেস্ করলে নাম বলে না। জিগ্যেস করে জানা গেল ওর বাড়ী রাঙামাটিয়া গ্রামে, সে এবং তার দুজন সঙ্গী এসেচে বাঘে-মারা গরুটার অর্দ্ধভুক্ত দেহটা খুঁজে নিতে। এই গ্রানাইট পর্ব্বতচূড়ায় আসলে সেটাই সে খুঁজতে এসেচে। আমাদের কৌতূহল পূর্ণ করবার অবকাশ নেই ওর।

আমরা বল্লাম—গরু খাস্ তোরা ?

—ওই।

একটু পরে আমরা আমাদের গ্রানাইট চূড়ায় বসে দেখচি, তিনজন সাঁওতাল অথবা হো নিচের বনে শুষ্ক শালের পাতার রাশির ওপর দিয়ে মচ্‌মচ করে হাঁটতে হাঁটতে বনের সর্ব্বত্র আতিপাতি করে

খুঁজচে কালকার সেই বাঘে খাওয়া গরুর মৃতদেহটার জন্যে। ঘণ্টাখানেক খুঁজবার পরে ওদের অধ্যবসায় সার্থক হোল, দেখি আমাদের চূড়া থেকে সামান্য উঁচু আর একটা ডুংরির মাথায় দুটি লোক একটা মরা গরু বাঁশে ঝুলিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্চে।

আমাদেরও চা ও খাবার এই সময় দুবলাবেড়া থেকে এসে পৌঁছুলো। চা খেয়ে নিয়ে আমরা রওনা হই। নিচে নেমে একটা খাড়িয়ার কুটির। ওর মধ্যে আমরা ঢুকে দেখি। একটা মলিন চেটাই, কয়েকটি হাঁড়ি কলসী, লাউ কেটে তৈরী একটা হাতা, চীহড় পাতার একটা ঠোঙা, দুটো শুকনো ধুঁধুল, একটা উদুখল—এই তার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি।

ঢুকলু বাগাল বল্লে—হাতীর ভয়ে আমরা হিই রাতে বাইরে শুই আজ্ঞে। নইলে ঘর ভাঙি দিবেক।

—তোরা হাতী এলে কি করিস?

—হাতী খেদ্‌বো।

এই গ্রামের নাম গামীরকোচা। আমার মনে হোল পড়ন্ত হল্‌দে রোদে এই বন পর্ব্বত, দূরে দূরে অগণ্য শৈলমালা ও গ্রানাইট শিখর, অরণ্যাবৃত সানুদেশ ও নিচেকার সমতলভূমির কিছু অংশ দেখে—যে এই খাড়িয়া অধিবাসীরা খুবই গরীব হয়তো—কিন্তু অনেক শহুরে বড় লোকের চেয়ে ভাল জায়গায় বাস করে এরা। দার্জ্জিলিং কার্সিয়াং বা শিলং এর চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয় এদের বাড়ীর মাটির নিচু দাওয়া থেকে চতুষ্পার্শ্বের পার্ব্বত্যদৃশ্য। যেদিকেই চাই—সামনের ময়ুরভঞ্জের দিকেই হোক্ বা বামে ভাল্‌কি ও মুসাবনীর দিকেই হোক—শৈলমালার পেছনে শৈলমালা, তাদের পেছনে শৈলমালা, তাদের পেছনে আবার উচ্চতর শৈলমালা—সজল নীল কুয়াসার অস্পষ্ট, কোনোটাতে হলদে রোদ,

কোনোটার মাথায় মেঘের ছায়া, কোনোটা কুয়াসায় ধোঁয়া ধোঁয়া।. এই সব দেখতে দেখতে ঘন বনের পথে নামলুম।

সন্ধ্যা হয়ে এসেচে, তাঁবুতে এলুম। একটু পরে শুনি সামনে পাহাড়ে বাঘের 'হাঁকোর' 'হাঁকোর' আওয়াজ। দুবার তিনবার শুনলাম! একটু পরে বারোজ সাহেব তাঁবুতে বেড়াতে এল—সে বল্লে, কাল সন্ধ্যায় এমন ডাকছিল বাঘ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া এমন আওয়াজ করবে না। নির্জ্জন বন পাহাড়ের ধারে তাঁবু, অন্ধকার রাত্রি, এমনি বাঘের ডাকে ভয় যে না হোল মনে, তা বলতে পারিনে।

বারোজ বল্লে—খাড়িয়ারা সপ্তাহে একবার মাত্র ভাত খেয়ে থাকে গরম কালে। আর কিছু জোটে না। খাড়িয়া কুলি মেয়েরা পয়সা নিয়ে গেল মজুরির, তার পরদিন এল না ওরা খনিতে কাজ করতে। টাকা হাতে পেয়ে ভয় পেল।

বল্লে—এ সব টাকা আমাদের?

—হাঁ।

—কত আছে?

—দুটাকা। গুনতে জানিস না?

—নেই জানি।

এত গরীব কিন্তু এত সরল!

ধলভূমের দৃশ্য যে এত wild ও এত ভালো তা আগে জানতুম না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি দেখবার সুযোগ দিয়েচেন।

রাত্রি দশটা। ডায়েরি লিখতে লিখতে তাঁবুর বাইরে এসে দেখি কৃষ্ণা তৃতীয়ার ভাঙা চাঁদ অনেকটা উঠে গিয়েচে আকাশে—পেছনের পর্ব্বতসানুর দোকা, শালগা ও পাবড়া গাছগুলো ঈষৎ অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় কি সুন্দর দেখাচ্চে—মায়াময়, অপরূপ। এই সরু সংকীর্ণ

উপত্যকার সবটা চাঁদের আলোতে আলো হয়ে উঠেচে। কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরে, কখনও চাই তারা-ভরা আকাশের দিকে, কখনও চাই জ্যোৎস্নাস্নাত দোকা ও শালগা গাছগুলির দিকে।

আজ সকালে চা খেয়ে স্নান করে তাঁবুর সামনের পাহাড়টিতে উঠে সেই শিলাখণ্ডে বসলুম—এখুনি আজ চলে যাচ্ছি এই সুন্দর বনভূমি ছেড়ে। আবার কবে আসবো কে জানে? একটু রোদ উঠেচে, এ পাহাড়ের মাথায় সব শুকনো গাছ, শিউলি বন শুকনো, দোকা গাছ গুলো শুকনো শিউলি কি আমড়া গাছের মত, শুকনো বন-তুলসীর জঙ্গল, নিষ্পত্র শিববৃক্ষ, নিষ্পত্র গাছে হলুদরঙের গোলগোলি ফুল ফুটে আছে, কালো পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শুকনো খড় বন। কি একটা শুক্‌নো কাঁটা গাছ অজস্র—সব শুকনো গাছ এখানে, ভারি চমৎকার লাগে কালো পাথরের ওপর নিষ্পত্র শুকনো গাছের বন। ভগবানের আশ্চর্য্য শিল্প কি সুন্দর ভাবে এখানে ফুটেছে!

বেলা এগারোটাতে মোটর ছেড়ে প্রথমে পৌছুলাম মহাদেব শাল। বননিকুঞ্জের অন্তরালে পাপিয়া ও কত কি বনপাখীর কলকাকলি। বহু-কালের পুরোনো পাথরের কালী প্রতিমা। একটা খড়ের চালাঘরে শিবলিঙ্গ পোঁতা আছে—গর্ত্তের মধ্যে মাথাটুকু মাত্র দেখা যায়। বড় একটা বট গাছ, অনেক আসান ও পলাশ গাছ, কোথা থেকে আম্র-মুকুলের সৌরভ ভেসে আসছে, প্রাচীন দিনের মুনি-ঋষিদের তপোবন যেন। মেঘমেদুর প্রভাতের স্নিগ্ধ আকাশের তলে কি মনোরম ছবিই এরা রচনা করেচে! মনে হোল আরও অনেকক্ষণ বসে থাকি এখানে —কিন্তু সময় ছিল না।

মহাদেব শাল থেকে বার হয়েই দেখি বারোজ সাহেব ওর মোটরে

ফিরেচ। আমাদের দেখে নামলো। ও বল্লে মহাদেব শাল খুব পুরোনো স্থান, বারোজ এ অঞ্চলের অনেক সংবাদ রাখে। ওকে বিদায় দিয়ে আমরা আবার গাড়ীতে উঠলুম,—কোয়ালি গ্রামে সেদিনকার সেই বাড়ীটা দেখলুম, সেদিন যেখানে বসে মুড়ি খেয়েছিলুম। হলুদ-পুকুর পার হই। কালিকাপুর রেন্‌জ্‌ আপিসে মিসেস্‌ ভর্ম্মার সঙ্গে দেখা হোল। কাপড়গাদি ঘাটের কাছে দৃশ্য বড় সুন্দর—দুধারে পাহাড় ও জঙ্গল, বাঁদিক দিয়ে একটা পার্ব্বত্য ঝর্ণা বয়ে চলেচে। সামনের পাহাড়ে আর বছর একদল হাতী দেখেছিলেন—মিঃ সিন্‌হা বল্লেন। মিঃ সইয়ারের বাংলোটা পড়ে আছে রাখা মাইন্‌সে—ভূতের বাড়ী হয়ে। একটা কুল গাছ থেকে পাকা কুল পেড়ে খেলুম ভাঙা ক্লাব-বাড়ীটার পেছনে।

বাড়ী পৌঁছে চা খেয়ে নুটু, উমা ও বৌমাকে নিয়ে বুরুডি ও বাসাডেরা ঘাটের (hill pass) বনের মধ্যে মোটরে গেলুম বেড়াতে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসচে বনে, গম্ভীর দৃশ্য চারিদিকে। খডের গভীরতা প্রায় ৫০০।৬০০ ফুট—সেখানে বহু নিচে দিয়ে খরস্রোতা নদী (খরসুতি নদী, এখানকার ভাষায়) বয়ে চলেচে, আমি, নুটু, বৌমা খরস্রোতার ওপরে দাঁড়িয়ে আছি—ওপারের পর্ব্বতারণ্যে ময়ূর ডাকচে। সন্ধ্যা হোল, আমরা পাহাড় থেকে নেমে শালবনের মধ্যে দিয়ে চলে এলুম, নুটুকে গান গাইতে বল্লেন মিঃ সিংহ। আমরা সবাই সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলুম ও গান শুনলুম। তারপর ডাকবাংলোতে এসে চা খাই বৌমা, নুটু ও আমি।

পর দিন সন্ধ্যায় বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে দেখা রাজবাড়ীতে, আমি বল্লাম, হরিনা গ্রামের গভীর বনের মধ্যে যে মহাদেব শাল আছে, সেখানটা বড় সুন্দর তপোবনের মত। কিন্তু যাত্রীদের বসবার জায়গা নেই, ভাঙা

মন্দিরেরও সংস্কার দরকার। আপনি রাজসরকার থেকে ওটা করে দিন।

অমর বাবুর বাড়ী গিয়ে গল্পগুজব করলুম রাত্রে।

কোথায় ডুবলারেড়া, ঘাটশিলা—আর কোথায় বারাকপুর! এক দিনের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েচি—কোথায় চাকৃড়ি গ্রামে বাসেয়া সর্দ্দারের স্মৃতি প্রস্তর, কোথায় চরাই পাহাড়ের শিখর! কোথায় দোকা ও শালগা বন! আজ এ বারাকপুরে আম্রমুকুলের ঘন সুবাস ভরা অপরাহ্ণের বাতাসে জানালা খুলে দেখচি সামনের খুড়ীমাদের বাঁশ ঝাড়ের মাথায় রাঙা রোদ, কোকিল ও কত কি পাখী ডাকচে—আমি একা ঘরে বসে লিখচি। শুকনো বাঁশপাতা-ঝরা পথের ওপর বৈকালের ছায়া নেমে এসেচে, ঘেঁটুফুল ফুটেচে আমার উঠোনে, ওদের বাঁশতলায়, আমি বসে বসে দেখচি। কল্যাণী গিয়েচে ফকিরচাঁদের বাড়ী বৌভাতের নিমন্ত্রণ খেতে, মানু ও নগেন খুড়োর বৌয়ের সঙ্গে। এমন চমৎকার পরিপূর্ণ বসন্তের মধ্যে বারাকপুরে আসতে পারা একটা সৌভাগ্য। এত সুগন্ধ বাতাসে, এত ঘেঁটুফুল শুকনো পাতা ছাড়ানো বাঁশঝাড়ের তলায়। সকালের ঈষৎ শীতল বাতাসে যখন আম্রমুকুলের সৌরভ ভেসে আসে, পাখী ডাকে—তখন মনে হয়, একটা যেন কিছু হবে, এমন দিনের শেষে বৃহত্তর কিছু, মহত্তর কিছু অপেক্ষা করে আছে যেন—আমার ছেলেবেলাতে ঠিক এই সময় মনের অকারণ উল্লাস অনুভব করতুম এমনি ধারা।

কাল বিকেলে কুঠীর মাঠের রাস্তা ধরে আসতে আসতে হঠাৎ এসে পড়লুম শাঁখারিপুকুরে বাঁশবনের ধারে। নক্ষত্র উঠেচে আকাশে, আকাশের শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ জ্বল জ্বল করচে, আম্রমুকুলের ঘন সুবাস সন্ধ্যার বাতাসে। কতকাল আসিনি শাঁখারিপুকুরের বাঁশবাগানে—

হে অরণ্য কথা কও

ছিরেপুকুরের ওপাড়ের পথে—সেই ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের পুরাতন বাল্যদিনগুলি ছাড়া। বিশ্বশিল্পীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই পৃথিবী, এই পৃথিবীর বসন্ত, এই মানুষের মন। আমি না যদি থাকতুম, এ বসন্ত শোভা, এ শুক্লাপঞ্চমীর জ্যোৎস্না কে আস্বাদন করতো? মানুষের মনের মধ্যে দিয়ে তিনিই তাঁর সৃষ্টির লীলারস আস্বাদ করচেন। যে সমজদার, যে রসিক শিল্পীমনের অধিকারী সে ধন্য—কারণ ভগবান তার চোখ দিয়ে, মন দিয়ে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। সুতরাং সমজদারের চোখ ভগবানের চোখ, সমজদার রসিকের মন ভগবানের মন—যা সৃষ্টিমুখী হোলে একটা গোটা বিশ্ব সৃষ্টি করে ফেলতে পারে চক্ষের পলকে।

কি চমৎকার রাঙা ফুলে-ভর্ত্তি শিমুল গাছটার শোভা নদীর ধারে ফণি চক্কত্তির জমিতে! দুপুরে নীল আকাশের তলায় রোজ রাঙা ফুলগুলির দিকে চেয়ে দেখি স্নান করতে যাওয়ার সময়ে। চোখ ফেরাতে পারিনে। কাল আবার দুটো প্রজাপতি উড়ে উড়ে বসচে অত উঁচু গাছটার ফুলে ফুলে। প্রজাপতি—যার জন্ম শুঁয়োপোকা থেকে। শুঁয়োপোকা জীবন পরিত্যাগ করে প্রজাপতি জন্ম পরিগ্রহ করেচে, নীল আকাশের তলায় সৌন্দর্য্যলোকে বিচরণের অবাধ অধিকার লাভ করেচে। ঐ রাঙা ফুলে ভরা শিমুল গাছ, ঐ নীল আকাশ, ঐ উড্ডীয়মান রঙীন প্রজাপতি এ সব যেন একটা বড় দর্শনের গ্রন্থ—শুধু যে ভাষায় ঐ গ্রন্থ লেখা তা সবাই পড়তে পারে না, বুঝতে পারে না। গভীর দর্শনতত্ত্ব ও বইয়ে লেখা রয়েচে—লেখা রয়েচে আত্মার অমরত্বের গোপন বাণী, লেখা রয়েচে তার কামচর শক্তির অলেখা ইতিহাস। যে ঐ ভাষা বুঝতে পারে সে জানে।

কাল দুপুরে ছিরেপুকুরের ওপারের রাস্তা দিয়ে শাঁখারিপুকুরের

মধ্যে গিয়ে স্নানের পূর্ব্বে খানিকটা বসলুম, তারপর বাঁশবনের ছায়ায় ঝরা বাঁশপাতার পথ দিয়ে পুকুরের একস্থানে এসে দাঁড়ালুম, সেখানে ঘেঁটু ফুলের একেবারে নিবিড় ভিড়। তেতো সুবাস ছড়াচ্চে দুপুরের বাতাসে। ওখানে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে চাইতেই সেই উত্তর মাঠের রাঙা ফুলে-ভর্ত্তি বড় শিমুল গাছটা চোখে পড়লো। আমি সৌন্দর্য্যে যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়লুম, আর নড়তে পারিনে, অন্য দিকে চোখ ফেরাতে পারিনে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি হোল—সে অনুভূতি এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে, তার কথা আমি কাল সারাদিন ভুলিনি। এবং সেকথা এখানে লিখেও রাখলুম এজন্য যে এই সব দুর্লভ অনুভূতিরাজি যখন অস্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন এই ক'টি লাইন পড়লে কালকার অনুভূতির বাণী আমার মনে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অনুভূতির প্রথম কথা হোল—মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো—অভীঃ, ভয় নেই।

কিসের ভয় নেই? কোনো কিছুরই না। "ন মৃত্যু নশঙ্কা" ভগবান যুগ যুগান্তরে, কল্প থেকে কল্পান্তরে আমার এবং তোমার হাত ধরে চলেচেন, আনন্দ ও প্রেমের স্নিগ্ধ ধারার মধ্যে দিয়ে। সকল জন্ম-মরণ পার করে তিনি নিয়ে চলেচেন। জরা নেই, মৃত্যু নেই। এমন কত বসন্ত দ্বিপ্রহরে কত ঘেঁটু ফুল সুবাস বিতরণ করবে অনাগত জীবনদিনে কত গ্রামে—কত মাতাপিতার স্নেহ আদর পরিবেশিত হবে, কত ভবিষ্যৎ রাত্রির জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হবে সেই সুমধুর আয়ুষ্কালগুলি, কত কোকিল ডাকবে, কত রক্তশিমুল ফুল ফুটবে। জীবন ও জন্ম দুদিনের, ভগবান সখা ও সাথী অনন্ত কালের। জীবের ভয় কি? অবিনশ্বর তুমি, অবিনশ্বর আমি—আমরা ভগবানের চিরদিনের লীলা সহচর, ভগবান চিরদিন আমাদের লীলা সহচর।

কাল দুপুরে চিল-ওড়া নীল আকাশ থেকে এই আনন্দের বাণী নিঃশব্দে নেমে এল সেই ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে, ভগবানের নীরব আশীর্ব্বাদের মত। মন অমৃতে পূর্ণ হয়ে গেল। শিরায় শিরায় সে কি জীবনস্রোত! কি উচ্ছল রস ও আনন্দের প্রবাহ।

কথাটা লিখেই রাখলুম, যদি ভুলে যাই। অন্য কেউ যদি এর পরে পড়ে, আশা করি সে এই নৈঃশব্দ্যের বাণীর গভীরত্ব বুঝতে পারবে, তারও জীবনে এই বাণী দেবে অমৃতের সন্ধান। জয়যুক্ত হোক আম্রমুকুল ও ঘেঁটুফুল সুবাসিত এই কাননের শান্ত দ্বিপ্রহরটি।

সকালে শাঁখারীপুকুরের ধারে বাঁশবনে ঝরা পাতার ওপর বসে ছিলুম। বাঁশ বনের নীচে ছায়ায় ঘেঁটুফুল ফুটেচে, আম্র-মুকুলের সুবাসে বাতাস মদির, এখানে ওখানে মাঠে সিমুল ফুলের কি শোভা! চুপ করে বসে নলে নাপিতের আম বাগানের পুষ্পভারনত শাখা-প্রশাখাগুলির দিকে চেয়ে রইলুম। কোকিল ডাকচে, উষ্ণ মাটির গন্ধ বেরুচ্চে, শুকনো বাঁশপাতা হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে পড়চে, যেমন পড়তো আমার বাল্যকালে। ঘেঁটুফুলের তেতো সুবাসে মনের মধ্যে আমার কেমন একটা আনন্দ আনে। ত্রিনয়নী পিসিমার সঙ্গে খেলাঘরের মধুর বসন্ত মধ্যাহ্নগুলির কথা মনে হয়—ত্রিশ বৎসর আগেকার সেই অতীত ফাল্গুন দিনের বার্ত্তা এই ঘেঁটুফুলের সুবাসে খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্ট ভাবে ফিরে আসে, আমি বাঁশগাছে হেলান দিয়ে বসে অবাক ভাবে দূর রোদ-ভরা মাঠের দিকে চেয়ে থাকি।

দুপুরে বসে 'অশনি সংকেত' উপন্যাসের একটা অধ্যায় লিখি। কল্যাণী গিয়েচে ও পাড়ার পাঁচী যুগিনীর কালীমার মন্দিরে। সঙ্গে গিয়েচে বুড়ি পিসিমা ও মানু।

হে অরণ্য কথা কও

কাল পাঁচী এসে কতক্ষণ গল্পগুজব করলে। আমি এর কয়েকদিন আগে দোলের দিন রেডিও বক্তৃতা দিতে কলকাতা গিয়েছিলুম। সেখানে সুনীতি বাবু, মিঃ সিং প্রভৃতির সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কাল জগো ও ফুচুর সঙ্গে বেলেডাঙায় একটা বাবলার ডাল আনতে গিয়েছিলাম। ঘোষেদের বাড়ীর পিছনে কি অপূর্ব্ব ঘেঁটুফুলের সমাবেশ ও কি ওদের সম্মিলিত সুগন্ধ! এই ঘেঁটুফুল কেন যে আমাকে মাতিয়ে দেয়, তা কি করে বলবো! অমন ঘেঁটুফুলের সুবাস আমি এ বছর অন্ততঃ আর কোথাও দেখিনি। কোথায় লাগে সিনেমা থিয়েটার দেখার আনন্দ! ভগবানের কথা কেন যে এত মনে হয়! আইনদ্দির নাতি এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলে, সেই ছোকরা, যে স্কুলে আমার ছাত্র ছিল, সম্প্রতি গুরু ট্রেণিং পাশ করেচে। বড় চমৎকার লাগলো আজ ঐ ঘেঁটুফুলের শোভা। দুঃখের বিষয় কেউ এ সব দেখতে আসে না।

আজ অপরাহ্নে ছিরেপুকুরের ওপারে আমবাগানের তলায় ঘেঁটুফুলের ঘন বনের মধ্যে কতক্ষণ বসে রইলুম। এমন ফাল্গুন দিনে এমন ঘেঁটুফুলের সমারোহের মাঝখানে জীবনে কোনদিন কাটাইনি। চিরকালই বিদেশে কাটিয়ে এসেচি। হয় ভাগলপুরে নয় কলকাতায়, কিংবা মানভূমে, ঘাটশিলায়, ঝাড়গ্রামে। আজ বসে আছি, ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে, ফুলের ঘন সুবাসের মধ্যে। ফুলে ভর্ত্তি ঘেঁটুবন আমার চারিপাশে ঘিরে, লতাপাতার সুগন্ধ, সামনে গাছে তিন্তিরাজের আধ-ফাটা ফলের থোলো ঝুলচে, কোকিল ডাকচে। ধন্য হোক ভগবানের নাম। ধন্য হোক সেই মহাশিল্পীর শিল্পসৃষ্টি।

ক'দিন ধরে গণি ও সয়ারামের মোকর্দ্দমার বিচার করচি পল্লীমঙ্গল সমিতির অধিবেশনে। কাল রাত্রেও চড়কতলায় অধিবেশন হয়ে গেল। এ গ্রামের ঝগড়াবিবাদ মিটবে না। যত চেষ্টা করি বিবাদ থামাতে, তত আরো বেড়ে যায়। কাল বিকেলে কুঠীর বাঁধানো গাঁথুনিতে কতক্ষণ বসে রইলুম—সব শুক্‌নো লতা, পাতা, কাঠ, ডাল, ঁতুতফল ইত্যাদির গন্ধ বেরোয় এ সময়। ভারি আরামের গন্ধটা। এ পারের মাঠে কতক্ষণ বসে একটা মূর্ত্তি কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম নির্জ্জনে। সমিতির অধিবেশনের পূর্ব্বে গিরিনদার বাড়ী বসে দেবপ্রয়াগের কথা হয়। সে শুধু খাবার জিনিসের গল্প। খোয়ার লাড্ডু বানিয়ে কি ভাবে উনি পাণ্ডাদের খাইয়াছিলেন—সে গল্প। উনি বল্লেন—আবার চলো তুমি আমি বেরুই। আমি হবো স্বামিজী, তুমি প্রধান শিষ্য। ইন্দুর বাড়ীতে ইন্দু সুবর্ণপুরের দাসু বাবুর গল্প করলে। দাসু বাবু বলতো—আর কি খাই আজকাল? একটি রুই মাছের মুড়ো ও গাওয়া ঘি রোজ খাদ্য ছিল—ইত্যাদি। চড়কতলায় খুব মিটিং। মুসুরি ডালের ক্ষেতে কতটা মুসুরি খেয়েচে, তাই নিয়ে ঘোর তর্ক। সয়ারাম বলে—আড়াই মণ মুসুরি হবে। ঘোর বিবাদ।

গভীর রাত্রে খুব ঝড় বৃষ্টি। কল্যাণী বলচে, ওগো, জানালা বন্ধ করো, ভেঙে যাবে যে।

ঘুমের ঘোরে ভয়ে বলচে।

কাল খুব ঝড়বৃষ্টি বিকেলে। রাধাবল্লভের জামাই কেষ্টর বাড়ী সন্ধ্যার পরে উপনিষদ ও গীতার ব্যাখ্যা হোল। অনেক লোক শুনতে এসেছিল, সতীশ ঘোষ, মতি দাঁর ছেলে যুগল, ললিত, লালমোহন, ফণিকাকা, গজন, ফকিরচাঁদ ইত্যাদি। শান্তিপুরের এক অদ্বৈত

বংশের গোস্বামী মশায়ও উপস্থিত ছিলেন। লাল-মোহনের বাড়ীর পেছনের যে পথটা দিয়ে আমি সকালে গেলাম সে পথে জীবনে কখনো যাইনি—নতুন দেখলাম। বারাকপুরেও এমন সব জায়গা তাহোলে আছে যা আমি জীবনেও কখনো দেখিনি।

রাত এগারোটার সময় ফিরে এলুম। অনেক রাত্রে ভীষণ মেঘ গর্জ্জন, তার সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। কল্যাণী চমকে উঠেচে ঘুমের ঘোরে।

এ খাতায় অনেকদিন পরে আবার 'বনগ্রাম' কথাটি লিখচি। পাঁচ বৎসর পরে আবার বনগ্রামে বাসা করেচি—জাহ্নবীর বাসার কাছেই। আবার পুরোনো দিনের মত সকালে উঠে খয়রামারি বেড়াতে যাই, সেই গাছপালায় বাঁকে বসে দাঁতন করি। পুরোনো দিনের পুনরাবৃত্তি বড় ভাল লাগে। কোথায় ঘাটশিলার বনমধ্যস্থ হ্রদে সকালে স্নান করতে যাওয়া এই সময়ে, কোথায় নাকটি টাঁড়ের বন, ১লা বৈশাখ বরকেলা পাহাড়শ্রেণীর সামনে ভবানী সিংয়ের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে বসে চা খাওয়া, বোরো নদীতে একসঙ্গে স্নান—হরদয়াল, আমি, ভবানী, সুবোধ ঘোষ, যোগীন্দ্র সিন্‌হা—আর বছরই তো। সে কি মজা! চাঁই-বাসার সে ঘরদোর এখনও মনে পড়চে। কোল্‌হান পার্ক, মাঠা পাহাড়ের বাংলো—ইত্যাদি। কোথায় সেই চরাই পাহাড়ের শিখরদেশ। এসব থেকে কোথায় আবার সেই বনগাঁর বাসা। ঘড়ি বাজে ঢং ঢং করে, যতীন দা'র ও মন্মথ দার বাসায় আড্ডা দিচ্চি—ইউনিভার্সিটির খাতা দেখে উঠে বাজার করচি, ওপারের হাট থেকে গুড় কিনে আনচি, কয়লার দোকানে কয়লা কিনচি। এ সব জিনিস বহুদিন বনগাঁয়ে করিনি।

কাল কাপ্তেন চৌধুরীর মোটরে বিকেলে বিশ্বনাথ ও যতীন দা'কে

নিয়ে বেনাপোল হরিদাস ঠাকুরের মঠে বেড়াতে গেলুম। আজ পাঁচ বছর আগে একবার এখানে এসেছিলুম বুদ্ধদেব বাবুর সঙ্গে। আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী, মন্দিরের সামনে চাতালে বসে আমরা হরিদাসের কাহিনী পাঠ শুনচি, প্রদীপের আলোয় বিশ্বনাথ পড়চে, ওদিকে চাঁদ উঠেচে, মন্দিরের চারিপাশে ঘন বনে শান্ত স্তব্ধতা নেমে এসেচে—বড় ভাল লাগছিল। হীরা নটির মূর্ত্তির সামনেও আরতির পঞ্চপ্রদীপ ঘোরানো দেখে আমি বিস্মিত ও অভিভূত হোলাম। কার কৃপায় পতিতা আজ দেবী হয়েচে? সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপালক ভগবানের ছাড়া আবার কার কৃপায়? এক বুড়ী আছে, সে প্রণাম করে বলে—জীবই শিব। এখানে বুড়ী আছে আজ ষোল বছর। ১৩১০ সালে এই মঠ ও মন্দির তৈরি হয়। ভোলানাথ গোস্বামী বলে এক সাধক ভক্ত, বাড়ী তাঁর মামুদকাটি, স্বপ্নে আদেশ পান এখানে হরিদাসের সাধন কুঞ্জের পুনরুদ্ধারের। এখানে এসে স্থানীয় নায়েব মশায়ের সাহায্যে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এই তুলসী জঙ্গল ও আট খানা ইট আবিষ্কার করেন। তখন এখানে বাঘের আড্ডা ছিল। বুড়ীটি বড় অদ্ভুত, সে-ই এসব গল্প করলে। বড় ভক্তিমতী আর বড় বিনয়ী—বৈষ্ণব ধর্ম্ম এদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেচে, 'তৃণাদপি সুনীচেন' এই কথার সত্য ওরা জীবনে আঁকড়ে ধরেচে, পালনও করচে।

আজ বিকেলে পাঁচটার সময় কাপ্তেন চৌধুরীর গাড়ীতে গেলুম বারাকপুর। মিত্তে, মন্মথ দা, যতীন দা আমার সঙ্গে। কাপ্তেন চৌধুরী পথের পাঁচালীর দেশ দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁকে বকুলতলা, নলতে থাকীতলা, ছিরেপুকুর, পুরোনো ভিটে, বরোজপোতা, হরি রায়ের পাঠশালা—সব দেখলুম। দেখে ভদ্রলোক খুব খুশি। তারপর

ফণিকাকার বাড়ী এসে দেখি চড়কের 'শয়াল খাটা' হচ্চে। বাল্যকালে আমার মনে কি উন্মাদনার সৃষ্টি করতো এই 'শয়াল খাটা'। রামনবমী থেকে সুরু হোত, সেটা যেন একটা ফাঁকতাল্লা, তারপর চড়ক তার আনুসঙ্গিক কাঁটাভাঙা, 'শয়াল খাটা' নীলপূজো, মেলা, গোষ্ঠবিহার, সং—পরে সকলের শেষে যাত্রা বারোয়ারী। এ আনন্দের তুলনা ছিল? আজও সেই 'শয়াল খাটচে' সন্ন্যাসীর দল, গ্রামের ছেলেমেয়ে সেই ভাবে জড় হয়েচে—কিন্তু আমার মধ্যে সে আনন্দ আজ নেই। মীনা, কেতো—সবাই দেখচে বসে দেখলুম। চড়কগাছ হবে বলে একটা কি গাছও কাটা হয়েচে চড়কতলার মাঠে। বেলা পড়ে গিয়েচে। ওখান থেকে বেরিয়ে গাঙের ধার দিয়ে কুঠীর কাছে এলুম। ভাঙা কুঠী দেখালুম কাপ্তেন চৌধুরীকে, যেমন বাল্যকালে আমাদের গ্রামে যে কেউ আসুক, তাকে কুঠী দেখাবোই। রামপদকে দেখিয়েছিলুম, বামনদাস মুখুয্যেকে দেখিয়েছিলুম। আজও দেখাচ্চি ১৩১০ সাল ১৩১১ সালের পরেও। কুঠী হয়ে গেলুম মোল্লাহাটি—বেলেডাঙা, নতিডাঙার পথ দিয়ে। অনেকদিন—প্রায় ৫।৬ বছর মোল্লাহাটি আসিনি। ডাকবাংলাটাতে গিয়ে বসলুম, মেমসাহেবের গোর দেখলুম—সাহেবদের নীলকুঠীর ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় বেড়িয়ে বেড়ালুম—কোথায় আজ সেই লালমুরা, ফালমান সাহেবের দল, কোথায় তাদের বলদর্পিতা, গর্ব্বিতা মেমের দল! মহাকাল অন্ধকার আকাশে বিষান বাজিয়ে সব অবসান করে দিয়েচে।

সন্ধ্যায় ফিরে এলুম। মালপাড়ার কাছে হরিপদ দার সঙ্গে দেখা। এসে রাত্রে আবার আড্ডা।

কাল সামটাতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম সতীনাথ মিত্রদের বাড়ী।

প্রায় একমাস লিখিনি এ খাতায়। এর মধ্যে আমার স্ত্রী একটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করলে, তার শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়লো। এই সব কারণে লেখা হয়নি অনেকদিন।

কাল সামটায় যাবার পথে উলুসী গেলুম। কাপ্তেন চৌধুরীর গাড়ীতেই গেলুম। যে উলুসীতে মধুকানের বাড়ী, সেই উলুসী। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রভাতী বায়ু বাংলার পল্লী-অঞ্চলের নানা পুষ্প-সুবাসে সুরভিত। বিল্বপুষ্প, তুঁত গাছের ছোট ছোট ফুল। পথের দুধারে ফুলে ভরা সোঁদালি গাছে যেন নুইয়ে পড়চে।

কতকাল আগে মধু কান মারা গিয়েচেন, আজ এতকাল পরে তাঁর জঙ্গলে-ভরা ভিটে দেখতে প্রায় একশ বছর পরে আমরা এসেচি।

আমরা পল্লীকবির ভিটেতে দাঁড়িয়ে আছি, বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাকের মধ্যে—একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক জল নিয়ে যাচ্চে। সে মধু কানের বংশের মেয়ে। তার মুখে আমরা মধুকানের গান শুনতে চাইলুম। সে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল আমাদের। আমরা বল্লুম—মধু কানের কোনো খাতা আছে ঘরে ?

সে বল্লে—হ্যাঁ।

নিয়ে এল দুখানা খাতা। ১২৭৪ সালে মধু কান মারা গিয়েচেন। সেই সময়ের খাতা। তিনি মদ খেয়ে পড়ে থাকতেন—সেই সময় মুখ দিয়ে যা বলে যেতেন—মুহুরীরা লিখে নিত। একটি বৃদ্ধ মধুসূদনের একটি গান গাইলে।

ওখান থেকে বেলা সাড়ে বারোটার সময় চলে এলুম সামটাতে। রাধানাথ দা, ব্রজ এরা ছিল। ডাকবাংলায় মোটর পাঠিয়েছিল বল্লে আমার জন্যে। দুটি নিদ্রিত সুন্দর মুখের ছবি আমাকে সম্পূর্ণ অন্য এক ছবি মনে করিয়ে দিলে।

ওদের বাড়ীর নীচে কচুড়ী পানায় বোঁজানো ব্যাতনা বা বেত্রবতী নদী বয়ে গিয়েচে। এ নদী এখন একেবারে মজা। একসময়ে নাকি ষ্টীমার চলতো। বিকেলে নাভারণ ডাকবাংলাতে ফিরে হাট দেখতে গেলুম বিজয়কে নিয়ে। বেত্রবতী নদীর পুলটার ওপর বসে বসে ভগবান সম্বন্ধে কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতি হোল। সেই নিদ্রিত দুটি সুন্দর মুখের ছবি।

ক'দিন অতি ভীষণ গরম গিয়েচে। কাল যখন রাত্রে মন্মথদা'র বাড়ীর আড্ডা থেকে ফিরি, তখন হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে যে কি ভয়ংকর গুমট দেখা দিলে! আমার মনে হোল এ গুমটে রাত্রে মশারির মধ্যে কেমন করে শোবো। কিন্তু যেমন বাড়ী এসেছি—অমনি আকাশে মেঘ জমে বেশ এক পয়লা বৃষ্টি হোল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ জোলো বাতাসে। কল্যাণী বল্লে—বাদলা হবে। আমি বল্লাম—তা হোলে তো বাঁচি। কিন্তু আসলে বাদলা হোল না। আধ ঘণ্টাটাক বৃষ্টি হয়েই থেমে গেল।

সকাল তখনও ভাল করে হয়নি, ভাইজাগ প্যাসেঞ্জার এসে ভুবনেশ্বর দাঁড়ালো। আমি অন্ধকারের মধ্যে নেমে গিয়ে গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরদস্তুর চুক্তি করে মহাদেব বাবুকে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তুললাম। অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চলচে, পথের দুধারে নক্সভমিকার জঙ্গল। একটু পরে ফর্সা হোল, গাড়োয়ান বল্লে—এই নালাটা ছাড়িয়ে এক মাইল গেলেই উদয়গিরি খণ্ডগিরি। একটু পরেই সাদা জৈন মন্দিরটি চোখে পড়লো সামনের পাহাড়টির ওপরে। গরুর গাড়ীও গিয়ে দাঁড়ালো পাহাড়ের তলায়। ঘড়িতে দেখলাম ভোর সাড়ে পাঁচটা।

সুন্দর পরিবেশটি। সামনে বনাবৃত পাহাড়, মাটির রং লাল, বড় বড় প্রস্তর যেন মাকড়া পাথরের চত্বর। পথের ধারে একটি জৈন ধর্ম্মশালা। নিচে থেকেই দেখলুম পাহাড়ের গায়ে কাটা সরু সরু থামওয়ালা দর-দালান মত—অনেকদিন আগে নির্ম্মল বসুর তোলা ফটো এ্যালবামে উদয়গিরির এই সব গুহার ছবি যেমন দেখেছিলুম। কিন্তু পাহাড়ের ওপর গিয়ে চারিদিকে চেয়েই মনে হোল এ পাহাড় দুটির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমাকে কেউ কোনো কথা বলেনি এর আগে। পাহাড়ের ওপরটা সমতল পাষাণ বেদিকার মত। বনে বনে পাখী ডাকচে, বন্য যূথিকা ফুটে সুবাস বিতরণ করচে, মেঘমেদুর আকাশ, দূরপ্রসারী প্রান্তর, দূরে দূরে ছোট বড় পাহাড়। কত মুনিঋষির তপস্যাপূত মনোরম স্থানটি। ব্যাঘ্রগুম্ফাটি বড় চমৎকার, ঠিক একটি বাঘের মুখ খুদে বার করেচে আস্ত পাহাড় কেটে। আমরা অনেকক্ষণ একটা পাথরের চাতালে বসে তারপর নেমে এলাম নীচে। একটি বৃদ্ধা বসে আছে একটা বাড়িতে, ধর্ম্মশালার পাশে, সে বল্লে, আমি আচার, মুড়ি বিক্রি করি।

বল্লাম—কুলের আচার আছে ?

—আছে।

তারপরে যে আচার আনলে তা নুন মাখানো শুকনো কুল—তাকে আচার বলা চলে না। নিলুম না সে কুলের আচার। খণ্ডগিরিতে উঠলাম তারপরে—সেখানে নামবার পথে বনের দৃশ্য বেশ উপভোগ্য। ডাক-বাংলার বারান্দায় খেতে বসেচি, এমন সময় এল ঝড় বৃষ্টি। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেল খুব। জৈন ধর্ম্মশালায় চা বিক্রি হয় জানতাম না—সেখানে কয়েকটি লোককে চা খেতে দেখে গিয়ে বসলাম—চাও পাওয়া গেল।

আবার ভুবনেশ্বর রওনা হোলাম গরুর গাড়ীতে : পথের ধারে

শুধুই নক্সভমিকার বন, আর একটা গাছ—তার নাম মহীগাছ। সেই বনযূথিকার নাম নাকি আঁধি কলি, এখানে ও ফুল খায়। অবাধ দৃষ্টি কত দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, থৈ থৈ করচে space-এর সমুদ্রে দূরের ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির চূড়া যেন ডুবে আছে। মাটির রং রাঙা, তার পাষাণ বাঁধানো ওপরটা। গরুর গাড়ীর চাকা গিয়ে গিয়ে পাথর কেটে গিয়ে চাকার লিকের সৃষ্টি হয়েচে।

ভুবনেশ্বর পৌছুতেই ছোট বিশ্বনাথ পাণ্ডার খর্পরে পড়ে গেলুম। সে বিন্দু সরোবরের ধার থেকে আমাদের নিয়ে এল, তুললে এক ধর্ম্মশালায়। গৌরীকুণ্ডে আমাদের স্নান করাতে নিয়ে গেল—স্নানান্তে দুধকুণ্ডের জল পান করে যেমন পিছু ফিরেছি, অমনি পাণ্ডার দল ফেউয়ের মত পিছু লাগলো। কোন ক্রমে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ধর্ম্মশালায় মধ্যাহ্ন ভোজন করা গেল। তারপর মন্দির দেখতে বার হই। বহু অতীত দিনের আনন্দচ্ছন্দ যেন পাথর হয়ে জমে আছে সে বিশালকায় পাষাণ দেউলের বুকে। একটি নর্ত্তকী মূর্ত্তির কি ত্রিভঙ্গ দেহ, কি মুদ্রার সুষমা! পাষাণে খোদাই লিরিক কবিতা। নক্সভমিকার জঙ্গলে অতীতের ইতিহাস চাপা পড়ে যায় যায়। ঝম্পা সিং, উদো গজ সিংয়ের কথা জানি নে।

স্টেশনে ফিরবার পথে আবার ভিখিরির দল গরুর গাড়ীর পিছু পিছু করুণ সুরে প্রার্থনা-বাক্য উচ্চারণ করতে করতে ছুটলো প্রায় এক মাইল রাস্তা। ট্রেন আসতে দেরি ছিল। হু হু সমুদ্রের হাওয়া বইচে, আমরা শুয়ে রইলুম প্ল্যাটফর্ম্মে। চারটের সময় গাড়ী এল। ঐ দূরে উদয়গিরি, ঐ খণ্ডগিরির ওপর সাদা জৈন মন্দির। গাড়ী চলেচে—গাড়োয়াম ওবেলা দেখিয়েছিল খুরদা রোডের দুটি রাঙা কাঁকরের পাহাড়, তার ওপর দুটি গাছ—সে পাহাড় দুটো কাছে এল। খুরদা রোড স্টেশনে

আর বছরে 'ডিটেক্‌টিভ' নাটকের অভিনয়ে যে বেশ নাম করেছিল সেই ইন্দু বাবু এসে আলাপ করলেন। আবার সেই মালতীপাটপুরের নারিকেলকুঞ্জ। যেন পাপুয়া নিউ হেব্রাইডিস্-এর বেলাভূমির ছবি। পুরী স্টেশন থেকে ফিরবার পথেই বনগাঁর হরিবাবু ও তার ছেলে বামনের সঙ্গে দেখা হোল। আমরা ধর্ম্মশালায় জিনিসপত্র রেখে জগন্নাথের মন্দিরে গেলুম দর্শন করতে। ঠাকুরের সিঙার বেশ দেখলুম। মন্দিরে বাইরের চত্বরে খোলা হাওয়ায় সুমথ বাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। আর বছর আর এ বছর। সেই মন্দিরের নানাস্থানে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠকের সম্মুখে কৌতূহলী ও ধর্ম্মপিপাসু শ্রোতার ভিড়। এ দোকান ও দোকান ঘুরে সুমথবাবু খাবার জিনিস কিনতে লাগলো। রাত ন'টার পরে ফিরি। একসঙ্গে খেতে বসি—গৌরীশঙ্কর, সুমথ ও মহাদেব বাবু। ওরা রাত্রেই চলে গেল।

নীল সমুদ্র! আবার সেই উত্তালতরঙ্গময় নীল সমুদ্রের গর্জ্জন!

সকালে উঠে প্রথমেই গেলুম হরিদ'ার বাড়ী, বামন বল্লে, তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমি আর বছরের সেই বালিয়াড়ি ও শাল গাছ-গুটির পাশ দিয়ে কতবার মঠে গেলুম, সেই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি আবার দর্শন করলুম। পুরুষোত্তম মঠে সেই স্বামিজীর ধর্ম্মোপদেশ শুনলুম। ফিরবার পথে ভূপেন সান্ন্যালের বাড়ী গেলুম। তাঁর স্ত্রী জলখাবার খাইয়ে তবে ছাড়লেন।

বড় রোদ চড়েচে। বালিয়াড়ির পথে আবার যাত্রা। সেই পলং গাছ পথে পড়লো। ধর্ম্মশালায় ফিরে আর বছরের মত খিদেতে ছট-ফট্ করি। একটা বাজে, তিনটে বাজে, কোথায় মহাপ্রসাদ? এই আসে, এই আসে—কিছুই না। বীরেন রায় মশায় এলেন—আমরা

আহারান্তে বসে গল্প করি। জানালা দিয়ে দেখি বাঁদিকের জানালায় ঢেউ সঙ্কুল নীল সমুদ্র, ডানদিকের জানালা দিয়ে চোখে পড়ে জগন্নাথ দেবের বিশাল মন্দিরের চূড়া—পুরীর দুই বিরাট বস্তু।

কাকে ফেলে কাকে রাখি কেহ নহে ঊন। বিকেলে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়াজেদ আলি ও অমিয় চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা করে সমুদ্র তীরে অনেকক্ষণ বসে বসে হরিদা ও বীরেন বাবুর সঙ্গে চীনা বাদাম খেতে খেতে জ্যোৎস্নালোকে গল্প করি। ওখান থেকে উঠে ধর্ম্মশালায় এসে দেখি 'দেশ' সম্পাদক বঙ্কিম সেন ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করবেন। হরিদা'কে নিয়ে এসে বসালুম সভায়।

অনেক রাত পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নালোকের সমুদ্রের শোভা দেখি ছাদ থেকে। জগদ্বন্ধু আশ্রমের স্বামিজী পরিমল দাস ও আর একটি ছাত্র এসে গল্প করলেন। স্বামিজী একখানা বই দিলেন পড়তে—প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনী। পুরীতে একটা সুবিধে, সব সময়েই ভগবানের কথা বলবার লোক মেলে। অনেক রাত হয়েচে, ঘুম আসে না চোখে। গরম নেই, হুহু সমুদ্রের হাওয়া, শেষ রাত্রে বেশ শীত ধরিয়ে দিলে।

সকালে উঠে হরিদাস মঠে গেলুম ও মলয়াবাস বলে একটা বাড়ীতে হরিদা'র সঙ্গে বসে চা খাই। প্রসাদ আসে না তখন সবাই খোঁজ নেয় কেন প্রসাদ এল না। বেনারাস হিন্দু বিশ্ববিত্তালয়ের জনৈক অধ্যাপক বেশি রকম খবর করলে। ভোগ কিনে খেলুম আনন্দ বাজার থেকে। পুরীর বাসনের দোকান থেকে একটা ঘটি কিনে পাইকপাড়া রাজবাড়ীতে সভা করি। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ছিলেন। চমৎকার জ্যোৎস্না ছিল। সুখময় বাবুর বাড়ী চা খেতে গিয়ে নিরাশ হলুম। সেই সময় এল ঝড় বৃষ্টি। শেষ রাত্রে ফস্‌ফরাসের

দীপ্তি বিশিষ্ট আলোকোৎক্ষেপী ঢেউ যেন জ্বলচে অন্ধকারে। আমরা বিছানা ঘাড়ে করে স্টেশনে এলুম। ভোর বেলা ট্রেণ ছাড়লো।

সারাদিন ট্রেনে, মাঝে মাঝে ভিড় হয়, মাঝে মাঝে ভিড় চলে যায়। কটক স্টেশনে কতকগুলি রাজবন্দী নেমে গেলেন, এঁরা বহরমপুর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আসচেন। একজনের নাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, এঁরা ন' পুরুষ হোল উড়িষ্যায় বাস করচেন, পূর্ব্বে বাংলা দেশে বাড়ী ছিল। ভদ্রক ষ্টেশনে স্নান করলুম কলের জলে, তখন বেলা সাড়ে তিনটা। ধানমণ্ডল স্টেশন ছাড়িয়ে কেবল পাহাড়, সামনে ও দূরে। মাটির রং লাল, অনেক মনসাগাছ জঙ্গলে, ঝাটিজঙ্গলের বড় শোভা। যাজপুর রোডের কাছে এসে আমার মনে হোল এবার চক্রধরপুরের সমান্তরাল রেখায় এসে পৌঁছেচি—তখুনি একটা লোক বল্লে—এখান থেকে চাঁইবাসা চক্রধরপুর রোড আছে—এই দেখুন সেই রাস্তা। একটু পরে বৈতরণী নদী পার হলুম, সন্ধ্যার কিছু আগে সুবর্ণরেখাও পার হওয়া গেল। এই শেষ বড় নদী এ লাইনে। আগে সুবর্ণরেখা, তারপর বৈতরণী, তারপরে ব্রাহ্মণী, তারপরে মহানদী, তার পরে কাটজুড়ি। আর কোনো নদী নেই এদিকে। আর যা আছে যে সব অনেক দূরে—যেমন গোদাবরী রাজমাহেন্দ্রিতে।

খড়গপুর স্টেশনে ট্রেণ এল রাত এগারোটা। মেচেদা স্টেশনে এল বৃষ্টি। ভোরবেলা আবার বৃষ্টি এল সাঁৎরাগাছি স্টেশনে। ননীর সঙ্গে দেখা করবো বলেই এখানে নামলাম।

পুরী থেকে এলুম শুক্রবার, শনিবার গেলুম গোপালনগরে হাজারি প্রামাণিকের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের নিমন্ত্রণে। শশীর মুহুরী ও আমি এক সঙ্গে বসলাম বাড়ীর ভেতর। জিতেন দফাদার বল্লে—কি রকম,

পুরীর লোক এখানে কেন? এখানে কেমন বারোয়ারী যাত্রা হয়ে গেল, আপনি ছিলেন না।

ওরা ভাবলে আমি না জানি কতদিন পুরী গিয়ে ছিলাম।

বৌভাতের নেমন্তন্নে বেশ ভালই খাওয়ালে এ বাজারে। লুচি, পোলাও, মাছের কালিয়া, মুড়িঘণ্ট, ছ্যাঁচড়া, চাট্‌নি, দই, পায়েস, সন্দেশ, রসগোল্লা, আম, কাঁটাল। হাজারি বল্লে—তোমায় বরযাত্র নিয়ে যাবার বড় ইচ্ছা ছিল ভাই। আমি দুঃখ প্রকাশ করলুম। পুরীতে ছিলাম, কি করবো। খাওয়ার পরে সেকেন পণ্ডিত ও মল্ল বাইরে এসে বসে কতক্ষণ গল্পগুজব করলে। স্কুলের চাকুরীর নিয়োগপত্র দিলে মল্ল। ২৬শে জুন চাকুরীতে যোগ দিতে হবে। আমার ইচ্ছে নেই, কিন্তু ওরা ছাড়ে না, কি করি।

বাহাদুর ও আমি হেঁটে চলে এলুম বেলা তিনটার সময়। কাল গিয়েছিলুম আবার হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ীতে বেনাপোলে। কাপ্তেন চৌধুরী ডাকবাংলা থেকে লোক পাঠিয়ে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন। ওঁর জিপ্‌ গাড়ী কাল কলকাতা পাঠানো হচ্চে সারানোর জন্যে, তাই আজ আমাকে নিয়ে চল্লেন হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ীতে। আশ্চর্য্য ঠিক সেদিন যে সময় ভদ্রক যাচ্চি বালেশ্বর থেকে, আজ সেই সময় বনগাঁ থেকে বেনাপোলে চলেচি। পুরীতে দেখে এসেছি সেদিন এই মহাপুরুষের সমাধি, আজ যশোর জেলার একটা অজ পাড়াগাঁয়ে বাঁশবন ঘেরা ক্ষুদ্র জায়গাটিতে তাঁর সাধন স্থান দর্শন করলুম। সন্ধ্যায় চাঁদ উঠলো, আরতি আরম্ভ হয়েচে, গুমট গরম। বেশ লাগচে এই পবিত্র নিভৃত তপোবনটি। যশোর জেলার গৌরব যে অত বড় মহাপুরুষ একদিন এখানকার মাটিতে জন্মেছিলেন, এখানকার জলে বাতাসে পুষ্ট

হয়েছিলেন। নদীয়ায় যেমন শ্রীচৈতন্য, ঠিক তেমনি সময়ে পাশ্ববর্ত্তী জেলায় হরিদাস ঠাকুর।

সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে লিচুতলায় জ্যোৎস্নায় বসে মিতে, যতীন দা, শিবেন দার সঙ্গে আড্ডা দিলুম।

গোপালনগর থেকে প্রতিদিন মাঠের পথ ধরে যাতায়াত করি। আউশ ধানের ক্ষেতে বড় বড় ধানের সবুজ গোছা, গাছের মাথায় মাকাল লতার বড় ঝোপ, পাখীর ডাক—এসবের মধ্যে দিয়ে বিকেলে স্কুল থেকে ফিরি। সেদিন মেঘমেদুর সন্ধ্যায় নদীর জলে গা ধুতে নেমেছি, সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই, কুঠীর দিকে চেয়ে দেখি যতদূর চোখ যায়, মেঘলা আকাশ নেমে উবুড় হয়ে রয়েচে সবুজ মাঠের ওপরে।

কিন্তু যে দৃশ্যটা আমায় মুগ্ধ করলে, সেটা হচ্চে এই—সাঁইবাবলা গাছের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকী পোকা জ্বলচে নিবচে। তখনও রাতের অন্ধকার নেমে আসেনি, অথচ জোনাকির হুল থেকে বেশ আলো ফুটেচে। সে যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ভগবানের হাতের শিল্প আইডিয়ারূপী ব্রহ্মের প্রকাশ এর প্রতি রেণুতে রেণুতে···এ সত্যি দেখবার মত জিনিষ। কতক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। আজ পাড়াগাঁয়ের অখ্যাত, নিভৃত কোণে, এই মেঘভরা বাদল সন্ধ্যায় এতবড় সৌন্দর্য্য কারও দেখবার অপেক্ষা রাখচে না। এ আপনাতে আপনি মহান। এ জানিয়ে দেয় যে বিশ্বশিল্পীর চিত্রের পটভূমি হিসেবে বিশ্বের সকল স্থানই মহিমময় পবিত্র,—তাঁর নীরব বাণী এদের বাতাসে, ধূলিতে, পত্রের মর্ম্মরে, এই জোনাকী পোকাগুলোর জ্বলন্ত নিবন্ত আলোকপুঞ্জে।···

সেই বারাকপুরের মেঘমেদুর দিনগুলি। বড় ভাল লাগে এরকম

দিন। ঝোপে ঝোপে মটর লতায় থোলো থোলো বুনো আঙুরের মত মটরফল ঝুলচে। ওপাড়ার ঘ'..ট ঘোলা নদীজল যেখানে তীরের ঘাসবন ছুঁয়েচে, সেখানে এমনি এক ঝোপে কি সুন্দর সাদা সাদা ঈষৎ সুগন্ধ ফুল ফুটে আছে, তার পাশেই সেই মটর লতায় মটর ফল তুলচে! কয়েকদিন ধরে সকালে ও পাড়ার ঘাটে বেড়াতে যাই খুব ভোরে। রোজ সকালে সেই ফুলে-ভর্ত্তি ঝোপটির সামনে দাঁড়িয়ে ওপরের সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকি। ভগবানের আবির্ভাব এই নব প্রভাতের সজল বর্ষাশ্যামল বননিকুঞ্জে, ঐ দূরবিস্তৃত বননীল দিগন্তরে, মেঘলা সকালে শাখায় শাখায় বনবিহঙ্গের কল-কাকলীতে।

কলকাতায় মেসে থেকে যখন চাকুরী করি স্কুলে, তখন সুদীর্ঘ তেরো বছরের মধ্যে এই সব দিনে বারাকপুরের বর্ষাসিক্ত বনঝোপের বিরহ আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতো। বাল্যে কত খেলা করেছি আমি কালী, ভরত, কচা এই বনতলে ঝোপের ছায়ায় ছায়ায়। কত কি পাখীর গান শুনেছি। কত পাকা মাকালফল তুলে এনেছি উত্তর মাঠের বন থেকে, শাঁখারীপুকুরের ধারের গাছপালার ওপরে-ওঠা। মাকাললতা থেকে—মনে হোত সেই রহস্যময় বিচিত্র বাল্য মনোভাব, সেই ঝোপের তলায় বেড়ানো, তখন বোধহয় বনপরীরা সঙ্গে নিয়ে খেলে বেড়াতো—বুঝতাম না সংসারের কিছু, বুঝতাম শুধু তেলাকুচোর ফুল, বনকলমীর ফুলের বাহার হয়েচে কোন ঝোপে, কোথার টুকটুকে মাকাল ফল ঝুলচে কোন গাছে—এই সব। বনপরীদের সঙ্গী ছিলাম তখন! মনে এতটুকু ধূলো মাটি লাগেনি সংসারের। কি অপূর্ব্ব আনন্দে মন মেতে উঠতো যখন দেখতাম গাছে থোলো থোলো পটপটির ফল ফলে আছে। এ সব ফল খাওয়া যায় না, পাখীরও অখাদ্য কোনো

কোনো ফল। সুতরাং রসনা তৃপ্তির লোভ নয়—এ সব ফলে খেলা হয় এইটেই ছিল তখন বড় কথা। দেখতে ভাল লাগে এইটেই ছিল বড় আনন্দের উৎস। খেলা আর আনন্দ। লীলাই সবচেয়ে বড় কথা। সেক্‌স্‌পীয়র বুঝেছিলেন, তাই বলেচেন, "The play is the thing"... play! লীলা, খেলা। সংসার শাশ্বত মানবাত্মার লীলাভূমি : এখানে তারা আসেনি ঘরবাড়ী বানাতে, আসেনি ব্যাঙ্কে অর্থ জমাতে, আসেনি রায়বাহাদুর হয়ে, 'সার' হয়ে মোটর চড়ে বড় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেকটর হতে। ওসব তাদের মনের ভুল, মায়া অথবা মোহ। নিজের রূপটি ভুলে যায় তাই ওসব করে।

তারপর যা বলছিলুম। ওই সব বাল্যসঙ্গী, বননিকুঞ্জ, ফুলফল, নদীতীরের সাঁইবাবলা ও কুঁচলতার ঝোপ, সূর্য্যাস্তের রাঙা আভা-পড়া বেলেডাঙার মরগাঙ, বিলের টলটলে জল—এদের ছেড়ে কলকাতার অপকৃষ্ট এঁদো-পড়া মেসবাড়ীয় নোংরা ঘরে বিদ্যার্জ্জন ও চাকুরীর জন্যে বাস করে কি কষ্টই না পেতুম! মনপ্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো। ভাবতাম, এমন দিন কি কখনো আসবে না যখন আবার দেশে ফিরে যাবো? গ্রামে বর্ষাকাল কখনো কাটাইনি। বাল্যদিনের পরে চিরকালই স্কুল বোর্ডিংয়ে, কলেজ হোষ্টেলে ও মেসে কাটচে ১৯১২ সালের পর থেকে। কখনো কি আবার ঢল-নামা বর্ষার ইছামতীর ধারে কালো বনশিমলতার ঝোপের ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসবো না মনের আনন্দে, আর কি কখনো শুনবো না কুঞ্জে কুঞ্জে পত্রমর্ম্মর, গাঙশালিক ও কুকো পাখীর ডাক, বাঁশঝাড়ে জড়াপটি পাকানো বাঁশের কট্‌কট্‌ শব্দ?

এতকাল পরে সে স্বপ্ন আবার সার্থক হয়েচে, ফিরে পেয়েছি বাল্যকালের সেই বর্ষাসজল, শ্যামল দিনরাতের স্বপ্ন···স্বপ্ন···! আজও

তেমনি মটরলতা ঝোলে ইছামতীর তীরে বনে বনে, তেমনি পাখী ডাকে, তেমনি সুবাস বেরোয় নাটাকাঁটার হলুদ রংয়ের ফুলের থোকায় থোকায়। বিশ্বের অধিদেবতা যেমন সত্যি, ওরাও তেমনি সত্যি, শাশ্বত সুন্দর। মরে না, ঋতুতে ঋতুতে পুনরাবর্ত্তিত হয়, নবরূপে ফিরে আসে—যুগ যুগ ধরে চলচে ওদেরও লীলা।

"The play is the thing..."

ইচ্ছে আছে এবার একটা বইয়ে হাত দেবো—নাম দেবো তার 'ইছামতী'। বড় উপন্যাস। তাতে থাকবে ইছামতীর ধারের গ্রামগুলির অপূর্ব্ব জীবন প্রবাহের ইতিহাস—বননিকুঞ্জের মরাবাঁচার ইতিহাস, কত সূর্য্যোদয়, কত সূর্যাস্তের নিষ্কিঞ্চন, শান্ত ইতিহাস।

কালই জন্মাষ্টমীর ছুটিতে কলকাতায় গিয়েছিলুম, অতুলকৃষ্ণ কুমার মহাশয়ের মোটরে কাল সারা সকালে ঘুরে বেড়িয়েছি। বাণী রায়দের বাড়ী গেলুম, দেবেন ঘোষ রোডের মেস থেকে পুত্র শোকাতুর ভদ্রলোকটিকে নিয়ে মোটরে করে দু এক জায়গায় ঘুরলাম। কলকাতায় বেশিদিন আর থাকতে পারিনে—ভাল লাগে না।

সজনী দাস এখানে নেই, ভাগলপুরে গিয়েচে বেড়াতে।

কাল স্কুল থেকে ফিরলুম মাঠের পথ দিয়ে। কি কালো নিবিড়কৃষ্ণ মেঘ করেচে সেই অপূর্ব্ব ঝোপটির পেছনে মুচিপাড়ার দিকের আকাশে! একটা তেলাকুচো পাতার মস্ত বড় সবুজ ঝোপ আছে এ মাঠে। মস্ত তেঁতুল গাছ বেয়ে ঝোপটা উঠে গাছের মাথা ঢেকে দিয়েচে ঘন সবুজ পাতার উত্তরচ্ছদে।

আমি যখনই এপথে স্কুলে যাই, তখনি দেখি এই ঝোপটা। মনে-মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি একদিন এই ঝোপের মাথাটা

সাদা সাদা ফুলে ভরে দিও আমি দুবেলা স্কুলে যাওয়া আসার পথে দেখতে দেখতে যাবো। কি সুন্দর দেখাবে তখন, ভাবলেও আনন্দ হয়। কাল কোথায় যেন দেখলুম রেললাইনের ধারে কোন ঝোপে বনকলমী ফুল ফুটেচে। কিন্তু আমাদের গ্রামের মধ্যে যে যে ঝোপে বনে বনকলমীর ফুল ফোটে সেখানে গিয়ে দেখেছি, কোথাও ফোটেনি। এই শ্রাবণের শেষের দিকেই কিন্তু ও ফুল ফোটে।

আজ দেখি একটা বনবিড়াল ঝোপের তলা দিয়ে কালু মোড়লের ধান খেতের দিকে যাচ্চে। বেশ বড় বনবিড়াল, লেজের দিকটা ডোরা কাটা কাটা। আমি দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলাম, একদৃষ্টে দেখতে লাগলুম, সাড়া পেলেই লেজ তুলে এখুনি দৌড় দেবে। মিনিট খানেক পরে দিলও তাই, কি করে আমার উপস্থিতি অনুভব করতে পেরেচে। একদৌড়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হোল।

বাড়ি এসে চা খেয়ে মেঘলা বিকেলে বাঁশবনের দিকে বারান্দায় ইজি চেয়ার পেতে আরাম করে বসে প্রিষ্টলির 'Good Companions' পড়ি। কয়েক পাতা পড়তে না পড়তে বৃষ্টি বলে আর কোথায় আছি। সেই যে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো, চললো সারারাত।

আজ খুব ভোরে কল্যাণী ও আমি বৃষ্টির মধ্যে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম। শ্রাবণ মাসের ঘন বর্ষার প্রাতঃকাল, সে যে কি শোভা হয়েচে উত্তর মাঠে, কি কালো কালো মেঘ বড় শিমুল গাছটার মাথায়, মাঠ ভরে গিয়েচে বৃষ্টির জলে, মাঠের ধারের ঝোপে ঝোপে নাকজোঁয়ালে ফুল (gladiosa lily) ফুটে আলো করে আছে। এই বর্ষাভেজা হাওয়ায় মুক্তির স্বপ্নলোকে মন উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে··· যে মুক্তি মেলে এমনি মেঘকজ্জল শ্রাবণদিনে টুপটাপ জল-ঝরা ছাতিম বনে, নটকান ফুলের বনে, পাপিয়ার ডাকে, দোয়েলের ডাকে।

(আজ ভোরে যখন শুয়ে আছি বিছানায়, কি চমৎকার পাপিয়া ডাকছিল!) সেই বৃষ্টির এক হাঁটু জলে আকাশভরা কালো মেঘের তলে দাঁড়িয়ে মনে হোল ঋষিদের সেই পবিত্র গাথা:—

স্বজিয়া বিশ্ব করিয়া পালন প্রলয়ে নাশেন যিনি
শোভনা বুদ্ধি আমা সবাকার প্রদান করুন তিনি।

ছুটির দিনটা। সারাদিন বৃষ্টি হয়নি। হাজরী জেলেনী সকালে টাটকা রিটে মাছ দিয়ে গেল গাঙের। এখন ঘোলা জলে অনেক মাছ পাওয়া যায়, তার মধ্যে বেলে মাছ আর চিংড়িই বেশি। রিটে মাছ খুব তেলালো সুস্বাদু মাছ, ইছামতী ছাড়া অন্য কোন নদীতে বড় একটা পাওয়া যায় না। দেড় টাকা সের। যুদ্ধের আগে যে মাছ ছিল পাঁচ আনা সের, এখন তাই দেড় টাকায় পাওয়া ভার। কল্যাণী কাঁচা মাছ তেলঝোল করে বড় চমৎকার। আজও তাই করলে, আর ঢেঁড়স ভাতে। সাড়ে বারোটার সময়ে কল্যাণী ও আমি নদীতে স্নান করতে নামলাম। কি সুন্দর মাকাল লতার ঝোপটা জলের ধারে। নাটাকাঁটার একটা সুগন্ধি ফুল তুলে কল্যাণীর হাতে দিলুম, ও খোঁপায় গুঁজলে।

বিকেলে হাবু ও ফুচুকে নিয়ে অপূর্ব্ব রঙীন আকাশের তলায় বাঁওড়ের ধারের বট অশথ গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলে গেলুম মরগাঙে। অনেকদিন এদিকে আসিনি। পথে পথে সবুজ ঝোপ ঝাপের কি ভরপুর সৌন্দর্য্য! বাঁওড়ে জল বেড়েচে অনেক, ডাঙার কাছে জলি ধানের ক্ষেতে বকের দল চরচে, ওপারের অস্তদিগন্তের পটভূমিতে পাটক্ষেতে চাষারা পাট কাটচে, কোথাও কোথাও জলিধান কাটচে, মাড়ল-গাজিপুরের কাওরারা শুওরের পাল চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে বাঁওড়ের কাঁদায় কাঁদায় (কাঁদা=তীর), শুওরের পাল মাটি খুঁড়ে মুথো ঘাস

তুলে খাচ্চে, কচু তুলে খাচ্চে, টাটকা মুথো ঘাসের শেকড়ের সুগন্ধ বেরুচ্চে।

মরগাঙের ধারে গিয়ে দেখি ফণিকাকা ইন্দু রায় মাছ ধরে ফিরচে। আমরা বল্লাম, কি পেলে?…ওরা ভাঁড় দেখালে। কিছুই পাইনি। কাঠের বড় কষ্ট হয়েচে, আমি এক বোঝা শুকনো কাঠ কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড় করলাম। শুকনো বটের ডাল, যাঁড়ার ডাল, তিত্তিরাজের ডাল। কুঠীর মাঠের পথে এসে নিবারণের বেগুন ক্ষেতের নিচে নদীতে স্নান করতে নামলুম। মাধবপুরের চরের ওপর আকাশের কি অদ্ভুত ইন্দ্রনীল রং! তারই পটভূমিতে বড় একটা সবুজ শিমুল গাছ, কাশবন, আউশ ধানের ক্ষেত মায়াময় দেখাচ্চে। নদীজলে সেই অদ্ভুত নীল রংয়ের প্রতিচ্ছায়া।

চাটগাঁ থেকে রেণুর পত্র পেয়েছি কাল। ওর সঙ্গে যোগ এতদিন পরেও ঠিক বজায় আছে। কোথায় চলে গিয়েচে খুকু, কোথায় গিয়েচে সুপ্রভা।

•

দুদিন মোটে বৃষ্টি নেই। খরতর রোদে পুড়ছি। কাল বহুকাল পরে নদীর ধারে পুরানো পটুপটি তলায় বেড়াতে গিয়ে জলে নেমে কলমীশাক তুলে আনলাম। আমার বাল্যকালে এখানে সায়ের ছিল, আইনদ্দি কয়াল ধান মাপতো। তারপর বহুদিন মনু রায় এ জমি বন্দোবস্ত নিয়ে এখানে পটলের ক্ষেত করে। নদীর বাঁকের এ জমির সে অপূর্ব্ব শোভা নষ্ট করেচে, বাল্যের সে মটরলতা দোলানো শোভাময় ঝোপঝাপ সেই নিভৃত স্বপ্নভরা লতাবিতান কুড়ুলের মুখে অন্তর্হিত হয়েচে বহুকাল, কেন? না, মনু রায় বা তার পুত্রপরিবার পটল ভাজা খাবে। এখন আর সে পটলের ক্ষেত নেই। তাই বেড়াতে গিয়েছিলাম।

নদীর ধারে (একটা ছোট বিছে যাচ্চে, দেওয়াল বেয়ে উঠচে, কেন ওটা মারবো ?) গিয়ে দাঁড়াই। পারে পাটকিলে ও খাঁটি সিঁদুরে রঙের মেঘের ছটা ঠিক সূর্য্য কিরণের ছটার মত অর্দ্ধেক আকাশ জুড়ে বিরাজ করচে। যেন কোনো বিরাট পুরুষ অনন্ত, অসীম, বিরাট বাহু প্রসারিত করে সারা ব্যোম ছেয়েচেন। সেই অনাদ্যন্ত বিরাট পুরুষ যেমনি ঐ ক্ষুদ্র পুষ্পিত লতার মধ্যে প্রাণরূপী, তেমনি আবার ধারণাতীত বিরাটত্বের, বিশালত্বের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান। তেঁতুলতলার ঘাটে নদীর দিকে ঝোপটাতে সেই লতাটাতে সাদা সাদা ফুল দুলচে, মটরলতার ফলের থোলো ঝুলচে—শ্রীঅরবিন্দের কথায়, "সচ্চিনানন্দ যেমন বল্মীকস্তূপে, তেমনি সূর্য্যমণ্ডলে।" 'সূর্য্যমণ্ডলে' কথাটা তিনি বলেন নি, বলেচেন "in the system of suns" অর্থাৎ বহু বিরাট সূর্য্যাকার নক্ষত্র সমূহ দ্বারা গ্রথিত কোন বিশ্বে।

মুক্তি ! মুক্তি ! মনের মুক্তি ! আত্মার মুক্তি ! এই সন্ধ্যায় সীমাহীন আকাশের দিগন্তলীন অভ্র বাহু যে দেবতার ছবি মনে আনে, তিনি আর তাঁর এই শ্যামল বর্ষাপুষ্ট বনকুঞ্জ সুবাসিত লতাপুষ্প মুক্তি দিতে সমর্থ।

কিন্তু মুক্তি নিচ্চে কে ? সবাই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ব্যস্ত। হে বদ্ধ জীব, সন্ধ্যার আকাশতলে দাঁড়িয়ে সেই পরিপূর্ণ, অবাধ সেই মুক্তির বাণী শ্রবণ কর। একমুহূর্ত্তে বদ্ধতা ছুটে যাবে, (অর্থাৎ দূরে যাবে) অমরত্ব নেমে আসবে প্রাণে মনে।

কাল রাত্রের ভীষণ গুমট গরমের পরে আজ নদীতে নামলুম স্নান করতে। অমনি ওপারের চরের দিকে চেয়ে দেখি নবনীল নীরদপুঞ্জ দিগন্তের নিচে থেকে ঠেলে উঠে ঝড়ের বেগে উড়ে আসচে এপারের দিকে,

ভগবানের স্নিগ্ধ করুণার মতো। কেউ কি দেখেচে এমন কাজল কালো মেঘের সজল অভিযান, ঘন মেঘমালার এলোমেলো আলুথালু হয়ে উড়ে আসার এ অপূর্ব্ব দৃশ্য? আমার মনে পড়লো ভাগলপুরে আজমাবাদ কাছারিতে এই ভাদ্রমাসেই আমি একবার এ দৃশ্য দেখেছিলাম, সেও এই রকম সকালবেলা। বেনোয়ারী মণ্ডল পাটোয়ারিকে ডেকে তাড়াতাড়ি দেখালাম সে দৃশ্য। আর কাকে দেখাই? সেখানে আর কেউ ছিল না। বেনোয়ারি মণ্ডলকে প্রকৃতি রসিক বলে আমি ডাকিনি, কাউকে ডেকে ভালো জিনিসের ভাগ দেবো বলেই ডেকেছিলাম, মনে আছে বেনোয়ারি উড়ন্ত মেঘপুঞ্জের দিকে খানিকটা চেয়ে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে বল্লে—হাঁ, বাবুজি, আচ্ছা হ্যায়। এইমাত্র সংক্ষিপ্ত comment করে সে এই বাতুল বাংগালী বাবুর পাশ কাটিয়ে কাছারি ঘরে খতিয়ান লিখতে ঢুকলো।

আজ কেন্ ওই মেঘপুঞ্জের দিকে চেয়ে আমার চোখে জল এল তা কে বলবে? ভগবানের কথা মনে করেই চোখে জল এল কি? তাঁর অসীম দয়ার কথা স্মরণ করেই কি?

হয়তো হবে।...

কিন্তু এ সম্পূর্ণ অকারণ। আমি কি জানি নে এমন খর, উষর মরুভূমির দেশের কথা যেখানে মাসের পর মাস কেটে যায় ১২০°।১২৫° ডিগ্রি উত্তাপের মধ্যে, সারা বছরের মধ্যে যেখানে এক বিন্দু বারিপাতের সুদূর সম্ভাবনাও থাকে না!

তবু ভগবানের দান, ভগবানের দান। সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব দেশে তাঁর অসীম করুণার দানকে যেন মাথা পেতে নিতে পারি। প্রাকৃতিক কারণে মেঘ সঞ্চিত হয়েচে আকাশে, উড়ে আসচে উর্দ্ধস্তরের

বায়ুস্রোতে—এর মধ্যে 'ভগবানের দান' কি আবার রে বাপু? যতো সব সেন্টিমেণ্টাল ন্যাকামি!

হে অনন্ত, হে অসীম, হে দয়াল তোমার বহু দূত, বিশ্বের সব দেশে কত চর—সবকিছুর পিছনে তোমার প্রকাশ, তোমার মহান অভ্যুদয়—এ সত্যকে যেন না ভুলি। সব রকম দানকে যেন তোমার হাতের অমৃত পরিবেশন বলে মেনে নিতে পারি।

আজ সকালে উঠলাম। মনে খুব আনন্দ। হয়তো বা শরতের রোদ ফুটবে খুব। পট্‌পটি তলার সায়েরে গেলুম নদীর ধারে, পূর্ব্বদিকে সামান্য কিছু মেঘ, আকাশ মোটামুটি বেশ পরিষ্কার। ওপাড়ার ঘাটে মুখ ধুয়ে ওপারের শোভা দেখি একমনে। সেই সাঁই বাবলা গাছথেকে মটরলতা দুলচে, সেই সাদা ফুলে ভরা লতায় কিছু কিছু ফুল এখনও দেখা যাচ্চে। একটা নৌকো এসে লেগেচে—ছইওয়ালা নৌকো।

বল্লাম—কোথাকার নৌকো গো?

—আজ্ঞে বাবু, বাজিতপুরের।

—সে কোথায়?

—মাজদে'র সন্নিকট।

—কি কিনবে?

কাপড় কিনতে এসেচি গোপালনগরের বাজারে।

—কবে সেখানে গিয়ে পৌঁছোবে?

—আজ বেলা বারোটায় ছাড়লে কাল সন্দের সময় নৌকো আমাদের ঘাটে লাগবে।

বাড়ী আসতেই বৃষ্টি নামলো। সে কি ঝম্‌ঝম বৃষ্টি! দুটি ঘণ্টা ধরে এক ঘেয়ে অবিরাম ভন্না বৃষ্টি! 'ভন্না' মানে অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টি।

হরিবোলার ছেলে নীলু এল একটা পাকা তাল নিয়ে। বেশ সুন্দর তালটা। হাবু বসে 'ঊর্মিমুখর' পড়তে লাগলো। নীলু পড়তে লাগলো 'পথের পাঁচালী'।

আজ ওবেলা কলকাতায় যেতুম ১১টার ট্রেনে। কিন্তু যে বৃষ্টি। তা ছাড়া গুরুদাস ঘোষের ছেলের বিয়ের বৌভাতে নিমন্ত্রণ আছে দুপুরে। সে বিশেষ করে ধরেচে, না গেলে চলবে না।

কল্যাণী চিঁড়ে দই আমসত্ব দিয়ে কলা দিয়ে ফলার মেখে নিয়ে এল। এর যা আস্বাদ, কলকাতায় এ রকম পাওয়া যাবে না। ঘরের পাতা দইও নেই সেখানে। টাটকা চিঁড়েও পাওয়া যায় না সেখানে। এখানে গোলার ধানের চিঁড়ে, যত ইচ্ছে খাও।

কাল বিকেল চারটার সময় উড়ে-আসা নীল মেঘের কোলে কোনো সাদা মেঘ খণ্ডের দৃশ্য আর তার নিচে মেঘের ছায়ায় কালো গোপালনগরের বাঁওড়ের দৃশ্য আমায় একেবারে মুগ্ধ করেছিল। তারপর কাল রাত্রি থেকে নেমেছে ভীষণ বৃষ্টি। সারারাত ঘুমের মাঝে ফাঁকে ফাঁকে শুনেছি ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়চে···পড়চে। আজ সকালে ওপাড়ার ঘাটে বেড়িয়ে এলাম—মন্নু রায়ের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। সর্ব্বত্র জল আর জল—খানা, ডোবা, বিল, বাঁওড় জলে থৈ থৈ করচে। ইছামতী কূলে কূলে ভরা, সেই লতাটাতে সাদা সাদা ফুট ফুটেচে—ভরপুর বর্ষার দৃশ্য! কতকাল দেখিনি এসব, কতকাল দেখিনি এই বর্ষনমুখর মেঘান্ধকার প্রভাতে ওপারের জলে-ভেজা নলখাগড়া বন, বন্‌বেবুড়োর বন, কতকাল দেখিনি বর্ষা প্রভাতে ভাদ্র মাসের ইছামতীর কূলে কূলে ভরা অপরূপ রূপ। তার বদলে দেখে এসেচি মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের বাড়ীর তেতলা থেকে নিচের রাস্তার একহাঁটু জলের মধ্যে দিয়ে পাঁউরুটি ওয়ালা

ভোরে অদ্ভুত সুর করতে করতে চলেচে। এক এক পয়সার রুটি লেও, দু দু পয়সার রুটি লেও—বোম্বাইয়ে রুটি লেও, বোম্বাইয়ে রুটি!" জল ছেটিয়ে বাস চলচে একহাঁটু জলের মধ্যে, যেন ষ্টীমার চলেচে জলের মধ্যে দিয়ে। সারি সারি ট্রাম মৌলালির মোড়ে আটকে আছে···কিংবা সারারাত্রি বৃষ্টির দরুণ ট্রাম বেরোয়নি।···বাবুরা প্রাণের দায়ে আপিসে চলেচেন জুতোজোড়া খবরের কাগজ মুড়ে বগলে নিয়ে হাঁটুর কাপড় তুলে···ট্রামে বাসে জানালা বন্ধ লোকজন বাদুড় ঝোলা হয়ে চলেচে, ভেতরে বাইরে অসম্ভব ভিড়! বহুক্ষণ ধরে দেখে দেখে ওদৃশ্য চোখ ক্লান্ত হয়ে গিয়েচে···আর ভাল লাগে না ও সব। এমন ভাদ্র মাসের মেঘ-কালো প্রভাত তার ভরা নদীজল ও বৃষ্টিস্নাত সাঁইবাবলার ও মাকাল-লতার ঝোপ এবং চরের নলখাড়ার বন নিয়ে অক্ষয় হয়ে থাক জীবনে, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের ফিরিওয়ালা জলে ভিজে যত খুসি বোম্বাইয়ে রুটি বিক্রি করুক গে।

ঠিক আজ তেমনি প্রভাত—তেমনি মেঘান্ধকার, শীতল, বর্ষনমুখর ভাদ্রের প্রভাত। ৭টা বেজেচে অথচ আমি ভাল করে খাতার লেখা দেখতে পাচ্ছি নে আধ অন্ধকারে। যেমন কতকাল আগে আজমাবাদ কাছারীতে আমি সেই নকছেদী ভকতের দেওয়া বেলফুলের ঝাড়ের পাশের চেয়ারে বসে 'পথের পাঁচালী' লিখতাম, মুহুরী গোষ্ঠবাবু বসে হিসেব বোঝাতো, উত্তর বিহারের বন্যার জলে-ডোবা মকাইয়ের ক্ষেত আর কাশবন—সেই উদ্দাম ঘোড়ায় চড়া, সেই বটেশ্বর নাথ পাহাড়ের নীল দৃশ্য, সেই দিগন্তলীন মোহন পুরা রিজার্ভ ফরেষ্ট—সেই সব দূর অতীতের ছবি আজকার দিনে মনে জাগে। সে হোল আজ আঠারো বছর আগের কথা, মানুষের ক্ষুদ্র জীবনে আঠারো বছর—কত কাল!

কিন্তু এ দিনে আর একটি অদ্ভুত স্মৃতি জড়ানো আছে জীবনে। ১২ই ভাদ্র সেবার ছিল জন্মাষ্টমী, মনে পড়ে? মনে পড়ে সেই আকুল আগ্রহে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা, সেই মাটির প্রদীপ হাতে একটি কিশোরীর ছবি খড়ের ঘরের দাওয়ায়? না:—এসব কথা মনের গভীর গহনে সুগোপনেই থাকুক, এখানে লিখবো না কিছু।

শুধু সেই অপূর্ব্ব দিনটির স্মৃতির উদ্দেশে আজকার এই ক'টি কথা লিখে রাখলাম।

পুরীতে যে মেয়েটি এই খাতাখানি আমায় দিয়েছিল আজ ঘন সারাণ্ডা অরণ্যের মধ্যে বসে তার সে খাতাটিতে লিখচি। আজ ২৯ শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ সাল। বেশ শীত, থলকোবাদ বনবিভাগের বাংলোতে বসে আছে, আগুন জ্বলচে ঘরে। আজ সকালে মোটরে মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে নুরাগাঁও গিয়েছিলাম। পথে পড়লো জাটিসিরিং বলে একটা অপূর্ব্ব সুন্দর জায়গা, কোইনা নদীর গর্ভে। তিন বৎসর আগে জ্যোৎস্না-রাত্রে এখানে এসেছিলুম, এমনি শীতের দিনে, রাত ১০ টার পরে। এখানে বসে কিছু লিখেছিলুম মনে আছে। চারিদিকে ঘন অরণ্যভূমি সামনে কেউন্‌ঝর ষ্টেটের পাহাড় ও বন, পেছনে বোনাই গড়ের বন, প্রায় ২০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী বন অরণ্য ঘিরে রেখেচে আমাদের।

বড়দিনের ছুটিতে এখানে বেড়াতে এসেছি। মনোহরপুরের পাহাড়ের ওপর যে সুন্দর বাংলোটি আছে বনবিভাগের, সেখানে ছিলাম দুদিন। তারপর এলুম এখানে। নির্জ্জন বনপথে সেবার যেখানে বনমুরগী দেখেছিলাম, এবারও সেখানে সন্ধ্যার আগে বনমুরগী দেখা গেল। বাড়ীর পাশে চরে বেড়াচ্ছিল, মোটরের শব্দ শুনে উড়ে গেল। থলকো-বাদ আসবার কিছু আগে বন্য ময়ূর দেখলাম, রাস্তার এ পারের বন

থেকে ওপারের বনে ঢুকলো। আবার সেই থলকোবাদ বাংলো! সেই অরণ্যের সুগন্ধ, সেই নির্জ্জনতা।

কাল বাবুডেরা ও বলিবা থেকে ফিরবার পথে এই নির্জ্জনতা আমার এত বেশি বুকে যেন একটা গুরুভারের মত চেপে ধরছিল। শুধুই গাছ আর বন, আর লতা আর পাথর, আর পাহাড়। লোক নেই জন নেই, লোকালয় নেই। আমি এখানে কতদিন একা থাকতে পারি? যদি ধরো বাবুডেরার পথে সেই পাহাড়টার ওপরকার তৃণভূমিতে, যেখানে মাদুর পেতে বসে আমি আর মিঃ সিন্‌হা দুঘণ্টা গল্প করলুম ও লিখলুম—সেখানে আমাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কিছু দিন থাকতে হয়, একটিও মানুষের মুখ না দেখে, একজনের সঙ্গেও একটি কথা না বলে? শুধু অন্ধকার বা আধ-জ্যোৎস্না রাত্রে মাথার ওপরকার আকাশে দেখবো পরিচিত কাল পুরুষ বা সপ্তর্ষি নক্ষত্র মণ্ডল, তাদের চারি পাশে ছড়িয়ে আছে অগণ্য তারা, আর নিচে আমার সামনে, পিছনে অন্ধকারাচ্ছন্ন শৈলমালা, অরণ্যের সীমারেখা, কচিৎ বা শুনবো বন্য-হস্তীর বৃংহতিধ্বনি, বন্য কুকুরের ডাক, কখনো বা কোট্‌রার (barking deer) বিকট চীৎকার।

ওপরে বিরাট নিচেও বিরাট। ওপরে, নিচে, তোমার চারিপাশে বিরাটের গম্ভীর মূর্ত্তি থম্ থম্ করছে। বাংলা দেশের মাঠে মাঠে এ সময়ে ফুটেচে বনধুঁধুলের হল্‌দে ফুল, ছোট এড়াঞ্চির সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল—সেগুলো মিষ্টি, চমৎকার লিরিক কবিতা। মনকে মুগ্ধ করে, আনন্দ দেয়। এখানে প্রকৃতি এপিক কাব্য লিখে রেখেচে গম্ভীর অরণ্যাবৃত শৈলশিখরে, লৌহপ্রস্তর দিয়ে বাঁধানো নদীকূলে, তারা-ভরা বিশাল আকাশ পটে, বন্যজন্তু অধ্যুষিত আরণ্য অন্ধকারে। সে গম্ভীর এপিক কাব্য সকলের জন্যে নয়—কাল রাত দুটোর সময়

বাংলোর বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের অন্ধকারাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ বনানী ও শৈলমালার দিকে তাকিয়ে দেখেছি—সে দৃশ্য সহ্য করতে পারা যায় না—মনকে স্তব্ধ করে, অভিভূত করে, ভয় এনে দেয়। বিরাটের উপাসনা সকলের জন্যে নয়, বাংলার পল্লী প্রভৃতি যেখানে ঠুংরি, এখানে তা চৌতালের ধ্রুপদ—সকলের জন্যে নয় এ সব।

এই বন ওদিকে পাথর বাৎনী, জেরাইকেলা থেকে আরম্ভ করে এদিকে ঝিনূডুং, লোয়ো কোদলিবাদ, ধরমপকা পর্যন্ত বিস্তৃত। কি ঘন বন, কত মোটা মোটা শাল গাছ কোথায় কোন শূন্যে ঠেলে উঠেচে—কলের চিমনির মত। ১৫০।২০০ বছরের প্রাচীন বনস্পতি। এসব অঞ্চলে যখন সভ্য মানুষে পদার্পণ করেনি, রেল হয়নি, মোটর ছিল না, পথ ঘাট তৈরি হয়নি—তখন এই সব বনস্পতি ঘন বনের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল। আমার প্রপিতামহ যখন শিশু তখন এই সব গাছ হয়তো ছিল সরু শাল রলা। আমার মায়ের যেদিন বিয়ে হয়েছিল সেদিনটিতে এই গাছ এত বড়ই ছিল। এই সব ভেবে আমার মনে যে কি আনন্দ পাই, থলকোবাদ গ্রামের পাশে বোনাইগড় আর রঙ্গন গাড়ার পথের ধারে যে বিশাল শালবৃক্ষটি আজ সন্ধ্যায় দেখলুম যারা তলায় শাদ বেড়ার সেই গাড়োয়ান ক'টি ভাত আর কচু দিয়ে কলাইয়ের ডাল রেঁধে খাচ্ছিল—দণ্ডের পর দণ্ড আমি ওই গাছটির দিকে চেয়ে এই রকম চিন্তায় মশগুল হয়ে আপনহারা আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতে পারি।

ইসমাইলপুর দিয়ারা খড়ের কাছারিঘর থেকে বার হয়ে এমনি শীতের রাত্রে হঠাৎ বাইরে গিয়ে দাঁড়াতুম মনে পড়ে। সেখানেও ছিল সামনে পিছনে নির্জ্জন বনভূমি আর ছিল সে কি ভীষণ শীত। হাতের আঙুলগুলো জমে ঠাণ্ডা হয়ে যেতো—এত কাল পরে আবার

এই ক'দিন সেই হারানো অনুভূতিগুলো ফিরিয়ে পাই রোজ রাত্রে। সেই নির্জ্জন, অন্ধকার আরণ্যভূমি, সেই ভীষণ শীত, সেই সীমাহীন বিরাটের মুখোমুখি হওয়া, সেই শুব্ধ ও মৌন বিস্ময়-ভরা আনন্দ। জয় হোক সে বিশ্বদেবতার যিনি আমাকে আবার এখানে এনেচেন।

ক'দিন থেকে বন্যহস্তীর উপদ্রবে এখানকার আরাকুসি অর্থাৎ কাঠচেরাইয়ের কুলিরা বড় বিব্রত হয়ে পড়েচে। কাল সন্ধ্যায় বনতুলসীর শুকনো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের ওপরের একটা ঝর্ণা পার হয়ে বোনাইগড়ের পথে এদের কাছে গিয়েছিলাম। একটা বিশাল শাল গাছের তলায় এরা বসে ডাল রান্না করছিল ঘটিতে। ভাত আগেই রান্না হয়ে গিয়েছিল। চারিধারে নির্জ্জন জঙ্গল। ভীষণ শীত।

জিজ্ঞেস করলাম—কি নাম? কোথা থেকে আসচো?

ওরা বাংলা বোঝে না। হো ভাষার মধ্যে উড়িয়া ভাষায় ক্রিয়াপদ মিলিয়ে এদের কথ্য ভাষা। যা বল্লে, তার মানে এই যে তারা গাড়োয়ান, কাঠ বইবার জন্যে যদি গাড়ির দরকার হয়, সেজন্যে জঙ্গলে কাজ খুঁজতে এসেচে।

সঙ্গে ওদের দেখলুম শুধু একখানা করে খেজুর পাতার বোনা চেটাই একখানা পাতলা রেজাই, একটা হাঁড়ি আর একটা ঘটি।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় শোবে রাত্রে?

—এইখানে। গাছতলায়।

—হাতীর ভয় আছে এখানে জানো? কাল রাত্রে আরাকুসিদের বড় বিব্রত করেচে।

—আগুন আছে বাবু।

—আগুন তো আরাকুসিদেরও ছিল, বুনো হাতী আগুন মানেনি। দাঁত দিয়ে ও বছর একটা লোককে গেঁথে ফেলেছিল মাটির সঙ্গে।

সাবধানে থাকাই ভালো।

—না বাবু, হাতীর ভয় করলে আমাদের চলবে না। কোথায় যাবো বাবু?

—এই ভীষণ শীতে শোবে এই গাছতলায়!

—আমরা চিরকালই তাই করি। আগুনের ধারে শুলে শীত লাগবে না।

এরা কিছুই গ্রাহ্য করে না, না বুনো হাতী, না এই দুর্দ্দান্ত শীত, না এই অন্ধকারে আরণ্য রজনীর নির্জ্জনতা। এই সব বন্য অঞ্চলে এরা মানুষ, আজন্ম যাতায়াত করচে এই বন পথে, বৃক্ষতলে নিশি যাপন এদের দৈনন্দিন অভ্যেস। ওদের ডাল নামলো! শুধু ডাল আর ভাত শাল পাতায় ঢেলে খেতে লাগলো। ডালের মধ্যে সাদা সাদা কি ভাসচে দেখে বল্লাম—ওগুলো কি ডালে?

—পেকৃচি।

—সেটা কি?

—কান্দা।

—তাই বা কি?

বুঝলাম না জিনিসটা। মনে হোল কোনো জংলী ফলটল হবে। পরে বনবিভাগের হিন্দিজানা কর্ম্মচারী নিকোডিম হো-কে জিজ্ঞেস করতে জানলুম, জিনিসটা হোল বনকচু।

এই হোল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষকে বুঝতে হোলে এই সব লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। কি সামান্য এদের খাওয়া, কত তুচ্ছ এদের শোওয়া, শীতকে এরা শীত জ্ঞান করে না, বুনোহাতী মানে না, বাঘ মানে না যদি দুটাকা কি দেড় টাকা গাড়ীর ভাড়া মেলে। তবুও খায় বনকচু সিদ্ধ আর ভাত।

হে অরণ্য কথা কও

গাছের মাথায় সন্ধ্যা নামলো ফিরবার পথে। একফালি চাঁদ উঠেছে শাল গাছের মাথায়। বনতুলসীর জঙ্গলের গন্ধ ভেসে আসচে ঠাণ্ডা বাতাসে। নিকটে পাহাড়ী উমুরিয়া নালার মর্ম্মর শব্দ। বোনাই গড়ের পথ ঘন জঙ্গলের বাঁকে যেখানে অদৃশ্য হয়েছে, সেখান থেকে ধোঁয়া উঠচে। বোধহয় ওখানেও আরাকুশি বা গাড়োয়ানেরা রাত্রি যাপন করচে।

পথের ধারে গাছের তলায় তলায় কত লোক আগুন জ্বেলেচে, রান্না করচে। এরা সবাই জেরাইকেলা কিংবা বিসবা থেকে কাজ খুঁজতে এসেচে। কারণ এই জঙ্গলের মধ্যে এই গ্রামেই দুটি কাঠ ব্যবসায়ীদের আড্ডা আছে। কাঠ কেটে ও চেরাই করে ২৫। ২৬ মাইল দূরবর্ত্তী রেলষ্টেশনে পাঠাবার জন্যে 'আরাকুসি' দরকার, কুলি দরকার, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান দরকার। তাই এখানে এত লোক আসে।

ওরাই আসবার সময় বলেছিল, রোজ রাত্রে হাতীতে তাদের বড় জ্বালাতন করে। হাতীর উপদ্রবে ওরা পালিয়ে ফরেষ্ট বাংলোর কম্পাউণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিল পরশু রাত্রে।

গ্রামের লোকে বলেছিল হাতীর উপদ্রবে গাছের কলা থাকে না, ক্ষেতের কোনো ফসল থাকে না। সব খেয়ে যাবে। উঁচু মাচা করে তাই ওরা সারারাত ফসলের ক্ষেতে চৌকি দেয়। শীতকালে এখন ক্ষেতে কোনো ফসল নেই, কাটা হয়ে গিয়েচে, আছে কেবল কুরথি। যেখানেই পাহাড়ের তলায় কুরথি ক্ষেত, সেখানেই উঁচু কোনো গাছের ওপরে মাচা বাঁধা। রাত্রে ফসল পাহারা দিতে হবে।

থলকোবাদ বাংলোর পেছনে যে ছোট পাহাড়ী বন আর উঁচু রাঙা মাটির ডাঙ্গা তাতে শীতের দিনে একরকম ঘাস হয়েচে, খুব নরম, সরু

সরু সববাই ঘাসের মত। এই ঘাসের বন মাঝে মাঝে শুকিয়ে গিয়ে সোনালি রং ধরেচে।

আজ দুপুরের পর বাংলো থেকে বার হয়ে এই নির্জ্জন পাহাড়ে উঠে ঘাসের উপর একা বসলুম। আমার পেছনের ঢালুতে আসান, অর্জ্জুন, ধ, করম, শাল, পিয়াল, আমলকী গাছের বন। ওদিকে বনের মাথা ছাড়িয়ে আর একটা পাহাড় ঠেলে উঠেচে। কি যে অনুভূতি হয় এখানে বসে চুপ করে চোখ বুজে থাকলে। শুকনো ঘাসের ভরপুর গন্ধ। সোনালি রোদ। কত কি পাখীর ডাক। কান পেতে শুনলে শোনা যাবে পাহাড়ের বনে বনে এদিকে ওদিকে কত অজানা পাখীর ডাক। বাংলা দেশের পরিচিত পাখী এরা নয়। আমি এদেশের পাখীর সুর চিনি না। কেবল চিনি বনটিয়া আর ধনেশ পাখীর ডাক। পাহাড় ও বনের পটভূমিতে বুনো পাখীদের সঙ্গীত এই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে শুধু মনকে বিরাটের দিকে নিয়ে যায়। তাঁর কথাই এখানে বসে ভাবতে ইচ্ছে করে। ধ্যান-স্তিমিত নেত্র সেই মহান শিল্পীকে একদিন প্রত্যক্ষ করেছিল প্রাচীন ভারতের কোন অরণ্যের অভ্যন্তরে। এমনি নির্জ্জন দুপুরে।

একটু পরে মোটরে গেলুম বেড়াতে থলকোবাদ বাংলো থেকে চার মাইল দূরে একটা ঝর্ণা দেখতে। সন্ধ্যার দেরি নেই। মোটরের রাস্তা থেকে কিছুদূরে সেই ঝর্ণাটা। মস্ত বড় শিলাস্তৃত চাতাল সেখানে। কত লক্ষ বৎসর ধরে এই ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি ওপরের নরম রাঙা মাটি কেটে shale ও greiss পাথরের এই চাতাল তৈরী করেছে। কত লক্ষ বৎসর ধরে এই ঝর্ণা চলেচে এখানে দিয়ে। সময়ের বিরাট ব্যাপ্তির কথা ভাবলে আমরা ক্ষুদ্র মানুষ আমাদের মাথা ঘুরে যায়।

সামনে সেই ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি কুলকুল করে পাথরের ওপর দিয়ে বইচে। আমি ঘন বনের মধ্যে মোটা লতা দোলানো একটা বটগাছের তলায়

শিলাসনে বসে আর একটা মস্ত বড় মসৃণ পাথর ঠেস দিয়ে বসে লিখচি। সেই সব পাখীর ডাক। এ জায়গাটা বড় বেশি ঘন বনের মধ্যে। একে তো এই সারাণ্ডা অরণ্যই নির্জ্জন ও বহু বন্যজন্তু অধ্যুষিত। তাতে এ জায়গাটা আবার থলকোবাদ থেকে চার মাইল দূরে বনের মধ্যে। বাঘ ও হাতীর ভয় এখানে খুব। মাঝে মাঝে সতর্ক দৃষ্টিতে পেছন দিকে চাইচি, শুকনো পাতার ওপর খস্ খস্ শব্দ হোলেই। মিঃ সিন্‌হা অদূরে আর একটা গাছের তলায় বসে আছেন।

এসব স্থানে বসে শুধু বিরাটের চিন্তা মনে আসে। লক্ষ বৎসর এখানে মাপ-কাঠি। বিরাট আকাশ, অনন্ত নাক্ষত্রিক শূন্য, মহাকালের অনন্ত পথ যাত্রা···মনের মধ্যে যে সুর বেজে ওঠে, পৃথিবীর ভাষায় সে সুর বোঝানো যায় না, সে অনুভূতি অমরত্বের আস্বাদ বহন করে আনে, তুলনা নেই সে ecstasyর—

আর শুধুই ছবি মনে আসে সে বিরাট দেবতার, কত ভাবে, কত দিক থেকে। বহু প্রাচীন দিনে ভারতবর্ষের এমনি কোন অরণ্যের শিলাতলে বসে ব্রহ্মসূত্রকার মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্—বিশ্ব রচনা দেখে মনে হয় এর মধ্যে কোন বিরাট শিল্পচেতনা সব সময়ে সক্রিয়।

সেই মহান, বিরাট শিল্পীকে বন্দনা করি। জয় হোক বিশ্বের সে অধিদেবতার। মহাকবি তিনি, অনাদ্যন্ত শাশ্বত যুগ ধরে এই রকম শিলাস্তৃত ঝর্ণার তটে, অনন্ত নীহারিকা মণ্ডলীছড়ানো আকাশ পটে, বন-কুসুমের পাপড়ির দলে, বিহঙ্গকাকলীতে, জাতির উত্থানে পতনে, চাঁদের আলোয়, তরুণীর নির্ম্মল প্রেমের ব্যথায়, শোকে, বিরহের গানে, অগ্নিপুচ্ছ ও ধূমকেতুদলের যাতায়াতে, দেশ ও মহাদেশের অবনমন পুনরুত্থানে তিনি আপন মনে তাঁর বিরাট এপিক কাব্য লিখেই চলেচেন। কিন্তু অত বড়

মহাকাব্য পাঠ করবার মত শক্তিধর পাঠক কোথায়? দু একটা সর্গের এক-আধ পংক্তি কেউ হয়তো পড়ে, কেউ বোঝে কেউ বোঝে না।

আকাশে গোধুলি নেমেচে। রাঙা গোধুলি। বনের মধ্যে দিয়ে আমার এই বটতলায় শিলাসনে ওর রাঙা আলো এসে পড়েছে। জলের মর্ম্মর কলতান যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে চোখে। শীতও নেমেচে খুব।

বিজয় ড্রাইভার এসে বলচে—যাবেন না বাবু?

বুনোহাতী কিংবা বাঘ আর একটু পরে জলপান করতে আসবে এই ঝরণায়। যাওয়াই ভালো।

বাংলোয় ফিরলুম অন্ধকার গিরি-বনপথ ধরে। আশেপাশের অন্ধকার জঙ্গলের দিকে চাইলে প্রাণে ভয় আসে। এ এক অন্য জগৎ।

বাংলোয় ফিরে পাহাড়ের প্রান্তে বাংলোর কম্পাউণ্ডে বসে আছি। আমার সামনে অনেক নিচে উপত্যকাভূমি, তার ওপারে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বনাবৃত শৈলমালা। বাঁ দিকে কম্পাউণ্ডের বড় তুন গাছের মাথায় অষ্টমীর চাঁদ উঠেচে—দূরের অন্ধকার শৈলমালার ওপরে একটি নক্ষত্র জ্বলজ্বল করচে। সেদিকে চেয়ে মন আবার কোথায় কতদূরে চলে গেল। ওই তারার চারি পাশে কি আমাদের মত গ্রহরাজী কি আছে? সেখানে বাস করে আমাদের মত জীবকুল? এই রকম বনানীর সৌন্দর্য্য কি ওদের মধ্যে আছে? আমাদের মত সুখ দুঃখ, প্রেম বিরহের লিপি কি ওখানেও লেখা?

সেকথা জানি না জানি—এই কথাটা জানি যে বিরাটের আসন ওখানেও পাতা। তাঁর মহাকাব্যের ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে ওদেরও স্থান রয়েচে।

Out beyond the shining of the furthest star
Thou art ever stretching infinitely far,

Yet the hearts of children hold, what worlds can not,
And the God of glory loves the lowly spot.

আমাদের গ্রামের ইছামতীর নদীর ধারে বল্লার ভাঙনে সেই হলদে তিৎপল্লা ফুলের মধ্যেও তিনি, বনসিমতলায় মাটের সেই মাকাল লতার ঝোপে পাকা টুকটুকে মাকাল ফলের মধ্যেও তিনি।...

অনেক রাত্রে চাঁদ ফুটফুটে আলো দিচ্চে।

আবার পাহাড়ের ধারে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম। দূরের সেই পাহাড়-শ্রেণী, তার মাথার ওপরকার আকাশে অগণ্য তারা। কি মহিমা বিরাটের। তুমি আমাকে ভালোবেসে এখানে এনেচ, তোমার এ বিরাট রূপকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দিয়েচ। কিন্তু আমি তোমার এ রূপের সামনে দিশাহারা হয়ে যাই, দেবতা। আমার সেই তিৎপল্লা ফুলের ঝোপই ভালো। বনসিমলতা ঘাটের সেই মাকাল ফলই ভালো। তোমার এ রূপ দেখে আমি ভয় পাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকেল।

নদীর ধারের ঘন নিবিড় বন সেকেলে প্রাচীন আমগাছের তলায়। কুঁচলতা বেয়ে উঠেচে বৃদ্ধ আমগাছের ডাল। বাঁশগাছের আগা থেকে নেমে এসেচে বড় গোয়ালে লতার কচি ডগা, এবার বোশেখ মাসের শেষে দিনকয়েক বৃষ্টি হওয়াতে লতা পাতা চারাগাছের এত বৃদ্ধি। যেখানে কিছুদিন আগে পরিষ্কার তৃণলতা শূন্য ভূমি দেখেছি—এখন সেখানে দশ বর্গহাত জমিতে গজিয়ে উঠেচে বুনো উচ্ছে, বুনো করলা, বড় গোয়ালে লতা, কবমচা লতা, বুনো সূর্য্যমনি ফুলের চারা, জামের

চারা, তরমুজের চারা, আরও কত কত জানা অজানা বুনো গাছপালার চারা।

এখন বৃষ্টি নেই। আজ ক'দিন খুব গরম, খর সূর্য্য উঠেছে মেঘলেশশূন্য নীল আকাশে, দিকদিগন্ত প্রখর রৌদ্রে জলে পুড়ে যায়, অপরাহ্নে কিন্তু গহন ছায়া নেমে আসে মাঠে ঘাটে পথে, বনযুঁইয়ের সুগন্ধে বাতাস হয় সুরভিত, বাঁশঝাড়ের মগ্‌ডাল দুলিয়ে, আম্রবন-শীর্ষ কাঁপিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ওঠে নদীর বাঁক থেকে, নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ঢেউ উঠে পানকলস শেওলার কুচো সাদা ফুলের সারিকে নাড়িয়ে দেয় ডাঙার দিকে, পানকৌড়িকে উড়িয়ে দেয় সাঁইবাবলার ডাল থেকে, শেফালি ফুলের হলুদ পাপড়ি ঝরিয়ে দেয় নিবিড় বনের তলায়, বর্ষাপুষ্ট তৃণভূমির তলে কিংবা নবোদ্ধত চারা গাছের মাথায়। গোধূলির রাঙা আলো বনে, মাঠে, চরে, জলে, নলখাগড়া আর কষাড় ঝোপে, উড়ন্ত বকের সারির পাখায়। এই নিস্তব্ধ অপরাহ্নে ছায়াগহণ প্রাচীন আমবাগানে ঢুকে দেখছি বনের কোন্ কোণে তিনি পত্রশয্যায় ঘুমিয়ে আছেন। তাঁকে দেখেছিলাম এই নির্জ্জনে।

আমি অবিশ্যি দূর থেকে দেখেছি, কাছে যাইনি।

ছায়া-ঝোপের নিবিড় আশ্রয়ে তিনি শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন। নারীর মত সুকুমার, কমনীয় মুখে এক অপার্থিব ভাব মাখা, দীর্ঘ দীর্ঘ চোখ দুটি নিমীলিত দীর্ঘ কালো জোড়া ভুরুর তলায়। সুন্দরী নারীর মত লাবণ্যভরা মুখ। মুখ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে ওঁর। ঝুর ঝুর করে ঝরা পাপড়ি ঝরে পড়চে সোঁদালি ফুলের ওর শয্যার ওপর। ডালে ডালে বনের পাখি নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্চে, কত কি বন্যলতার গাছ ওপরের ডাল থেকে নেমে এসে দুলচে ওর বুকের কাছে, মুখের কাছে। তিৎপল্লা ফুল ফুটে আছে একটু দূরে একটা

ঝোপে, রঙিন্ প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে সোঁদালি ফুলের ঝাড়ে ঝাড়ে, পিড়িং পিড়িং দুর্গাটুনটুনি ডাকচে, উঁচু গাছের মগডালে ডাকচে কুল্লো, কি সুন্দর গোধূলির রাঙা রোদ সাজানো বনকুঞ্জ, কি স্নিগ্ধ ছায়ানিবিড় বীথিতল!

কিন্তু হঠাৎ মনে হোল তিৎপল্লা ফুল তো এখন ফোটে না, ও ফোটে শীতের প্রথম মাসে দুপুর বেলা।

এখন ও ফুল কেন?

তা না, মনে হোল মহাশিল্পী, মহাকবি উনি, নিজের অনন্ত শয্যার অন্ত-নিদ্রার স্থানটি নিজের ইচ্ছামত সাজিয়ে বোসবেন আমি যেসব ফুল ভালবাসি বা দেখেছি তাই দিয়ে। শুধু কি ফুল? কত কি সুদর্শন, সুকুমারাগ্র বন্যলতা, যা নিতান্ত এই বাংলার পল্লী প্রান্তরে সুপরিচিত। নেই সেখানে অর্ক ও কোবিদার। নেই কুরুবক, অশোক পুন্নাগ ও চম্পক, বর্ষা-সাথী নীপও চোখে পড়ে না। হে পূর্ব্বাচলের সবিতা, তোমার জবাকুসুম-সঙ্কাশ রশ্মির বিকীরণও এখানে তপস্যার অভাবে প্রবেশ লাভ করেনি। কি পুণ্য করেছিল এই প্রাচীন দিনের গাঙুলি বংশের আমবাগান, কি তপস্যা করেছিল ইছামতীর তীর-তরুশ্রেণী?

ভালো করে চেয়ে দেখবার জন্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেই বনে।

কি সুন্দর অপরূপ স্নিগ্ধ ছবিখানা আমার সামনে।

বিপুল মহাসাগরে ইথারের মহাসমুদ্র, যেখানে কোটি তারা ডোবে জলে, তার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি সবুজ খড়ের দ্বীপ পৃথিবী।

বিশ্বের রাজাধিরাজ পরম সৌম্য, পরম প্রেমী অধিদেবতা, যাঁর তৈরী আব্রহ্মস্তম্ব এই জগৎ, এই মহাজগৎ, সেই পরম রহস্যময় দেবতা আজ

কেন শায়িত এই আমবাগানে! সোঁদালি ফুল ঝরচে তাঁর সুকুমার লাবণ্য-মাখা মুখের ওপর, সে মুখ দেখে তক্ষণি ভালবাসতে ইচ্ছে করে—বিশেষ করে যখন মনে হয় জগতে ক'জনই বা ওঁকে জানে বা ওঁকে ভালবাসে বা ওঁর কথা ভাবে। উনি সব চেয়ে বেশি অবহেলিত জগতের মধ্যে। কচি কচি লতা দুলচে, একটু দূরে রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, সোঁদালির ফুলের ঝাড়ে ঝাড়ে, আবার নীল বনকলমির ফুলে ভর্ত্তি একটা লতা উঠেছে বঁাড়াগাছের মাথায়, অকালে একটা শিমুলের শাখায় রাঙা রাঙা ফুল ফুটে আছে, টুক্‌টুকে মাকালফল ঝুলচে, লেজ ঝোলা হল্‌দে পাখী বসে আছে, যে ফুল কেউ দেখে না ও কেউ আদর করে না, তেমন ফুল ফুটে আছে তাঁর বনতলে, তাই দিয়ে রচিত হবে তাঁর পত্রশয্যা।

প্রণাম, হে খেয়ালী দেবতা, প্রণাম।

ছোট একটা লতা উঠচে আমার রোয়াকের ঠেস্ দেওয়ালের পাশের নারিকেল গাছটা বেয়ে। আমার বাড়ির ওদিকটাতে ঘন বন ঝোপ। আগে যুগল কাকার ভিটে ছিল ও-খানটাতে, ছেলেবেলায় তাঁর কাছে আমি কিছুদিন অঙ্ক কস্‌তাম, কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পরে তাঁর ছেলেরা এ গ্রাম থেকে উঠে অন্যত্র গিয়ে বাস করচে, এখন সেখানে ঘন ছোট এড়াঞ্চি, গোয়ালে লতা, সোঁদালি গাঁধালে শাক, বনমৌরি ও আদাড়ে কাশের জঙ্গল।

আমি ঠেস্ দেওয়ালটাতে বসে বসে লিখি। হঠাৎ দেখলাম একদিন নারকোল গাছের গা বেয়ে একটা লতা উঠচে। ভালো করে চেয়ে দেখলাম, বুনো তিৎপল্লার লতা, যারা জানে না তারা বলে

তেলাকুচো। কিন্তু তেলাকুচো লতা একটু অন্য রকমের। ফলের গড়ন তো সম্পূর্ণ আলাদা।

দিনে দিনে পাতাটি বেড়ে উঠে নারকোল গাছ বেয়ে ঠেলে উঠতে লাগলো। আমি অবাক হয়ে রোজ রোজ চেয়ে দেখি ক্রমে তার ফুল হোল, যে ফুলের কুঁড়ি এ সব অঞ্চলের ছুলে মেয়েরা নাকে নোলক করে পরে। আমরাও বাল্যে পরেছি। ফুলের সময়টাতে রঙবেরঙের কত প্রজাপতির বাহার। সুকুমার লতাগ্রভাগ নারকোলগুঁড়ি ছেড়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে দুলচে বাতাসে, তাদের গাঁটে গাঁটে শাদা শাদা ফুল আর ফুলে ফুলে হলদেডানা নীলডানা প্রজাপতিকুলের মুক্তপক্ষ-সঞ্চরণ। এরা বনান্তস্থলী একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুখরিত করে রাখে সারা সকালবেলাটা। আমি লেখা ছেড়ে মাঝে মাঝে সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি।

একদিন ওর ফলের জালি পড়লো। জালি পুষ্ট হয়ে তেলাকুচো আকারের ফলে পরিণত হোল। ক্রমে একদিন ফল পেকে টুকটুকে লাল দেখালো। ছোট্ট একটা দুর্গা টুনটুনি পাখি এক শ্রাবণ অন্ধকারের মেঘ-মেদুর শ্যামলতা ও অতলস্পর্শ শান্তির মধ্যে দেখি ফলটার পাশের লতার ডগায় বসে মহা আনন্দে রাঙা ফলটি ভোজন করচে। কি অপূর্ব্ব আনন্দই বা সেটুকু পুচকে পাখির খাওয়ার ভঙ্গির মধ্যে। তখনও দুলচে উপরের দিকের লতাগ্রভাগে কত শাদা কুচো কুচো ফুল নোলকের মত, কত সবুজ কচি ফলের জালি।

ওর পিছনে বিশাল, প্রাচীন বকুল গাছটা। বর্ষার দিনে মেঘের ঘন ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আছে ওর তলা। আর্দ্র লতাকোণে কি সুগন্ধ ফুল ফুটেচে—জলভরা বাতাসে তার সুবাস। এই শ্যামল বনানীর নিবিড় পটভূমিতে সেই ভিৎপল্লার লতাটা কি সুন্দর দেখায়। ঠেস্

দেওয়ালে বসে বসে চেয়ে দেখতে দেখতে এক একদিন কি আনন্দ যে পাই।

শুধু ঐ ক্ষুদ্র তিৎপল্লার লতা আর তার ফুল নয়, এক অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য জিনিস দেখি ওর মধ্যে। ও সামান্য বন্যলতা নয়। গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে সন্ধ্যায় এক মনে ওর দিকে চেয়ে থেকে দেখো। অসীমের মহিমময় বাণী এসে পৌছবে তোমার মনে।

কি বিপুল সমারোহ করতে হয়েচে ওই বুনোলতাকে বাঁচিয়ে রাখতে, ওর ফুল ফোটাতে, ওর ফল পাকাতে। সূর্য্যের বিশাল অগ্নিকুণ্ডটা আকাশের দূর প্রান্তে বসাতে হয়েচে ও জন্যে, কত কি গ্যাস, কত কি রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করতে হয়েছে ওর জন্যে, কোটি কোটি মাইল ইথারের সমুদ্র ভেদ করে সূর্যরশ্মিকে পৃথিবীতে ছুটে আসতে হয়েচে ওকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যগ্র আগ্রহে। তবে আজ ওর ফুল ফুটেচে, ওর ফল পেকে লাল টুকটুক করচে।

ক্ষর-ব্রহ্মের প্রাণময়ী বার্ত্তা বহন করে এনেচে ওই বন্য লতা লোক-লোকান্তরের অসীমতা থেকে। যে মহাশিল্পীর হাতের ও অতি সুকুমার শিল্প, সেই শিল্পীর স্বাক্ষর আছে ওর পাতায়, ফুলে, লাবণ্যময় দুলুনিতে। ওর মধ্যে দিয়েই তাঁকে প্রত্যক্ষ কর।

ঘাটশিলা থেকে আমি মনোহরপুর রওনা হই বেলা দুটোর ট্রেণে। গত পূজোর ছুটিতে দেশ থেকে ঘাটশিলায় এসেছিলাম বেড়াতে। বন্ধুবর অমর মিত্রের বাসার সামনে মাঠে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে বসে গল্পসল্প করছি, এমন সময়ে খবর পেলাম আমাদের দেশের স্কুল থেকে একটি ছেলে বেড়াতে এসে আমাদের বাসায় উঠেছে।

রাত্রে ছেলেটির সঙ্গে কথা হোল, সে এসেচে বন ও পাহাড় দেখতে। কখনো দেখেনি একটা বড় রকমের বন, বড় একটা পাহাড়। সেই রাত্রেই ভাবলাম ওকে সিংভূমের সব চেয়ে বড় বনের অর্থাৎ সারান্দা অরণ্যের একটা অংশ দেখিয়ে দেবো।

অনেকে হয়তো জানেন, সিংভূমের অর্থাৎ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ছোটনাগপুরের মধ্যে দুটি বৃহৎ অরণ্যানী বর্ত্তমান। প্রথমে একথা বলা উচিত ছোটনাগপুরের এ অংশকে প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে ঝাড়খণ্ড বা ঝারিখণ্ড বলা হোত অর্থাৎ বনময় দেশ। এখন সভ্যতা বা রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব সিংভূমের বন প্রায় নিঃশেষ হয়ে সেই জায়গায় হয়েছে স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙালীদের উপনিবেশ, কল-কারখানা (যেমন টাটা, মৌভাণ্ডার) বা ফসলের ক্ষেত। বন যা এখনো পূর্ব্ব সিংভূমে আছে, তাও থাকতোনা, যদি গভর্ণমেণ্ট থেকে বনকে কানুনের বেড়া দিয়ে ঘেরা না হোত। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে আইনের গণ্ডী দিয়ে বনকে রক্ষা না করলে দু'বছরের মধ্যে (গড়-পড়তা হিসাবে অবিশ্যি) একটা দশবর্গ মাইল ব্যাপী বনভূমি কাবার হয়ে যায় মানুষের কুঠারের সামনে।

পূর্ব্ব সিংভূমের মধ্যে কয়েকটি বড় উপনিবেশ গড়ে উঠেছে—ঘাটশিলা, গালুডি, চাকুলিয়া ও টাটা। শেষেরটির নাম জগৎ-বিখ্যাত। কারখানার জন্যেই এখানে অন্নসংস্থানের উপনিবেশ।

পূর্ব্ব সিংভূমে প্রকৃতির পূজারী-ভক্তেরা বন দেখতে পাবে না বিশেষ, যা দেখতে পাবে তা এমন কিছু নয়। ক্বচিৎ দু-একটি স্থান ছাড়া। এমন একটি স্থান হোল ঘাটশিলার সাত মাইল উত্তরে ধারাগিরি নামক একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত ও আশপাশের পাহাড় বনানী। আর একটি স্থান সুবর্ণরেখার ওপারের তামাপাহাড় ও সানুদেশ। এই সব বনেই অল্প বিস্তর বন্যহস্তী, নেকড়েবাঘ, ভালুক, ময়ূর ইত্যাদি দেখা যাবে।

তবে এদের সংখ্যা এত কম যে পাঁচ বছর বনে বনে বেড়িয়েও আমি এ পর্য্যন্ত একটা জ্যান্ত জানোয়ারকে আমার দৃষ্টিপথের পথিক করাতে সমর্থ হইনি—দুটি একটি শেয়াল বা কাঠবেরালী ছাড়া।

তা সত্ত্বেও আমি জানি জানোয়ার এখানে আছে।

আমার দু একটি শিকারী বন্ধু এ বিষয়ে দুঃখময় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। যেমন গালুডির লুনা নার্সারির মোহিনী বিশ্বাস মহাশয়। ইনি ভালুক শীকার করতে গিয়ে রীতিমত জখম হয়েছিলেন ভালুকের হাতে। বেঁচে গিয়েছিলেন কোন রকমে কিন্তু একখানা হাত অকর্ম্মন্য হয়ে পড়েছে চিরকালের জন্য।

এখনো বলবো পশ্চিম সিংভূমের কথা।

বন যা আছে, এখনো পশ্চিম সিংভূমেই আছে। এ অঞ্চলের বড় বন দুটি। সারান্দা ও কোল্হান। দুটিই রিজার্ভ ফরেষ্ট। সারান্দা অরণ্যানী বৃহত্তর, প্রায় ৪০০ শত বর্গ মাইল। ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ বনানী হচ্ছে এই সারান্দা। আমি তিন বৎসর আগে একবার এই দুইটি বনভূমি দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলুম বনবিভাগের বড় কর্ম্মচারী মিঃ জে, এন, সিন্‌হার সমভিব্যাহারে ও তাঁর মোটরে।

সে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথা এমন বিচিত্র সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করেছে আমার মনে যে তিন বৎসরেও তা এতটুকু ম্লান হয়নি। বাংলা দেশে ফিরে গিয়ে যতবার ভাবতাম সারান্দা বনের নানা বিচিত্র সৌন্দর্য্য ভূমির কথা, নানা জল-প্রপাতের কথা, নানা পাথরে বাঁধানো বন্য নদী ও ঝর্ণার কথা, নানা বনপুষ্পের সুরভিবাহী দক্ষিণ বায়ুর কথা, শিলাতলে বিছিয়ে থাকা বন্যশিউলির কথা, গভীর রাত্রে বন্য বিভাগের বাংলোঘরে শুয়ে আশপাশের বনে কোথাও বন্যহস্তীর বৃংহতিধ্বনি শুনবার কথা।

তাই ভাবলুম ছেলেটিকে নিয়ে এই সুযোগে আর একবার সারান্দা অরণ্য দেখতে বেরুবো।

কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে।

পশ্চিম সিংভূমের এই অরণ্য-অঞ্চল মোটর যোগে ভিন্ন দেখা প্রায় অসম্ভব। ৪০০ শত বর্গ-মাইল-ব্যাপী এই বন-ভূমির কোথায় কি আছে তা সাধারণের জানবার কথাও নয়। সুতরাং বন-বিভাগের কর্ম্মচারীদের সাহায্যও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ট্রেনে উঠে এ বন দেখার সুযোগ প্রায় নেই, কেবল একটি উপায় ছাড়া।

সেই উপায়টি অবলম্বন করা গেল।

মনোহরপুর ষ্টেসন থেকে একটা লাইট রেলওয়ে চলে গিয়েছে চোদ্দ মাইল দূরে চিড়িয়া পাহাড়ে। এই পাহাড় থেকে ইণ্ডিয়ান ষ্টীল করপোরেশন লৌহপ্রস্তর সংগ্রহ করে বার্ণপুরের কারখানায় চালান দেয়। রেল-লাইনটা ওদেরই। এই রেলপথ গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে প্রায় আট ন' মাইল কিম্বা আর একটু বেশী। এইটি সারান্দা অরণ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তদেশে।

সুতরাং যদি মনোহরপুর থেকে চিড়িয়া খনির রেলে চড়া যায় তাহোলে বিনা মোটরে সাত-আট মাইল বন অনায়াসে দেখা যেতে পারে। চিড়িয়া রেললাইন খনিওয়ালাদের নিজেদের তৈরী, যাত্রীবহনের উদ্দেশে তা তৈরি হয়নি, বাইরের কোন লোককে উঠতে দেয়ও না। এজেন্য বনবিভাগের লোকের সাহায্য দরকার।

বেলা তিনটের নাগপুর প্যাসেঞ্জারে আমরা ঘাটশিলা থেকে উঠে সন্ধ্যার সময়ে চক্রধরপুর গিয়ে নামলাম। এই পর্য্যন্তই টিকিট করা হয়েছিল। এর পরেই পাহাড় জঙ্গলের বেশ ভাল দৃশ্য রেলপথের দুধারে পড়বে, কিন্তু নৈশ অন্ধকারে আমরা সে সব কিছুই ভালো করে দেখতে পাবো না।

তার চেয়ে রাত্রিটা চক্রধরপুর ষ্টেশনে কাটিয়ে পরদিনের ভোরবেলা যে নাগপুর প্যাসেঞ্জার আসে, তাতে ওঠাই যুক্তিযুক্ত। সবটা দিনের আলোয় দেখতে পাওয়া যাবে।

চক্রধরপুর ষ্টেশনে ওয়েটিংরুমে গিয়ে বিছানাপত্র বিছিয়ে নিয়ে আমরা সটান্ শুয়ে পড়লাম। আদ্রা প্যাসেঞ্জার এল একটু পরে। কয়েকটি ভদ্রলোক ওই ট্রেনে রাঁচি ও পুরুলিয়া থেকে এলেন। একটি ভদ্রলোকের নাম মিঃ দুবে। রেলপুলিশে কি কাজ করেন। আমার সঙ্গে দু এক কথায় খুব আলাপ জমে গেল। পথে কি চমৎকার ভাবেই আলাপ জমে। আমি অনেকবার দেখেছি রেলে দূরদেশে বেড়াবার সময় রেল-কামরার মধ্যেকার যাত্রীরা পরস্পরের আত্মীয় হয়ে গিয়েছে। এ ওকে জলপাত্র দিচ্ছে ব্যবহার করতে, ও একে সিগারেট দিচ্ছে, এ খাওয়াচ্ছে ওকে—ওদের মধ্যে শিখ আছে, পাঞ্জাবী আছে, বিহারী আছে, বাঙালী আছে। একটি সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে ওদের মধ্যে, দেড়দিন বা দুদিনের জন্যে। এমন কি বিদায় নেবার সময় কষ্ট হয়, সবাই পরস্পরের ঠিকানা নেয় চিঠি দেবে বলে।

যদিও শেষ পর্য্যন্ত হয়তো চিঠি দেওয়া হয় না।

এখানে মিঃ দুবের সঙ্গে আমার এই ধরনেরই আলাপ হয়ে গেল। তিনি আমার সুবিধা অসুবিধা দেখবার জন্যে কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কি করে বলবো।

অনেক রাত্রে দেখি মিঃ দুবে আমায় ডাকাডাকি করচেন।

—ঘুমুলেন নাকি?

—না! কি বলুন।

—একটা পথের কথা আপনাকে বলে দিই। যখন আপনি পাহাড় জঙ্গল বেড়াতে ভালোবাসেন, রাঁচি থেকে একটি পথ লোহারডাগা

হয়ে যশপুর স্টেটের মধ্যে দিয়ে সম্বলপুর জেলার ঝার্সাগুড়া পর্য্যন্ত গিয়েছে। এই পথে রাঁচি থেকে মোটর বাস যায় যশপুর ষ্টেশনের রাজধানী যশপুরনগর পর্য্যন্ত। সেখান থেকে অন্য এক মোটর বাসে কুঙ্কীগড় হয়ে ঝার্সাগুড়া আসা যাবে। কখনো যাননি এ পথে?

যাওয়া তো দূরের কথা নামই শুনিনি, সন্ধানই জানিনে।

সেই রাতটি আমার কাছে বড় মূল্যবান। মিঃ দুবে আমার উপকার করেছিলেন এ পথের সন্ধান আমায় দিয়ে। এই বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা স্থানে কত সৌন্দর্য্যস্থলী বিদ্যমান, কত নিবিড় পর্ব্বতকন্দরের অভ্যন্তরে, কত অরণ্যভূমির নিভৃত অন্তরালে, কত গোপন বন্যনদীর শিলাস্তৃত তটদেশে। কে তাদের খবর রাখে? পথের কথা যে বলে দেয়, জীবনের বড় উপকারী বন্ধু সে।

আমি জানি হাওড়া ষ্টেশন থেকে দুশো মাইলের মধ্যে কত সুন্দর স্থান আছে, সেখানে নিবিড় বন আছে, পাহাড়ী ঝর্ণা আছে, বনলতার সৌন্দর্য্য আছে, জলজ লিলির ভিড় আছে ছায়াবৃত বন্যনদীতটে। দেখে অনেক সময় নিজেরই অবিশ্বাস হয়েছে কলকাতার এত কাছে এমন সুন্দর স্থান থাকতে পারে?

রাত ভোর হয়ে গেল। একটু পরেই নাগপুর প্যাসেঞ্জার এল। আমরা তাতেই উঠে মনোহরপুরের দিকে রওনা হলাম। চক্রধরপুর ছাড়িয়ে তিনটি ষ্টেশনের পরেই পোসাইতা স্টেশনের কাছে ঘন বন। এখানে একটা টানেল আছে তাকে ভুলক্রমে রেলওয়ে গাইড বইয়ে বলা হয় 'সারাণ্ডাটানেল'। কিন্তু প্রকৃত সারান্দার সঙ্গে এই টানেলের পাহাড় ও বনভূমির কোনো সম্পর্ক নেই। এ স্থানটি কোলহান বিভাগের অরণ্যের অন্তর্ভুক্ত। সারান্দা অরণ্য কোনো রেলপথের নিকটে নয়, ট্রেনে বসে এ লাইন থেকে সাধারণতঃ যে বনানী দেখা যায় তা হোল

এই কোলহান অরণ্যভূমি, তারও খুব সামান্য অংশই রেলে চড়ে দেখা সম্ভব। আরও পশ্চিমে গিয়ে যে বন পর্ব্বত দেখা যায় সেগুলো হলো বামড়া আনন্দগড় ও বোনাইগড় প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত। তার পরেই পড়ে সম্বলপুর জেলার রিজার্ভ ফরেষ্টের পূর্ব্ব-উত্তর অংশ। তার পরে এল বিলাসপুর। বিলাসপুর ছাড়িয়ে নাগপুরের পথে অনেকদূর পর্য্যন্ত রুক্ষ, ঊষর, সমতল প্রান্তরের একঘেয়ে দৃশ্য চক্ষুকে পীড়া দেয়। তার পরে আসে দ্রুগ বা দুর্গ। এখান থেকে পুনরায় বন পর্ব্বতের দৃশ্য সুরু হোল, এই পথেই কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের বহু-বিজ্ঞাপিত সালকেশা অরণ্যভূমি। আমি একবার জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রাত্রিতে আর একবার অস্তসূর্য্যের বিলীয়মান আলোয় এই বন প্রদেশ দর্শন করি। নিঃসন্দেহে বলা যায় ট্রেনে বসে যে কেউ দুর্গ ও ডোঙ্গরগড়ের মধ্যে একটু কষ্ট করে চোখ মেলে চেয়ে থাকবেন, তাঁর কষ্ট সার্থক হবে।

তবে এখানে একটা কথা, সকলে কি সব জিনিষ ভালবাসে। যার চোখ যে জন্যে তৈরী হয়ে গিয়েছে, সে জন্যে দোষ কাউকে দেওয়া যায় না।

বনানী ও পাহাড়পর্ব্বতের দৃশ্য, মুক্ত space-এর দৃশ্য যাঁর ভালো লাগে না—তাঁর সঙ্গে কি তা বলে ঝগড়া করতে হবে? তাঁর হয়তো যা ভালো লাগে, আমার তা ভালো লাগে না সুতরাং তিনিও তো আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারেন তা নিয়ে।

মনোহরপুর নামলাম বেলা দশটার সময়।

একটা কুলীকে জিগ্যেস করলাম—ডাকবাংলা কোথায়?

—পাহাড়ের ওপারে। কিন্তু সে ডাকবাংলো নয়, ফরেষ্ট ডিপার্ট-মেণ্টের বাংলো।

—সে আমি জানি, তুমি পথ দেখিয়ে দিতে পারো ?

—সোজা পশ্চিম দিকে চলে যান।

পাহাড়ের ওপরে উঠতে গিয়ে ডানদিকে দেখি বনবিভাগের আপিস। ভাবলাম, চিড়িয়া পাহাড়ে যাবার একমাত্র উপায় হোল রেল। সে রেলে চড়তে হোলে খনিওয়ালাদের অনুমতি দরকার। বনবিভাগের কর্ম্মচারীরা সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন ভেবে আমি আপিসের দিকেই গেলাম। তা ছাড়া বনবিভাগের অনুমতি ব্যতীত তো পাহাড়ের ওপরের বাংলোতেও থাকা যাবে না। আপিসে জিগ্যেস করে জানা গেল শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুপ্ত বর্ত্তমানে এখানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। রাসবিহারী বাবুকে আমি জানতাম খুবই, ১৯৩৪ সালে সারান্দা বন পরিভ্রমণের সময়ে তিনি আমার সঙ্গী ছিলেন।

বল্লাম—রাসবিহারী বাবু আছেন ?

একজন আরদালী বল্লে—না বাবুজি। তিনি বনের কোনো কাজে বেরিয়ে গিয়েচেন।

—কখন আসবেন ?

—ঠিক নেই। দেরি হবে।

আমি তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে চিড়িয়া লাইট রেলের সাইডিংএ যাবো ভাবচি এমন সময়ে রাসবিহারী বাবুর বাসা থেকে একজন চাকর এসে বল্লে—আপনাকে মাইজি নিয়ে যেতে বলেচেন বাসাতে—

—কোন মাইজি ?

—রাসবিহারী বাবুর স্ত্রী।

বাসাতে গিয়ে ভদ্রমহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনিও আমাকে জানতেন। চা ও জলখাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমি এখুনি চিড়িয়া রেলে যেতে উদ্যত হয়েছি শুনে বল্লেন—এখন কেন যাবেন ? সে ট্রেন

ছাড়বার সময় হয়েছে। এখান থেকে সাইডিং একমাইল দূরে। গিয়ে গাড়ী পাবেন না। তার চেয়ে ধীরে সুস্থে স্নান করে নিয়ে বিশ্রাম করুন।

কথা শুনলাম না। আমার বন ভ্রমণের তৃষ্ণা তখন অত্যন্ত বলবতী। মাইল খানেক ছুটতে ছুটতে গিয়ে আমরাও যেই সাইডিংএ পৌছেছি ট্রেনও ছেড়ে দিলে। বাধ্য হয়ে ফিরলাম। এসে দেখি রাসবিহারী বাবু কাজ থেকে ফিরেছেন। আমাকে দেখে খুব খুশি। দুজনে গল্প করতে করতে স্নান করে এলাম নদীতে। ওঁদের অতিথিপরায়নতার কথা অনেক দিন মনে থাকবে।

বিকেলে তিনজনে বেরুলাম বেড়াতে।

রেলপথের ওপারে সুধীর বাবুর বাসা। সেবার এসে ওঁর সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল। রাসবিহারী বাবুকে নিয়ে সুধীর বাবুর বাসায় গেলাম। তিনিও আমায় দেখে খুব খুশি। বিদেশে বাঙালীদের মধ্যে খুব হৃদ্যতা। আমাদের সন্ধ্যাবেলা চা খেতে বল্লেন, রাত্রেও তাঁর ওখানে না খেলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন জানিয়ে দিলেন।

সুধীর বাবুর বাসা থেকে আমরা গেলাম নৃসিংহ বাবাজির আশ্রম দেখতে। এই স্থানটি অতি মনোরম। কোয়েল নদীর পাষাণময় তটের ওপরে একটি শ্যাম কুঞ্জবিতান। কত কি ফুল ফলের গাছ এখানে যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে, বিশেষ করে ফুলের গাছ। বকুল, নাগকেশর, চাঁপা থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র সন্ধ্যামণি পর্য্যন্ত সব রকমের পুষ্প এখানে দেখা যাবে। ফুলের বাগান বলে মনে হয় না, মনে হয় ছায়ানিবিড় এক বনানী, মধ্যে মধ্যে ঘন বনের বুক চিরে পাথরের নুড়ি বিছানো সরু পায়ে চলার পথ পরস্পরকে কাটাকাটি করে সুবিন্যস্ত ভাবে সোজা এদিকে ওদিকে চলে গিয়েছে। আশ্রমের ফটক ছাড়িয়ে প্রথমেই একটা পাথর বাঁধানো চত্বরের চারিপাশে কতকগুলো ছোট বড় পাকা-

বাড়ি। সাধু-সন্ন্যাসীদের থাকবার জন্ম বড় বড় ঘর ও বারান্দা। এই ঘর বাড়ির পেছনে আর কোন মানুষের বাসের ঘর নেই, ঘন বন-নিকুঞ্জের মাঝে মাঝে লতাপাতা ঢাকা ছোট ছোট দেবমন্দির, তার কোনোটায় রামসীতা, কোনোটাতে শ্রীকৃষ্ণ, কোনোটাতে শিবলিঙ্গ। অপেক্ষাকৃত বড় মন্দিরটি নৃসিংহদেবের। বনের মাঝে মাঝে পুষ্প-বিতানের আড়ালে পাথরের আসন। বোধহয় সাধুদের ধ্যান ধারণার জন্যে, কিংবা যে কেউ বসে বিশ্রাম বা চিন্তা করতে পারে। সাধুর খুব ভিড় আছে বলে মনে হোল না, বরং মনে হয়েছিল সমস্ত আশ্রমটিতে লোক খুবই কম। এত নির্জ্জন যে বাগানের মধ্যে ঢুকলে ভয় করে, পথ হারিয়ে গেলে কেউ দেখিয়ে দেবার লোক নেই। সমস্ত আব-হাওয়াটি অতি শান্ত ও পবিত্র। একটি সাধু ধুনি জালিয়ে বসে আছেন এক জায়গায়।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

নৃসিংহ দেবের ঘণ্টাধ্বনি আশ্রমের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করছে। মন্দিরে দীপ জ্বলছে। অনেকগুলি হ্যারিকেন লণ্ঠন এখানে ওখানে গাছের গায়ে ঝুলছে। আমার প্রথমেই মনে হোল এত কেরাসিন তেল আসে কোথা থেকে ?

সাধুজি বোধহয় আশ্রমের মোহান্ত।

আমরা সামনে গিয়ে বল্লাম—প্রণাম মহারাজ।

সাধুজি আমাদের আশীর্ব্বাদ করে বসতে বল্লেন। কিছু ধর্ম্মকথা শোনালেন। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' থেকে কিছু বাণী উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করলেন। আমাদের বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় সকলের হাতে হাতে প্রসাদ দিলেন কলা আর কচুরি—আর একটা জিনিস এদেশে দেব-মন্দিরে ভেট হিসেবে খুবই ব্যবহৃত হয়। এর নাম 'পান্‌জেরি'—

জিনিসটা হোল ধনে ভাজার গুঁড়ো আর চিনি এক সঙ্গে মেশানো।

সুধীর বাবুর বাড়িতে খেয়ে ফিরবার পথে রাসবিহারী বাবু সাইডিংএ ফোন করলেন ষ্টেশন থেকে। পরদিন সকালে ট্রেন ছাড়বে, তাতে একটা সেলুন জুড়ে দিতে বলে দিলেন। সকালে গাড়ীতে চরবার সময় 'সেলুন'এর অবস্থা দেখে আমার চক্ষুস্থির। একখানা মালগাড়ী, যাকে বলে covered wagon, তবে দুখানা কাঠের বেঞ্চি পাতা আছে তার মধ্যে এই যা।

পাঁচমাইল গিয়েই ছোট গাড়ী নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলো। আমি বড় ভালবাসি সারান্দার এই অপরূপ নির্জ্জনতা। এত বড় বড় শাল ও আষান গাছও সিংহভূমির অন্য অঞ্চলে দেখা যায় না। মোটা মোটা কাছির মত লতা এগাছ থেকে ওগাছে জড়াজড়ি করে রয়েছে। বড় বড় কুরচি ফুলের গাছ। এত বড় কুরচি গাছ আমি তো কোথাও দেখিনি। বন্য শণের বড় বড় হলুদে ফুল রেললাইনের দুধারে যেদিকে চোখ যায়, সেদিকে ফুটে আছে। বাঁ দিকে একটা পাহাড়ের সারি, হঠাৎ পাহাড়শ্রেণীর ফাঁক দিয়ে কখন পার্ব্বত্য নদী কোয়েল এসে মিশলো রেললাইনের পাশে। দুই তট শিলাস্তৃত, মাঝে মাঝে সাদা লিলির সঙ্গে মিশেই হলুদ রংএর বন্য শণের (wild flax) ফুল, পাহাড়ের ওপারে বেগুনি রংয়ের দেবকাঞ্চন।

আমাদের গাড়ী একজায়গায় হঠাৎ থেমে গেল। স্থানটি বড় বড় বন-পাদপে ছায়ানিবিড়।

রাসবিহারী বাবু বল্লেন, আসুন বনের মধ্যে।

কোথায়?

আপনাকে আমাদের শিমুল গাছের নার্সারি দেখিয়ে আনি।

গাড়ি কতক্ষণ থাকবে?

সে ভয় নেই। যতক্ষণ আমরা ফিরে না আসি।

অনেকদূর চল্‌লাম বনের মধ্যে। একজায়গায় অনেকগুলো সিমুলের চারা সার দিয়ে পোঁতা। বনবিভাগ থেকে এখানে শিমুল গাছের আবাদ করা হয়েছে তাই একে বলা হয় শিমুল চারার নার্সারি। এখান থেকে চারা তুলে অন্য জায়গায় রোপন করা হবে। রাসবিহারি বাবু আমাদের সব বুঝিয়ে দিলেন। শিমুলগাছ নাকি বেশ দামে বিক্রী হয়, দেশলাইএর কারখানার মালিকদের কাছে।

রাসবিহারী বাবু বল্লেন, সাবধানে থাকবেন, বড় বড় বাঘ আছে সারান্দা ফরেষ্টে।

দিনমানে বেরোবে ?

সব সময় বেরুতে পারে।

লেপার্ড না 'দি রয়েল বেঙ্গল ?'

রয়েল বেঙ্গলই বটে।

আপনি কখনো বাঘের হাতে পড়েছেন ?

দু-বার পড়েও বেঁচে গিয়েছি। চলুন সে গল্প আংকুয়া বাংলোয় বসে চা খেতে খেতে করা যাবে।

গাড়ী আবার ছাড়লো। আবার চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে।

বন যেন নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে উঠছে। কোনো লোকালয় নেই। বনের মধ্যেই ছোট্ট একটা ষ্টেশন। তার নাম লোরো জংসন। এখান থেকে ঘনতর বনের মধ্যে একটা লাইন বেঁকে পূর্ব্বদিকে অদৃশ্য রহস্যপথে অন্তর্হিত হোল, না জানি ওদিকে আবার কত বন, কত ঝর্ণা, কত বিচিত্র লতার দুলুনি, কত সৌন্দর্য্যময় বনস্থলী। মন যেন নেচে ওঠে, চোখ পিপাসিত দৃষ্টিতে সে দিকে চেয়ে থাকে।

ও লাইনটি কোথা গেল ?

রাসবিহারী বাবু বল্লেন, তুধিয়া মাইন্‌স্‌।

সে কতদূর ?

তা এখান থেকে ন' মাইল।

ওপথে যাওয়ার উপায় কি ?

হেঁটে বা ট্রলিতে যাবেন ?

নিশ্চয়ই যাবো। আপনি ব্যবস্থা করবেন ?

যখন বলবেন, করে দেবো।

বেলা ন'টার সময় ট্রেন চিড়িয়াতে পৌছলো। রেল লাইনের বাঁদিকে ৩০০০ হাজার ফুট উঁচু পাহাড় বুদ্ধবুরু ও অজিতাবুরু। বুদ্ধদেবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এদের, এদেশী ভাষার নাম। পাহাড়ের ওপর থেকে লৌহ প্রস্তর কেটে নামানো হচ্চে, পাহাড়ের ওপর থেকে নীচু পর্য্যন্ত ট্রলি লাইন আছে। ছোট লাইনটা এখানেই শেষ হয়ে গেল। আশপাশের ছোট খাটো পাহাড়ের ওপর খনির ম্যানেজার, ওভারসিয়ার প্রভৃতির বাংলো। একজন বাঙালী ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হলো, তিনি এই খনির ডাক্তার, নাম ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী। ভদ্রলোক অতি অমায়িক, প্রথম আলাপেই আত্মীয়তা প্রদর্শন করে তাঁর বাংলোতে সেদিন আবার নিমন্ত্রণ করলেন। আমাদের সময় কম ছিল বলেই তাঁর এ সদয় প্রস্তাবে আমরা রাজি হতে পারিনি।

বনপথে হেঁটে একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ক্ষুদ্র একটি বন্যগ্রাম পার হয়ে আমরা আংকুয়া ফরেষ্ট বাংলোতে পৌছলাম।

কি সুন্দর এই আংকুয়া বাংলোটি, কি মনোরম এর পরিবেশ।

একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় এই বাংলো, পাহাড়ের পাদমূল ধৌত করে বইচে একটি পাহাড়ী নদী, বাংলোর সামনে পাহাড়ের মাথায় সমতল ভূমিতে চেয়ার পেতে আমরা বসলাম। ছোট টেবিল সামনে

পেতে চা দিয়ে গেল, বাংলোর চৌকিদার। সঙ্গে আমাদের খাবার ছিল। অমন জায়গায় বসে চা খাওয়ার অভিনবত্ব আমি ভাল ভাবে উপভোগ করবো বলে অদূরবর্ত্তী গম্ভীর বনভূমির দিকে চেয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিই। কত রকমের গাছ চারিদিকে—অর্জ্জুন, আসান, শাল, ধও, পিয়াসাল। বাতাসে বনভূমির স্নিগ্ধ গন্ধ।

ডাকবাংলার চৌকিদারের বৌ, একটি স্বাস্থ্যবতী হো রমণী, আমাদের জলটল এনে দিচ্ছিল। জিগ্যেস করে জানা গেল মেয়েটি মিশনারী স্কুলে দিনকতক পড়েছিল, সুতরং শাড়ী ব্লাউজ পরে। সামান্য একটু ইংরাজীও জানে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ হো ও মুণ্ডা জাতীয় লোক খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করেছে, অনেকে রাঁচী মিশনারী স্কুলের ফেরৎ।

আংকুয়া বাংলো থেকে যেন উঠতে ইচ্ছে করছিল না। এমন চমৎকার কানন-ভূমিতে এমন বাংলোতে বাস করা একটি বিশেষ সৌভাগ্য। তবে অরণ্যকে ভাল না বাসলে কেউ এখানে বাস করতে পারবে না। বাংলোর চৌকিদারকে বল্লাম—রাত্রে এখানে বাঘ আসে?

—রোজই হুজুর।

—হাতী?

—ওভি। ভালুক ভি বহুৎ আসে।

—তোমরা থাকো কি করে?

—কাঁড় নিয়ে বসে থাকি হুজুর। আগুন করি।

এই তো অবস্থা। যত বড় প্রকৃতির রসিকই হোক না কেন, এ নির্জ্জন অরণ্য ভূমিতে কিছুদিন বাস করতে হোলে নিছক প্রকৃতিরসিকতা ছাড়াও আর কিছু থাকা দরকার। সেটা হোল নির্ভীকতা, নির্জ্জন বাসের শক্তি, নিত্য নতুন বিলাসের লোভ-সম্বরণ। জীবন হবে এখানে সব রকম উপকরণের বাহুল্য বর্জ্জিত, austere, অন্তর্মুখী। তবে এখানে

আনন্দ, নতুবা একদিনের মধ্যেই পালাই পালাই ডাক ছাড়তে হবে।

ফিরবার পথে চিড়িয়া থেকে ট্রেন পেলাম না। খনির লোকেরা আমাদের জন্যে ট্রলি করে দিলেন. চোদ্দ পনেরো মাইল পথ বিকেলের ঘন ছায়ায় দুধারের বনভূমির মধ্য দিয়ে ট্রলি করে আসার সে কি আনন্দ! এই আসার পথে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল যা ভুলবার নয়। সারাপথ বাতাসে যেন গাজিপুরের দামী আতরের গন্ধ ভুরভুর করচে। বাড়িয়ে এতটুকু বলচি না। ট্রলির একজন কুলীকে জিগ্যেস করলাম, সে কি কানে আতরমাখা তুলো গুঁজেছে? সে তো অবাক। রাসবিহারী বাবুকে বল্লাম, তিনি কোন্ তেল মেখেচেন? রাসবিহারী বাবু বল্লেন গন্ধটা তেল বা আতরের নয়, নানা বনকুসুমের সম্মিলিত সুবাস।

কি ফুলের?

ট্রলি থামিয়ে থামিয়ে আমরা রেল লাইনের কাছাকাছি যত রকমের ফুল ফুটেছিল, সব তুলিয়ে আনিয়ে দেখলাম। ও সব কোন ফুলেরই সুবাস নয়। দেবকাঞ্চন গন্ধহীন, বন্য শনের ফুল গন্ধহীন, অর্কিডের দু একটা ফুল, যা চোখে পড়লো, গন্ধহীন। তবে কোন্ ফুলের গন্ধ? শালের ফুল এখন ফোটে না। কুরচি ফুলও তাই।

অথচ গোটা চোদ্দটি মাইল পথ সে সুবাসে আমোদ করতে লাগলো। ঘন, মিষ্ট, তীব্র সুবাস।

রাসবিহারী বাবু এর কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না।

বন ছেড়ে আমাদের ট্রলি যখন মুক্ত প্রান্তরে বের হোল, তখন দূরদিগন্তে বোনাইগড় রাজ্যের শৈলশ্রেণীর পেছনে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।
